REGISTERED No. C—675

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় ।

(মাসিক পত্র)

A Non—Political Hindu Religious & Social Magazine.

ষষ্ঠ বর্ষ—প্রথম সংখ্যা ।

আশ্বিন ।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ দুই টাকা ।

প্রতি খণ্ড ।০ আনা ।

সন ১৩২৪ সাল ।

এই সংখ্যার লেখকগণ ।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী ।
শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী ।
শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ।
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ ।
শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র সান্যাল ।
শ্রীযুক্ত বিজয়কিশোর স্মৃতিতীর্থ ।
শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ ।
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সরস্বতী ।
শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র জ্যোতীরত্ন ভট্টাচার্য্য ।
শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র এম, এ ।
শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ তর্করত্ন ।

…কুমার তর্কনিধি ।
পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় ।

সূচীপত্র।

REGISTERED No. C—675.

ষষ্ঠ বর্ষ। { ১৮৩৯ শক, ১৩২৪ সাল, আশ্বিন। } প্রথম সংখ্যা।

বোধন।

(১)

পাইতে তোমার চরণ সঙ্গ,
বরষার জলে ধুইয়া অঙ্গ,
দেখ মা কেমন সেজেছে বঙ্গ,
দেখ ক্ষণকাল ভবানি!

(২)

বন-উপবন তটিনী-গগন,
সলিল অনিল দিক্‌বধূগণ,
ভাবিয়া সকলি তব আগমন
আনন্দে হাসিছে, ঈশানি!

(৩)

দেখ মা, বারেক মেলিয়া নয়ন
যে যার শকতি করিয়া গ্রহণ—
উপহার সবে করে আহরণ—
করিতে তোমারে অর্চনা।

(৪)

শ্রীপদের আশে শেফালিকা ফুল
ধরণী লুটায় হইয়া আকুল,
কুমুদ কহ্লার সরসিজকুল,
সলিল করিছে রচনা

(৫)

সলিলের মত অরবিন্দ দিয়া
স্থলভূমি পূজা করিবে ভাবিয়া
স্থলেতে কমল আপনি সৃজিয়া
আছে কত ফুল ধরিয়া।

(৬)

ব্যজন করিবে তোমায় সমীর
কহি এই কথা প্রসাদ কুটীর
আনন্দে ভ্রমিছে হইয়া অধীর
শারদ-সুরভি মাখিয়া।

(৭)

প্রফুল্ল আকাশ, সুনীল চাঁন্দোয়া
তুলিয়া ধরিছে বাঙ্গলা ব্যাপিয়া
শশী কহে মেঘকালিমা মুছিয়া
হাসিয়া তারার কাণে

(৮)

আমরা যাইব কিরণে চাপিয়া,
অধিবাসকালে অমীয় লইয়া
পূজিব মায়ের পদ সুধা দিয়া
বাঙ্গলার তিনটী দিনে

(৯)

সে প্রসাদসুধা করি বরিষণ
শীতল করিব তাপিত জীবন
তিন দিন রবে আনন্দে মগন
শান্তির ধারা ছুটিবে।

(১০)

তোমার পূজায় সার্থক জীবন
হইবে ভাবিয়া নদ-নদীগণ
হইয়াছে সবে নির্ম্মল এখন
বড় সাধ পদে লুটাবে।

(১১)

কত রোগ-শোক আধি-ব্যাধি ভয়—
ক'রে রেখে ছিল যা'কে মসীময়—
সে কেমন তব পূজার আশায়
মুছেছে কালিমা, জননি !

(১২)

তব আগমন করিয়া স্মরণ
আপনা পাসরি মেতেছে কেমন
বারেক দেখ গো মেলিয়া নয়ন
বাঙ্গলার যত পরাণী।

(১৩)

অনশন ব্যথা গিয়াছে ভুলিয়া
দারাসুতহরা ভীম ম্যালেরিয়া
রিপুভাব ভুলি হৃদয়ে ধরিয়া
আনন্দে চলেছে ছুটিয়া।

(১৪)

দরিদ্র কুটীর ধনীর প্রাসাদ
ব্যাপিয়ে জীবন্ত ছিল অবসাদ,
তোমারি বোধন-আনন্দ সংবাদ
নাশিয়াছে তার অ সিয়।

(১৫)

কতই উদ্যমে ফুল্ল পরাণে
সকলি ব্যস্ত পূজা আয়োজনে
দেখিব কখন্ ওরাঙ্গা চরণে
ভাবিছে দিবস রজনী।

(১৬)

জাগ মা ! জাগ মা ! দেখ মা চাহিয়া,
তব আগমন-বারতা শুনিয়া
উঠেছে বঙ্গ কেমন মাতিয়া
পূজিতে ও পদ দু'খানি।

শ্রীআশুতোষ রায়চৌধুরী।

শারদীয়া মহাপূজা কি ?

মা আসিতেছেন। মেঘনির্ম্মুক্ত সুনীল শারদাকাশ মায়ের আবাহন করিবার জন্য জগন্মণ্ডপে চন্দ্রাতপ বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে। শেফালি স্বীয় অমলধবল হৃদয় বিছাইয়া মায়ের চরণস্পর্শের প্রতীক্ষা করিতেছে। স্থলপদ্ম-পুণ্ডরীক-কুমুদ-কহ্লার মায়ের মুখারবিন্দ শোভার অনুকরণ করিতে প্রয়াস পাইতেছে। শ্যামল প্রান্তর শস্যসম্ভারপূর্ণ হইয়া মায়ের অঞ্চলে স্থানলাভের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতি বর্ষার আবিলতানির্ম্মুক্ত হইয়া সুখশারদপ্রভাতে মায়ের 'আগমনীগীত' আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই যেন মায়ের আগমনজনিত আশার বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। বিহগের কলকূজনে, পূর্ণযৌবনদৃপ্তা স্রোতস্বতীর কল কল ছল ছল লীলাবিলাসে, পুষ্পসম্ভারপূর্ণ বন-উপবনের প্রফুল্লতায়, শস্যপূর্ণা ধরিত্রীর শ্যামল অঞ্চলচালনে সর্ব্বত্রই সেই মায়ের প্রতিকৃতি, সেই মায়ের সুখময়ী স্মৃতি! আমরা দেখিনা, দেখিতে জানি না, তাই নয়ন সত্ত্বেও নেত্রহীন! তাই মায়ের আগমননিগমন—রহস্য বুঝিতে পারি না—আবাহন-বিসর্জ্জনের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। এজগৎ যে মায়েরই লীলাপ্রপঞ্চ—এজগৎ যে মায়েরই হাতের ভাঙ্গাগড়া, গড়া ভাঙ্গা, অহরহঃ আমরা তাহার ধারণা করিতে পারি না!—মুখে বলি মা আসিতেছেন, কিন্তু মনে মনে ধারণা করিতে পারি কি? আমরা মায়ের বোধন করি, আবাহন করি, পূজা করি—বিসর্জ্জন দিয়া বিজয়া করি! কিন্তু এই বোধন, এই আবাহন, এই বিসর্জ্জন—এই পূজার প্রকৃত মর্ম্ম কয়জন হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকি?—আমরা পূজা করি বটে, কিন্তু সে কি মায়ের পূজা? না সে খড়, কাঠ, দড়ি, মাটি, রং ডাকের সাজের পূজা? আমরা সত্য সত্যই তারই পূজা করি। আমরা পূজা করি—আমাদের অহঙ্কারের, আমাদের যশোলিপ্সার, আমাদের ধনগৌরবের। মায়ের পূজা বলিয়া পূজা কয় জন করি? আমরা ঋষিগণের বংশধর বলিয়া গর্ব্বে মাতোয়ারা! বিষয়মদ আমাদিগকে এতই আচ্ছন্ন করিয়াছে, লালসা কামনার নিকট আমরা এমনই ভাবে আত্মবলি দিয়াছি যে, আমরা আর আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় দিবার যোগ্য নহি! তাই আমরা মায়ের পূজা করিলেও বিপরীত ফললাভ করি "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী" এ তো ধরাবাঁধা কথা—নতুবা মায়ের সেবক—হবে দীনহীন

হইয়া থাকে ? দুর্গার সন্তান—কবে দুর্গতি-সাগরে ডুবিয়া থাকে ? মহাশক্তির ভক্ত কবে শক্তিহীন হইয়া থাকে ?

এই শারদীয়া মহাপূজা যে মহাশক্তিরই পূজা, তাহা অনুভব করিবার শক্তি কি আমাদের আছে ? সে শক্তি আমরা নিজ দোষে হারাইয়াছি, তাই আমাদের এত দুঃখ, এত কষ্ট, তাই আমরা এত আধিব্যাধিপীড়িত। প্রত্যেক মানবহৃদয়ে যে অনন্তরূপিণী মহাশক্তির অংশ নিহিত—সেই মহাশক্তির বলেই—মানবের প্রাণশক্তি। এই শক্তিই—মানবের আত্মা। এই শক্তিপ্রণোদিত হইয়াই মানবপ্রকৃতি ক্রিয়াশীলা। তবে সাধারণতঃ এই শক্তির অতি অল্পমাত্র বিকাশ আমরা জনসাধারণে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি।

এই শক্তি—কুলকুণ্ডলিনীরূপে—মানবহৃদয়ে সুষুপ্তাবস্থাতে বিদ্যমান আছেন। মানব হৃদয়ে দেবাসুরসংগ্রাম নিয়তই চলিতেছে। অসুর তেজ যখন অতি প্রবল হইয়া দৈব তেজকে হীন করিয়া দেয়, দেবভাব সকল যখন অসুরভাবের প্রাবল্যে হৃদয়স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইবার ভয়ে আতঙ্কিত হয়, তখন এই দানবোথা বাধা বিদূরিত করিবার জন্য, স্বর্গের আসন হৃদয়ে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শক্তির আশ্রয় করিবার প্রয়োজন সাধক বোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু বোধ করিলেই তো আর শক্তিলাভ করিতে পারা যায় না ? তাহার জন্য সাধনা চাই—উদ্যম চাই ! শক্তি আছেন বটে—কিন্তু তাহা তো সুপ্ত—তাহার অস্তিত্বও আমরা জ্ঞাত নহি। সেই সুপ্ত শক্তিকে জাগাইতে হইবে। কিন্তু জাগানোরও কালাকাল, সময় সুযোগ অবসর ইত্যাদি চাই, নতুবা হিতে বিপরীত হইবার আশঙ্কা।

এই সুপ্তশক্তিকে জগাইবার জন্য ইহার অস্তিত্ব এবং প্রভাব অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিবার জন্য বোধনের প্রয়োজন। সদ্‌গুরুর উপদেশে ও শিক্ষায় এই শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলে, "একবার জাগো মা কুলকুণ্ডলিনি" বলিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া লইতে পারিলে—তখন শক্তিহীনের মধ্যে এক নূতন শক্তির বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া যাইবে। তখন মায়ের সন্তান—মায়ের শক্তির আভাস পাইয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িবে, তখন সে নিজের যথার্থ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে এবং অসুরগণের সঙ্গে যুদ্ধে আর ভীত হইবে না।

মহাশক্তির সন্তানের হৃদয়ে যখন অনন্তশক্তিধারিণী বিশ্বরূপা দশভুজার মহিমময়ী মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিবে, মায়ের সন্তান যখন অন্তরে অন্তরে মায়ের শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিবে, যখন মানসপটে মায়ের সেই সদাপ্রফুল্ল হাস্যময় মধুর মুখখানি ফুটিয়া উঠিবে, মায়ের সন্তান যখন সেই অভয়ার 'মাভৈ' রব শ্রবণ করিবে, তখন কোথায় থাকিবে তাহার অসুরের ভয়—কোথায় থাকিবে তাহার দুঃখ আর্ত্তি ? তখন রক্তবীজই আসুক, আর শুম্ভনিশুম্ভই আসুক, আর মহিষাসুরই আসুক, সে মহাশক্তির তেজের নিকট সকলের তেজঃই নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবে, সকলকেই অভিভূত হইতে হইবে ! তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু জাগান চাই। জাগো জাগো বলিয়া চীৎকার করিলেই জাগান যায় না।

জলের মধ্যে যে প্রবল প্রতাপশালী জলযান বাষ্প আছে তাহাকে কাজে লাগাইবার

কৌশল যিনি জানেন না, তিনি জলের সমুদ্রের মধ্যে থাকিয়াও তার শক্তিগ্রহণে অপারগ, কিন্তু যিনি সে রহস্যতত্বজ্ঞ, তিনিই তাহা হইতে উক্ত বাষ্প বিশ্লেষণ করিয়া, তাঁহার সাহায্যে পৃথিবীর আকর্ষণকে পরাভূত করিয়া গগনমার্গে উড্ডীন হইবার উপায় করিতে পারেন। যাহারা এ রহস্য অবগত নহে, তাহারা জলকে কেবল নীচগ বলিয়া জানে!

এইরূপ আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত মহাপ্রতাপশালিনী মহাশক্তির অস্তিত্বসম্বন্ধে অজ্ঞ এবং উদাসীন বলিয়াই আমাদিগকে এত দীন, এত হীন মনে করি, কিন্তু যদি সেই শক্তির রহস্য আমরা জ্ঞাত হইতে পারি এবং তাহাকে একবার জাগাইয়া লইতে পারি, তাহা হইলে আমরা দেখিব যে আমরা কতশক্তিশালী, আমাদের দ্বারা কত অসাধ্য সাধন হইতে পারে; নিজেই নিজের শক্তি দেখিয়া তখন চমকিয়া উঠিব!

যে শক্তির অঙ্গুলিচালনে এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পত্রবৎ পরিচালিত হইতেছে, যে শক্তির অনুশাসনে একমুহূর্ত্তে নগর সাগরে, ভূধর মরুভূমিতে পরিণত হইতে পারে, প্রলয় ঝঞ্জাবাত প্রভৃতি যে মহাশক্তির একটি নিশ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গেও তুলনীয় হইতে পারে না, আমরা যে সেই শক্তিরই স্ফুলিঙ্গ, ইহা যদি আমরা অন্তরে অন্তরে, প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারি, তাহা হইলে এমন কোন বাধা আছে, যাহার বিরুদ্ধে আমরা অকুতোভয়ে দাঁড়াইতে পারি না, যাহাকে আমরা হেলাতে পরাভূত করিতে পারি না? কিন্তু জানা চাই, চেনা চাই, বোঝা চাই, ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ তাহা জানিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহারা জগৎসংসারকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেন, অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি তাঁহাদের করতলগত ছিল, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান তাঁহাদের নিকট হস্তস্থিত আমলকবৎ প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, দূরত্বের ব্যবধান তাঁহাদের নিকট তিরোহিত হইয়াছিল। তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে, পূর্ণ বিশ্বাসে, দৃপ্তবক্ষে, উৎফুল্ল হৃদয়ে, মানবগণকে "অমৃতের" পুত্র এই মধুর নামে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"সেই ব্রহ্ম পদার্থকে আমি জানিয়াছি!" এমন কথা আর কোথাও শুনিয়াছেন কি? তাঁহারা নিজে জানিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই—আমাদের মধ্যে বিষয়ের কীটও যাহাতে তাহা জানিতে পারে, তাহারও উপায় তাঁহারা করিয়া দিতে কার্পণ্য করেন নাই।

কিন্তু আমরা যে এখন অবিশ্বাসী সন্দেহপন্থী! বিদেশীয় শিক্ষার উজ্জ্বল আলোকে আমাদের নয়ন আজ প্রকৃত দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাই আমাদের সেই সব মহামনস্বিগণকে এখন স্বার্থান্ধ অত্যাচারী সঙ্কীর্ণচেতা বলিয়া আমরা মনে করিতেছি এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অতি অবজ্ঞাভরে তুচ্ছ বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি। তাই আজ আমরা শক্তিরহস্য বোধে অক্ষম শক্তিপূজার মাহাত্ম্য বুঝিতে অনধিকারী।

নতুবা শক্তিমাহাত্ম্য ব্যাখ্যাতা মহর্ষি মার্কণ্ডেয় আজ আমাদের নিকট এত হেয় হইতেন না শ্রীশ্রী চণ্ডী আজ বেদোপম বলিয়া পূজিত হইত। যিনি সমগ্র শ্রী চণ্ডীগ্রন্থ শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে মনোযোগের সহিত আস্তিক্য বুদ্ধি লইয়া পাঠ করিবেন এবং তাহার রহস্য উদ্ঘাটনে চেষ্টা করিবেন, তিনিই দেখিতে পাইবেন যে এই শারদীয়া মহাপূজা কাঠ খড় মাটি রাঙ্গতার পূজা

নহে—এটা একটা লুচিমণ্ডা, পাঁঠার মাংস খাইবার ফন্দী নহে—এটা বাঈ, থিয়েটার আমোদ-প্রমোদের ঘটা উপলক্ষ মাত্র নহে—এটা মহাশক্তির স্বরূপ-জ্ঞানের উপায়স্বরূপ—এটা আত্মজ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিবার সোপানস্বরূপ। একই মহাশক্তি যে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, ফলে, সমুদ্র, নদী তড়াগ, বাপীতে, নরনারী পশু-পক্ষীতে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রম, নিদ্রাতে, শ্রদ্ধা ভক্তি, স্নেহ প্রীতিতে, ক্রোধ, ক্ষোভ, দয়া, মায়াতে,—নানারূপে নানাভাবে কার্য্য করিতেছে,। মহাপাপীর মহাপাপকার্য্য এবং পুণ্যাত্মার মহাপুণ্যময় কার্য্যে যে একই মহাশক্তির লীলা প্রকটিত। কুলটার অভিসারে এবং সতীর সহমরণে যে একই মহাশক্তির অঙ্গুলিপরিচালন পরিদৃশ্যমান, সর্ব্বভূতে সর্ব্ব কার্য্যে সর্ব্ব কালে যে একই লীলাময়ী মা সৃষ্টিস্থিতি সংহাররূপিণীভাবে অবস্থিতা—সকলই যে তাঁহারই লীলাবিকাশ—ইহা জনসাধারণকে সহজভাবে শিক্ষা দিবার জন্যই এই অর্চ্চনার প্রবর্ত্তনা।

ভাই ব্রাহ্মণসন্তান, ভাই হিন্দুসন্তান, একবার উদ্বুদ্ধ হও—একবার জ্ঞাননয়ন উন্মীলন করিয়া আধ্যাত্মিকভাবে দর্শন কর—শারদীয়া পূজার প্রকৃতমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা কর।

বর্ষার আবিলতা পূর্ণ জলোচ্ছ্বাস উদ্দামবেগে চারিদিক ভাসাইয়া ওলটপালট করিয়া জঞ্জাল আবর্জ্জনা বুকে করিয়া ছুটিতে থাকে—তার পর শরৎ হাসিমুখে দেখা দেয়; বর্ষার উদ্দাম বেগ আর জলে নাই—ময়লা মাটি নীচে পড়িয়া গিয়াছে—জল এখন সজ্জনমানসবৎ নির্ম্মল, স্থল আবর্জ্জনা জঞ্জাল শূন্য—প্রকৃতি শ্যামল ফুল্লকুসুমহাস্যবদনা, নির্ম্মলাকাশ নীল শাটী পরিহিতা। এই কালের সঙ্গে এই শক্তিপূজার সম্বন্ধ বুঝিতে চেষ্টা কর।

এসব কথা বেশী বিস্তৃতভাবে অনধিকারীর নিকট বুঝান কঠিন—আর অনেক সময়ে হাস্যাস্পদও হইতে হয়, তারপর মাদৃশ শাস্ত্রজ্ঞানবিবর্জ্জিত ব্যক্তির পক্ষে তাহা অসম্ভবও বটে, সেইজন্য ইহা আর বেশী করিয়া বলিতে সাহস করিলাম না, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-সমাজের স্থানও সঙ্কীর্ণ। তবে নিতান্ত মনের আবেগে এই আশ্বিনমাসে ৺শারদীয়া পূজার আসন্ন-কালে এই বিষয়টা সকলের নিকট নিবেদন করিলাম যে তাঁহারা এই মহাপূজায় রাজসিক ও তামসিক বাহ্য আড়ম্বর গুলির দিকেই কেবল লক্ষ্য না করিয়া শ্রীশ্রী চণ্ডীরহস্য উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিবেন এবং সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক মহাশক্তির বোধনের ঘট হৃদয়—বিল্বমূলে স্থাপন করিয়া অর্চ্চনা করিতে চেষ্টা করিবেন, যদি মায়ের কৃপায় সে শক্তিকে একবার জাগাইয়া লইতে পারেন, তবেই বুঝিতে পারিবেন—সে মা কি অমূল্য নিধি! অতএব আজ এই শারদীয়া মহাপূজার শুভ মুহূর্ত্তে আমাদের আত্মজ্ঞান শক্তির বোধনে আমরা উদ্‌বুদ্ধ হই! সেই জগদম্বিকার স্বরূপ বুঝিবার জন্য, তাঁহার মায়াবিভূতি হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য, সর্ব্ব ঘটে তাঁহার সত্ত্বা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় তাঁহার মাতৃমূর্ত্তির বিকাশ বুঝিবার জন্য—আসুন আমরা উপযুক্ত সাধনায় প্রবৃত্ত হই। যদি ঐকান্তিকী চেষ্টার ফলে হৃৎপদ্ম বিকশিত হয়, যদি কুলকুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রতা হন, তাহা হইলে আমরা কি, আমাদের মধ্যে কি মহীয়সীশক্তি নিহিত আছে তাহা বুঝিতে পারিব এবং মায়ের সন্তান

বলিয়া পরিচয় দিবার গর্ব্বগৌরব অনুভব করিতে পারিব। তখন সর্ব্বত্র মায়ের মূর্ত্তি দেখিয়া সর্ব্বদা মায়ের খেলা দেখিয়া আনন্দরসে আপ্লুত হইব, মায়ের বিভূতি বিকাশ দেখিয়া মা, মা, বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইব—আমাদের শক্তিপূজা সার্থক হইবে! তখন বুঝিব এটা কাহার পূজা! এটা একটা পৌত্তলিক জড় পূজানুষ্ঠান, কি জগৎপালিনী ভুবনমোহিনী মহামায়ার মহাশক্তির সত্ত্বা অন্তরে ধারণ করিবার সাধন সোপান।

আর সেইরূপ পূজা করিবার চেষ্টাই যদি না করিতে পারি, মহাশক্তির সত্ত্বাও বিভূতির কণামাত্র ভাবনাও যদি এই পূজার সময়ে হৃদয়ে উদ্‌বুদ্ধ না হয়, তবে বৃথাই আমাদের এই সব আয়োজন, বৃথাই আমাদের এই মাটি কাঠ খড় দড়ি ডাকের সাজ আর লুচি সন্দেশের পূজা—এ কেবল আমাদের নিজ বিত্তবিভব, অহঙ্কারমাৎসর্য্য বিজ্ঞাপনের ঢক্কানিনাদ মাত্র, ইহার মধ্যে মাও নাই, মায়ের শক্তিও নাই! একজন মহাপুরুষ এইরূপ এক পূজার প্রতিমা দেখিয়াই বলিয়াছিলেন "এখনকার প্রতিমার মধ্যে মাটি কাঠ খড়ই আছে, প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না।

দুঃখের বিষয় আজকাল প্রায় সকল পূজাই এই শ্রেণীর, তাহাতে মাটি আছে, কিন্তু মাটি নাই। এরূপ পূজায় কোন ফল না পাইলে, ঋষিগণকে জুয়াচোর প্রবঞ্চক বলিলে প্রত্যবায় হয় না কি? যাহা হউক আর বলিবনা—এখন কেবল আর্ত্তকণ্ঠে সেই আর্ত্তিহরার চরণে এই প্রার্থনা করিতেছি যে তিনি তাঁহার এই বিপথগামী ভ্রান্তসন্তানগণকে আবার সুমতি প্রদান করিয়া সুপথে পরিচালিত করুন, যে তাহারা নিজকে নিজে চিনিতে পারে, মায়ের স্বরূপ জানিতে পারে, মায়ের কোলে ফিরিবার জন্য তাহাদের চিত্তে আগ্রহ জন্মে, ইহসর্ব্বস্ব পশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতায় আপাতমধুর মোহমদিরাপানে যে তাহারা মুগ্ধ হইয়া আপনাকে পর বলিয়া দূরে রাখিতেছে, বিষ্ঠাকে চন্দন জ্ঞানে অঙ্গে লেপন করিতেছে, ঘরের রত্ন লোষ্ট্র-ভ্রমে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, পরের কাচখণ্ডে হীরকবুদ্ধি আরোপ করিয়া সযত্নে প্রাপ্তি প্রয়াস করিতেছে, সে মোহ তাহাদের ঘুচিয়া যাউক। তাহারা স্বীয় মহামহর্ষি পূর্ব্বপুরুষগণের বাক্যে আস্থা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক অধ্যাত্ম শক্তিলাভে যত্নবান হউক। মায়ের করুণাধারাতে স্নাত হইয়া তাহাদের আধিব্যাধি বিদুরিত হউক, তাহাদের ক্ষেত্রসমূহ ধনধান্যে পূর্ণ হউক, নদী কূপ তড়াগ সুপেয় পানীয় দ্বারা তাহাদের তৃষ্ণা দূর করুক; বিলাস মোহদৈত্যের কবল হইতে তাহারা মুক্ত হইয়া সরল সংযত জীবন যাপন করুক। প্রেয়ঃ ছাড়িয়া তাহারা শ্রেয়ঃকে সাদরে বরণ করিয়া তুলুক, ত্যাগের মহিমায় তাহারা সমুজ্জ্বল হইয়া ভোগকে ঘৃণার চক্ষে দেখুক, আর সর্ব্বদা মনে প্রাণে সেই মহেশ্বরী মহামায়া দুর্গতিহরা শান্তিপ্রদায়িনী দুর্গা নামের জপ করিয়া শক্তিসাধনায় সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক এ মহাপূজা সার্থক করুক। মা এ আশা কি অলীক স্বপ্ন?

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

মাতৃপদ পূজা।

জগন্মাতা জগজ্জননী নিখিল জীবের দুঃখ-সন্তাপসংহারিনী, সর্ব্বশান্তিপ্রদায়িনী, জ্ঞানস্বরূপা সন্তানের কল্যাণহেতু মা সর্ব্বশক্তিরূপিণী। এই নিখিল জীব মায়ের সন্তানসন্ততি। যখন জীবের যে কল্যাণ বিধান, যে অকল্যাণ নাশ, তৎসাধন প্রয়োজনানুরূপ সকল শক্তিই, মা আপনাতে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বশক্তির আশ্রয়রূপিণী হইয়াছেন এবং হয়েন। ইহকালের দুঃখসন্তাপ সংহার করিয়া পুনর্ব্বার পরকালের মুক্তিগতি বিধানার্থ মা পূর্ব্ব হইতেই আপনাতে আপনি পরাবিদ্যারূপিণী হইয়াছেন। পরাবিদ্যার প্রসন্নতা ব্যতীত মুক্তির পন্থা নাই। পরা—বিদ্যাই নিত্য ও মুক্তির হেতুভূতা।

"সা বিদ্যা পরমা মুক্তে র্হেতুভূতা সনাতনীতি"

মা সর্ব্বঐশ্বর্য্যশালিনী, রাজরাজেশ্বরী ত্রিপুরা পঞ্চ-প্রেতাসনা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও মহেশ্বর এই পঞ্চদেবতা পঞ্চ-মহাপ্রেতরূপে মায়ের সিংহাসন বহন করেন—

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ মহেশ্বরঃ।
এতে পঞ্চমহাপ্রেতা দেব্যাঃ পর্য্যঙ্কবাহিনঃ॥

(শক্তিতন্ত্র)

জীবের মূলাধারচক্রাবধি আজ্ঞাপুর পর্য্যন্ত চক্র সকল পরস্পর অবস্থিত রহিয়াছে, পঞ্চচক্রের উপরিভাগস্থ পদ্মে বিন্দুরূপ পরম শিব অবস্থিত রহিয়াছেন। তদুপরি নাদশক্তি। তাহাকেই রাজরাজেশ্বরী ত্রিপুরা ভৈরবী শক্তি বলে। পরস্পর চক্রসকল পর পর চক্রের আধাররূপে পরস্পর বহন করিতেছে। যথা—"মূলাধারে স্থিতা ভূমিঃ সাধিষ্ঠানে জলং প্রিয়ে"।

মা—দুর্গা, কালী, গৌরী, জগদ্ধাত্রী, তারা, ত্রিপুরাসুন্দরী বা ভুবনেশ্বরী, ষোড়শী-মূর্ত্তির রূপমাত্র ভেদ; স্বরূপে ভেদ নাই। এই প্রকৃতিই প্রকৃতিপুরুষাত্মক। এই স্ত্রীপুরুষ উভয় সংজ্ঞাই একমাত্র অদ্বিতীয় (মা ও বাবা) পরমেশ্বরে আরোপিত। কেবল স্ত্রীপুরুষ উপাধি ভেদমাত্র। নচেৎ মা ও বাবা স্বতন্ত্র নহেন। মায়েরই মাতৃভাব এবং পিতৃভাব বা বাবারই পিতৃভাব এবং মাতৃভাব।

সন্তানের কার্য্যসিদ্ধির জন্য মা কেবল মাত্র রূপভেদে প্রয়োজনানুসারে আবির্ভূতা হয়েন। নচেৎ মা নিত্যা, বাহ্য এবং আধ্যাত্ম জগতের মঙ্গলসাধনের জন্য যখন মায়ের তেজঃ অনুভূতি হয়, তখনই বলা হয়, মা দুর্গা বা কালী রূপভেদে প্রকাশমানা হইয়াছেন।

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততং।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥

দেবানাং কার্য্যসিদ্ধর্থ্যং মাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যেত্যভিধীয়তে॥

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী, সর্ব্বমঙ্গলময়ী, পরমশরণ্যা, সর্ব্বজীবে যিনি বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা এবং স্বর্গ ও অপবর্গের প্রধানকর্ত্রী সনাতনী হেমাভরণ-সম্পন্না মা সর্ব্বজ্ঞ মহাদেবের সহিত নিত্যযুক্তা, বহুবিধ শোভাসম্পন্না হৈমবতী, উমা মূর্ত্তিতে ব্রহ্মতত্ত্ব ও আপনার তত্ত্ব প্রকাশ করেন।

এই মাতৃপূজায়—আত্মার শিবময় তুরীয় ব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া মুক্তিপদ প্রাপ্তি ঘটে। মায়ের পূজা ব্যতীত কাহারও গত্যন্তর নাই। দেবতাগণ দূরের কথা—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে মাতৃপূজা করিতে হইয়াছিল। জ্ঞানরূপে মা মুক্তির দ্বারে অবস্থিতা। মাতৃপূজা সাধনার সার, কর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম এবং ভক্তির অফুরন্ত প্রস্রবণ।

এই মাতৃপূজা বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে দ্বিবিধ। বাহ্য পূজাও মূর্ত্তিভেদে দ্বিবিধ। বিরাট-স্বরূপের ধ্যানরূপ এবং হস্ত পদাদিবিশিষ্ট প্রতিমার ধ্যানও বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মন্ত্রে আবাহন ও বিসর্জ্জনাদিরূপ পূজা। শান্ত সমাহিত চিত্ত, দম্ভ ও অহঙ্কারবর্জ্জিত এবং তন্নিষ্ঠ হইয়া অনন্তশীর্ষ অনন্তনয়ন, সর্ব্বশক্তিসমন্বিত পরাৎপররূপের পূজা—প্রথম বৈদিকী পূজা। ইহাই বিরাট রূপের রাজা।

মূর্ত্তি, পরিস্কৃত ভূমি, সূর্য্যমণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল, জল, বাণলিঙ্গ, যন্ত্র, হৃৎপদ্ম প্রভৃতি আধারে অর্দ্ধচন্দ্রশোভিতশেখরা চারি হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয়ধারিণী, আনন্দরূপিণী, পরাৎপরা দেবী জগদম্বিকার স্বীয় বিত্তানুসারে নানাবিধ উপচার দ্বারা দ্বিতীয় বৈদিকী পূজা উহাই ব্যষ্টিরূপের পূজা—

মূর্ত্তৌবা স্থণ্ডিলে বাপি তথা সূর্য্যেন্দুমণ্ডলে
জলেঽথবা বাণলিঙ্গে যন্ত্রেবাপি মহাপটে।

(দেবী গীতা ৯। ৩৮)

যাবৎ বাহ্য ক্রিয়া-কলাপাদি থাকিবে, তাবৎ এই ভাবে বাহ্য পূজার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, আন্তর পূজার অধিকার হইলে বাহ্য পূজা পরিত্যাগ হইবে। উপাধিবিরোহিত ব্রহ্মই আমার স্বরূপ, এই চিত্তবিলয়ের নামই আন্তর পূজা।

বাহ্যপূজা—প্রতিমাপূজা তিনপ্রকার, সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী—

সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈ নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।
মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতং।
পাঠস্তস্য জপপ্রোক্তঃ পঠেদ্দেবীমনাস্তদা।
দেবীসুক্তজপৈশ্চৈব যজ্ঞশ্চ বিষ্ণুতর্পণম্॥

(তিথিতত্ত্ব)

সাত্ত্বিকী পূজাতে জপ যজ্ঞ করিতে হয়, নিরামিষ নৈবিদ্য দিতে হয়। পুরাণে কীর্ত্তিত দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিতে হয়। দেবীসূক্ত জপ করিতে হয়। যজ্ঞ অর্থে তর্পণ।

রাজসী বলিদানৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ সামিষৈ স্তথা।

রাজসী পূজাতে বলিদান এবং সামিষ নৈবেদ্য দিতে হয়।

সুরামাংসা দ্যুপহারৈর্জপযজ্ঞে র্বিনা তু যা।
বিনা মন্ত্রৈস্তামসী স্যাৎ কিরাতানান্ত সম্মতাঃ॥

যেপূজাতে চিত্তশুদ্ধির কামনা, তাহাই সাত্ত্বিকী পূজা। যাহাতে বিষয়ভোগাদির বাসনা তাহাই রাজসী। আর যাহাতে পরানিষ্ট, কামাদির সম্ভোগ প্রভৃতি তামস কামনা, তাহাই তামসী পূজা।

অর্চ্চকস্য তপোযোগাদর্চ্চন স্যাতিশায়নাৎ।
অভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেব সান্নিধ্যমৃচ্ছতিঃ।

যে পূজাতে আত্মবলি, তপ, জপ, হোম, চণ্ডী ও গীতা পাঠ থাকে এবং ভক্তিশ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা থাকে, তাহাতেই দেবীর তুষ্টিসাধন এবং সান্নিধ্য লাভ হয়। শ্রদ্ধা ভক্তিসমন্বিত রাজসিক পূজা জগন্মাতা জগদম্বা গ্রহণ করেন, কিন্তু সাত্বিক পূজার তুলনায় উহা অতি নিম্ন স্তরে।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃত মশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।

(গীতা ৯।২৬)

ঐহিক পারত্রিক ফলকামনাশূন্য হইয়া কর্ত্তব্য অনুরোধে, শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে সমাহিত চিত্তে যে পূজা, তাহাই সাত্বিক যজ্ঞ বা পূজা। আর ঐহিক পারত্রিক সুখ সম্পাদকামনা করিয়া অথবা ধার্ম্মিকতার অভিমানপ্রণোদিত হইয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে যে পূজা, তাহাই রাজসিক পূজা। এই পূজায় অদৃষ্ট সঞ্চার, ধন, ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গাদিলাভ হয়। তামসিক পূজাও ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত হইলে তাহার ফল ইন্দ্রিয় উপভোগ এবং চরমে রাজসিক ভাবের অভ্যুদয়। তৎপরে অন্য পুণ্য কর্ম্মপ্রভাবে অধিক পরিমাণে রাজসিকগুণ সম্পন্ন হইয়া ধনীর গৃহে পুনরাবর্ত্তন করিতে হইবে।

আস্তিক্যবুদ্ধি, বিশুদ্ধভোজন, অতিথিভোজনে প্রবৃত্তি, অক্রোধ, সত্যবচন, মেধা সৎবুদ্ধি, ধর্ম্মভয়, ধর্ম্মবুদ্ধি, পরদারে অপ্রবৃর্ত্তি, ধৃতি, ক্ষমা, দয়া, ভাগবৎ বিষয়ে জ্ঞান, নিন্দিত কার্য্যে অনাসক্তি, বিনয় ও ধর্ম্মে মতি—এই সকল গুণ যত অধিক হইবে, তিনি তত অধিক সত্ত্বগুণের উর্দ্ধ সোপানে অধিরোহণ করিবেন। ক্রোধাধিক্য, তাড়নশীলতা, দাম্ভিকতা, সুখকামনায় সদা আসক্তি, মাদকতায় অনুরক্তি, কামচরিতার্থতায় তীব্র প্রবৃত্তি, অলীকবচনে ঘৃণারহিত্য অধীরতা, অহঙ্কার, ঐশ্বর্য্যা ভিমানে আনন্দ, রাজসিক প্রবৃত্তিঃ। আলস্য, দুষ্টমতি, শাস্ত্র ও ভগবানে বিশ্বাসবুদ্ধির হীনতা, নিন্দিত ও ঘৃণিত

অর্থাৎ বেশ্যাদিগমন এবং সুরাদিপান সুখজনক বুঝিয়া তাহাতে প্রীতি, নিদ্রাপ্রিয়তা সর্ব্বদা ক্রোধান্ধতা, মূঢ়তা, ইহাই তামসিক প্রকৃতির লক্ষণ। যে মানবে যে গুণের আধিক্য তিনি তৎপ্রকৃতি বলিয়া অভিহিত। সুতরাং তাদৃশপ্রকৃতিরপূজক ভেদে মাতৃপূজাও ত্রিধা বিভক্ত। মাতৃপূজার ইহাই শাস্ত্রীয় বিধান। কিন্তু মায়ের কৃতী পুত্র কর্ত্তব্যের দৃষ্টিতে দেখেন এবং বুঝেন, এই যে পরিদৃশ্যমানবিশালজগতে, এই শুক্রশোণিতসমন্বিতদেহ পাইবার পূর্ব্বে তাহারা এই দেহের বীজানুরূপ অতি সূক্ষ্মভাবে পিতৃদেহে অনুপ্রবৃষ্ট হইয়া তাহার সহিত এক দেহে বাস এবং তৎপর তথা হইতে মাতৃদেহে আসিয়া তাহার সহিত এক দেহে বাস এবং তাহার শোণিতে অনুপ্রাণিত হইয়া এই নরদেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। জনক-জননীর যত্নে, ও প্রতিপালনে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া শৈশব হইতে কিশোরে, কিশোর হইতে যৌবনে উপনীত হইয়াছেন। মাতা যেমন আপনার ভুলিয়া সন্তানের দুঃখে সুখে সমদুঃখিনী সুখিনী হইয়া পরমাদরে সাংসারিক পারিবারিক সুখদুঃখ শোকমোহ অভাব অভিযোগের মধ্যে পুত্রের সুখসম্পাদনে দৃষ্টি রাখিয়া তাহাতেই পরমানন্দ প্রাপ্ত হন, পিতাও সেইরূপ তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে জ্ঞানে, মানে, বিষয়ে, সৌজন্যে বিদ্যাবুদ্ধিতে ধর্ম্ম ও নীতিতে সর্ব্বাঙ্গীণভাবে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে একান্তভাবে প্রয়াস পান। সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, প্রজ্ঞা, আয়ু, সহিষ্ণুতা, তেজস্বিতা, সৌর্য্য, সৌকুমার্য্য, চরিত্র, ধর্ম্ম নিষ্ঠা প্রভৃতি প্রদীপ হইতে প্রজ্জ্বালিত প্রদীপান্তরের ন্যায় অবিকলভাবে সন্তানকে দান করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন, জনক-জননীই আত্মা ও দেহের অর্দ্ধার্দ্ধ দানে পুত্রের পৃথক সত্বা সংস্থাপন করেন। এই জন্যই শাস্ত্র পিতামাতাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরুরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং পিতামাতার পূজাতে অদৃষ্ট সঞ্চার, স্বর্গ এবং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ঘটে, ইহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই হেতুই এই সংসারে কৃতিপুত্রগণ কর্ত্তব্যের অনুরোধে, কর্ত্তব্য-বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া পিতার সংসারে থাকিয়া পিতার দ্রব্যাদি দ্বারা পিতা মাতার পূজা সেবা ও পরিচর্য্যা করেন। আবার কর্ত্তব্যজ্ঞানেই জনকজননী, সন্তানসন্ততির সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ-কামনায় মন প্রাণ উৎসর্গ করেন। কিন্তু এই ত্রিভুবনজননী, মাতৃরূপে এই বিশাল ত্রিভুবনের নিখিল জীবজন্তু সর্ব্বপ্রাণীর মায়ের কার্য্য করেন এবং পিতা হইয়া উহাদের সৎ, অসৎ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, নীতি, দুর্নীতি, কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য, গন্তব্য, অগন্তব্যের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রক্ষা করিয়া মঙ্গল বিধানের ব্যবস্থায় ব্রতীথাকেন। মা—কখন মা হইয়া মায়ের কার্য্য, আবার কখন বাবা হইয়া বাবার কার্য্য করেন। মাই বাবা আর বাবাই মা। মা ও বাবা একে দুই এবং দুয়ে এক। মা ও বাবা পরস্পর পৃথক্ নহে, উহাঁদের অবিনাভাবসম্বন্ধ অর্থাৎ মা বিরহিত বাবা, আর বাবা বিরহিত মা থাকিতেই পারেন না।

কৃতং দ্বেধা নগ শ্রেষ্ঠ স্ত্রীপু মানীতিভেদতঃ
শিব প্রধান পুরুষঃ শক্তিশ্চ পরমা শিবা।

(ভগবতী-গীতা)

মা সৃষ্টির জন্য নিজ রূপকে স্বেচ্ছাক্রমে স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। শিব—প্রধান পুরুষ, শিবা—পরমাশক্তি। শিব ও শিবা ব্রহ্মসম্পন্নশক্তি, উভয়াত্মক পরাৎপর ব্রহ্ম। মা ও বাবা উভয়াত্মক ব্রহ্মসম্পন্ন শক্তি, পরাৎপর ব্রহ্ম। বাবা ও মা সর্ব্বদাই ঐক্যভাব। মা ও বাবার কোন ভেদ নাই, যে মা সেই বাবা। মতিভ্রমে ভেদজ্ঞান হয়। এই এক অদ্বিতীয় নিত্যসনাতন ব্রহ্মবস্তুই সৃষ্টিকালে দ্বৈতভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

সুতরাং মায়ের পূজাই, মা ও বাবার পূজা ও বাবার পূজাও, বাবা ও মায়ের পূজা। স্বর্গ, মর্ত্ত, ও পাতাল এই ত্রিভুবন মায়ের সংসার। মাই এই ত্রিভুবনের প্রসূতি ও কর্ত্রী। ব্রহ্মা হইতে সামান্য কীট পর্য্যন্ত মায়ের সন্তান। আর এই ত্রিভুবনই মায়ের সংসারগৃহ, আর আমরা সকলেই মায়ের সংসার—গৃহের পরিবারান্তর্গত একান্নভোগী সন্তানসন্ততি। কৃতিপুত্রেরা যেমন পিতামাতার সংসারের দ্রব্যদ্বারা পিতামাতার সম্পত্তির আদায় উসুল দ্বারা পিতামাতার উদ্যানের ফল পুষ্পদ্বারা তাঁহাদের সেবা, ও পূজা করেন, জগন্মাতার কৃতিপুত্রেরা জগন্মাতার সংসার গৃহে অবস্থান করিয়া ঐ ভাবে মায়ের রাজ্য হইতে পত্র পুষ্প আহরণ করিয়া মায়ের চরণকমলে অর্ঘ্য দেন এবং সংসার-কাননের অমৃতোপম ফল আহরণ করিয়া মাকে নিবেদন করেন—এবং মহাপ্রসাদ বলিয়া নিজেরা গ্রহণ করেন। মায়ের রাজ্যের, মায়ের সংসারের, মায়ের কাননের ফল পুষ্প মাকে দিয়া মহাপ্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করা, মায়ের সন্তান-সন্ততিরূপে মায়ের সেবা পরিচর্য্যা করা, কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে মায়ের দ্রব্য মাকে দিয়া মায়ের পূজা, এ বড় মধুর পূজা এবং ইহাই প্রকৃত পূজা। যেমন পিতামাতার দ্রব্য পিতা মাতাকে না দিয়া নিজে ভোগদখল করা অপরাধ, পিতামাতার সেবা না করায় কর্ত্তব্যহীনতা জন্য অপরাধ, তেমনি ত্রিভুবন-জননী মায়ের বস্তু মাকে দিয়া মায়ের পূজা ও সেবা না করাও সেইরূপ মহাপরাধ, এই পূজাতে ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য হাঁকাহাঁকি ছুটাছুটি নাই; এমন শান্তিময় মধুর পূজা আর নাই। ইহাই নিষ্কাম পূজা।

এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে আমরা জীবিতকালে যখন যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করি, তাহা যেন তোমার পূজা, উপাসনা, সেবা, অর্চ্চনা স্বরূপ হয়। মা! আমি যখন যাহা উচ্চারণ করি, কথোপকথন করি, তাহা যেন তোমার জপ স্বরূপ হয়, আমি যখন যে ভাবে অঙ্গ সঞ্চালন করি, তাহা যেন মা তোমার পূজা উপাসনা মুদ্রারূপে পরিণত হয়, আমার ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ যেন তোমার চিন্ময়ী মূর্ত্তির প্রদক্ষিণ স্বরূপে পরিণত হয়। আমি যখন যাহা পান ভোজন করি, দয়াময়ি মা গো উহা যেন তোমার আহুতিরূপে প্রদত্ত হয়। নিদ্রার জন্য শয়ন যেন তোমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি স্বরূপ হয়। আমার সর্ব্ববাসনা যেন তোমাতে লয় হয়। আমার নিখিল শক্তি সংযোগ জন্য সুখ যেন আত্মার্পন স্বরূপ হয় তোমার পাদপার্শ্বে তোমার ঐ

রাঙাচরণে এই অকৃতি সন্তানের ইহাই প্রার্থনা মা প্রসন্নময়ী তোমার প্রসাদই এই দীন সন্তানের প্রার্থণা পূরণে নিদান তাই যুক্ত করে প্রর্থনা করি।

দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ।
প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য॥
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং।
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥

শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

চণ্ডী-রহস্য।

(৯)

(চণ্ডমুণ্ডবধ)।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ধূম্রলোচন ভস্মীভূত হইলে তদীয় বিক্রমশালী সৈন্যগণ পলায়ন না করিয়া দেবীর উপর বাণ, শক্তি, পরশ্বধ প্রভৃতি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্রসমূহ অজস্রধারে বর্ষণ করিতে লাগিল।

দেবী এই সকল অস্ত্রবর্ষণের নিবারণে বা অসুরসৈন্যপ্রমথনে নিজে কোনওরূপ চেষ্টা করিলেন না।

দেবীর সেই স্বকীয় অসামান্য বাহন সিংহ ক্রোধে কেশর কম্পন করিতে করিতে ভৈরব-নিনাদে যুধ্যমান অসুর-সৈন্যের উপর নিপতিত হইয়া কোনও কোনও অসুরকে করপ্রহারে, কাহাকেও বা মুখবিবরে ফেলিয়া এবং কোনও কোনও অসুরকে অধর দ্বারা নিহত করিল।

ক্রোধদৃপ্ত মৃগেন্দ্র নখদ্বারা কোনও কোনও অসুরের উদর পাটিত করিল। চপেটাঘাতে বা কাহারও মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিল। যুদ্ধোন্মত্ত মহাসিংহ রণক্ষেত্রে অপর অসুরগণের মস্তক ও হস্ত শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল এবং অন্যান্য অসুরের উদর বিদারণপূর্ব্বক রুধির পান করিতে লাগিল। দেবীর বাহন সিংহ এইরূপে ক্ষণকাল মধ্যে অসুরসৈন্য সংহার করিয়াছিল।

দৈত্যনায়ক শুম্ভ শুনিলেন,— দেবী ধূম্রলোচনকে ভস্মসাৎ করিয়াছেন, আর তদীয় বাহন সিংহ সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে; অমনি ক্রোধে তাহার অধর স্পন্দিত হইতে লাগিল,—তিনি চণ্ডমুণ্ড নামক সেই প্রসিদ্ধ মহাসুরদ্বয়কে আদেশ করিলেন; হে চণ্ড!

হে মুণ্ড! তোমরা বহুসৈন্যে পরিবৃত হইয়া সেখানে যাও, এবং সেই রমণীকে কেশাকর্ষণ, বন্ধন বা যে কোনও উপায়েই হউক এখানে শীঘ্র আনয়ন কর।

যদি তোমরা ইহাতে সংশয় বোধ কর,—অর্থাৎ বন্ধন করিয়া আনিতে পারিব কিনা ইত্যাদি সংশয় তোমাদের হৃদয়ে উদিত হয়, তাহা হইলে সমস্ত সৈন্য নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া একযোগে তাহাকে বেষ্টন করিবে এবং এমনভাবে প্রহার করিবে যে যাহাতে মৃত্যুও না হয়, অথচ হতপ্রায় দুর্ব্বলা হইয়া যায়, তাহার পর সিংহকে নিহত করিয়া সেই মৃতপ্রায়া দুষ্টা রমণীকে লইয়া এখানে শীঘ্র আগমন কর।

শুম্ভাসুর সেই অলোকসামান্যরূপশালিনী রমণীর সম্ভোগলালসা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। তিনি ধূম্রলোচনকে এবং তদীয় সৈন্যদলকে নিহত করিয়াছেন করুন, কিন্তু এখনও যদি শুম্ভাসুরকে ভজনা করেন তাহা হইলেই শুম্ভ কৃতার্থ; তজ্জন্যই বলিতেছেন, "কেশাকর্ষণ বা বন্ধন করিয়া লইয়া আসিবে।" ফলকথা জীবিতাবস্থায়ই তাহাকে আনিতে হইবে, ইহাই রাজার অভিপ্রায়।

তমঃস্বভাব চণ্ডমুণ্ড আজ জগদম্বার সম্মুখীন হইতেছে, তাহারা একাকী নহে,—রাজ আদেশে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্য সমভিব্যাহারে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দেবীকে ধরিবার জন্য অভিযান করিতেছে। চণ্ডমুণ্ড দূর হইতেই দেখিতে পাইল, সেই রমণী হিমালয় পর্ব্বতের কাঞ্চনময় উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে সিংহের উপর অবস্থানপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিতেছেন, সেই ঈষৎ হাস্যই যেন দানবগণের বৃথা আড়ম্বরের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছে।

অসুরসৈন্য দেবীকে দেখিয়াই ধরিবার জন্য উদ্‌যোগ করিতে লাগিল। অগ্রগামী অসুরদল হস্তস্থিত মণ্ডলীকৃত আকৃষ্ট সশর শরাসন ও অসি ধরাতলে স্থাপনপূর্ব্বক উর্দ্ধমুখে পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিতে লাগিল; এবং পশ্চাদ্‌বর্ত্তী সৈন্যদল সেই সকল অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্ব্বক তাহাদের সাহায্যকারিরূপে অনুগমন করিল।

তমঃপ্রধান অজ্ঞান অরাতিদলের ঈদৃশ উদ্ধত ভাব দর্শন করিয়া ভগবতী জগদম্বা ক্রোধাবিষ্টা হইলেন, অমনি তাঁহার বদনমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল; দেখিতে দেখিতে সেই ভ্রূকুটিকুটিল ললাটফলক হইতে করালবদনা অতিভীষণা অসিপাশধারিণী কালিকা মূর্ত্তি প্রকাশিত হইলেন। তাহার বদনমণ্ডলের ক্রোধজনিত কৃষ্ণচ্ছায়াই যেন সেই ভীষণা কালিকা মূর্ত্তির অব্যক্তাবস্থায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। কালিকার বদনকুহর অতি বিস্তৃত, জিহ্বা লোলায়মানা, তাঁহার চক্ষুস্ত্রয় কোটরস্থ ও রক্তিম। তিনি ভীষণ নিনাদে দিঙ্মণ্ডল আপূরিত করিতেছেন, তাহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, গলে মুণ্ডমালা হস্তে খট্বাঙ্গ ও শরীর কৃশা।

কালিকার আবির্ভাব হইল, এখন আর কৌষিকীর বদনের মলিনতা দৃষ্ট হইতেছে না। তিনি আবার কষিতকাঞ্চনোজ্জ্বল বদনমণ্ডল ধারণপূর্ব্বক কাঞ্চনশৃঙ্গে সিংহপৃষ্ঠে বসিয়া সেইরূপ ঈষৎ হাস্য করিতেছেন। এখন আর যুদ্ধের সহিত তাঁহার কোনও সংস্রব নাই, তদীয় জগৎ-

সংহারক তমোগুণসমুত্থিত ক্রোধরাশিই যেন—পৃথক্‌ভূত ও মূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক কালিকারূপে আবির্ভূতা হইয়া আক্রমণে উদ্যত অসুরদলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। দানবসৈন্য দেবীকে বন্ধন করিবার জন্য দ্রুতবেগে পর্ব্বতশৃঙ্গে উঠিতেছে,—আর এদিকে কালিকা মহাসুরগণকে নিহত করিতে করিতে অতি ত্বরাসহকারে সেই উদ্‌গমনশীল সৈন্যদলের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে একে একে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ওঃ কি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ! এমন যুদ্ধ ত কেহ দেখে নাই। ধনুঃ, বাণ, মুষল, মুদ্গর লইয়া যুদ্ধ হয়, রণক্ষেত্রে রক্তের নদী বহিতে থাকে, হতাহত সৈন্যগণের শরীরস্তূপে সংগ্রামভূমি দুর্গম হইয়া উঠে। কিন্তু এই যুদ্ধ হইতেছে অন্যরূপ, অপরূপার সকলই অপরূপ! অসুরসংহারিণী করালিনী আজ মহারাক্ষসী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, এ যেন প্রলয়াবস্থা! অসুরসৈন্যমধ্যে কি রথী, কি পদাতি, কি গজারোহী, কি অশ্বারোহী, যেই তাহার সম্মুখে পড়িতেছে, তাহাকেই বামহস্তে আকর্ষণ পূর্ব্বক মুখে নিক্ষেপ করিয়া দন্তপাটিদ্বারা অতি ভীষণশব্দে চর্ব্বণ করিতেছেন।

হস্তীপক, আরোহী, বীর পার্শ্বরক্ষক ও হস্তীর গলদেশে ঘণ্টার সহিত হস্তীটীকে মুখে ফেলিয়া ভক্ষণ করিতেছেন। অশ্বের সহিত অশ্বারোহীকে, রথের সহিত সারথিকে মুখে নিঃক্ষেপ করিয়া কড়মড়শব্দে চর্ব্বণ করিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে সৈন্যগণ প্রায় বিলীন হইয়া গেল, যুদ্ধভূমিতে একবিন্দু রুধির নাই, একটী শবদেহ নাই, একটী ভগ্নরথ, আহত অশ্ব বা গজ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। অথচ সমস্ত সৈন্য নিহতপ্রায়। এখন আবার কাহাকে অসিদ্বারা, কাহাকে খট্টাঙ্গদ্বারা এবং কোনও কোনও অসুরকে নখদ্বারা নিহত করিতেছেন, দৈত্যগণ দেবীর উপর যেসকল বাণ বর্ষণ করিতেছিল, কালিকা মধ্যপথ হইতে সেই সকল আকর্ষণপূর্ব্বক নিজমুখে নিঃক্ষেপ করিয়া চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে সৈন্যদল নিহত হইতে দেখিয়া চণ্ডাসুর অতি ভীষণভাবে কালিকাকে আক্রমণ করিল, এবং অজস্রভাবে অস্ত্রবর্ষণ পূর্ব্বক শরজালে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল।

অসুরনিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহ কালিকার বদনমণ্ডলে প্রবেশকালে মহামেঘ-প্রবিষ্ট সূর্য্যকিরণ-সমূহের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছিল।

তাহার পর কালিকা চর্ম্মকোষ হইতে হং শব্দে মহা অসি নিষ্কাষণপূর্ব্বক চণ্ডের অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং বামহস্তে কেশ আকর্ষণপূর্ব্বক তাহার মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। চণ্ড নিহত হইলে পর মুণ্ডাসুর সত্বর অগ্রসর হইল, কালী খড়্গাঘাতে তাহাকেও নিপাতিত করিয়া চণ্ড ও মুণ্ডের মস্তক লইয়া অম্বিকার নিকট উপস্থিত হইয়া অট্টহাস্যে বলিতে লাগিলেন,

মযা তবাত্রোপহৃতৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাপশূ।
যুদ্ধযজ্ঞে স্বয়ং শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ হনিষ্যসি॥

আমি তোমার জন্য এই চণ্ডমুণ্ডরূপ মহাপশুদ্বয়কে উপহার আনিয়াছি, যুদ্ধযজ্ঞে তুমি নিজেই শুম্ভ ও নিশুম্ভকে নিহত করিও।

চণ্ডমুণ্ডকে উপহার পাইয়া সেই কল্যাণী চণ্ডিকা মধুর স্বরে কালীকে বলিলেন,—

যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবী ভবিষ্যসি ॥

তুমি যখন চণ্ডমুণ্ডকে লইয়া আসিয়াছ, এই নিমিত্ত তুমি চামুণ্ডা নামে লোকে প্রথিতা হইবে।

ভগবতীর চণ্ডমুণ্ড বধলীলায় বিশেষত্ব এই যে,—এস্থলে তদীয় অঙ্গনিঃসৃতা কালী চণ্ডমুণ্ডকে নিহত করিলেন,—দেবী স্বয়ং যুদ্ধে অগ্রগামিনী হইলেন না।

পূর্ব্বে একবার দেবগণের স্তুতিকালে গৌরীদেহ হইতে কৌষিকী বহির্গত হইলে সেই দেহ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল, এবং তাহার নাম হইল কালিকা, তিনি হিমাচলকৃতাশ্রয়া এবং বর্ত্তমান চণ্ডমুণ্ড-সংগ্রামে দেবীর ক্রোধরক্ত মুখমণ্ডল হইতে অপর কালীর প্রকাশ হইল, তবে কি পূর্ব্বকথিত কালীই আবার কৌষিকীদেহে বিলীনা হইয়াছিলেন এবং চণ্ডমুণ্ড-সংগ্রামে পুনর্ব্বার প্রকাশ পাইলেন? বস্তুতঃ উভয় কালী এক নহেন, পূর্ব্ববর্ণিত কালীর নাম কালরাত্রি * এবং চণ্ডমুণ্ডসংহারিণী কালীর নাম চামুণ্ডা। চামুণ্ডা আদ্যাশক্তি শ্রীশ্রীদক্ষিণা কালিকাও নহেন, চামুণ্ডা দ্বীপিচর্ম্মপরিধানা, আর আদ্যা দিগ্‌বসনা, চামুণ্ডা খট্টাঙ্গ, অসি চর্ম্ম ও পাশধারিণী, আদ্যা অসিমুণ্ডবরাভয়করা, আদ্যা শবরূপ মহাদেবের বক্ষঃস্থলে দণ্ডায়মানা, আর চামুণ্ডা কবন্ধবাহনাসীনা।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, ধূম্রলোচন বধে স্বয়ং কৌষিকী তাহাকে ভস্মসাৎ করিলেন, আর চণ্ডমুণ্ড-বধে অপর শক্তি আবিষ্করণের কারণ কি?

জ্ঞানী, কর্ম্মী ও নাস্তিকভেদে লোক তিন প্রকার, জ্ঞানী জ্যোতির্ম্ময় দিব্য দেবযানপথে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, কর্ম্মী ধূমযানে এবং নাস্তিক তমোমার্গে লোকান্তর গমন করিয়া থাকেন।

জন্মান্তরীয় সৎকর্ম্মের আতিশয্যে ধূম্রলোচনের তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইয়াছিল—তাহাতেই ধূম্রলোচন পরম জ্যোতীরূপা ব্রহ্মময়ীতে সোজাসোজীভাবে বিলীন হইল, মাতৃকুলে যাইতে আর তাহার অপর সাহায্যের প্রয়োজন হইল না।

কিন্তু চণ্ডমুণ্ড অজ্ঞানাচ্ছন্ন, দৈত্যকুলের মোক্ষসহায়ক পুষ্কল পুণ্যের প্রেরণায় জগন্মা একবার সেই অজ্ঞানান্ধ চণ্ডমুণ্ডের নেত্রাতিথি হইয়াছিলেন। জ্ঞানেই হউক আর অজ্ঞানেই হউক, যখন তাঁহারা একবার ব্রহ্মময়ীকে দেখিতে পারিয়াছে, সহস্র সহস্র পাপজালে সমাচ্ছন্ন থাকিলেও তাহাদের মোক্ষলাভ ঘটিবেই ঘটিবে।

* নিসৃতায়ান্তু তস্যাং সা পার্ব্বতী তনুব্যত্যয়াৎ।
কৃষ্ণরূপাথ সাঞ্জাতাঃ কালিকা সা প্রকীর্ত্তিতা ॥৩॥
মসীবর্ণা মহাঘোরা দৈত্যানাং ভয়বর্দ্ধিনী।
কালরাত্রীতি সা প্রোক্তা সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥ ৪ ॥
(দেবীভাগবত ৫ম স্কন্ধ, ২৩ অঃ)

"ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"

সেই পরাবর পরমাত্মদর্শনে তাহাদের অনাদি কর্ম্মবাসনা ক্ষীণ হইলেও; জ্ঞানী ধূম্রলোচনের ন্যায়, অজ্ঞান চণ্ডমুণ্ডের অর্চ্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটিতে পারে না তাহাতেই চণ্ডমুণ্ড তমো-মার্গে সেই তামসীমূর্ত্তির সহায়তায় ব্রহ্মময়ীর সান্নিধ্য লাভ করিয়াছে।

যাহারা মহামায়ার বিদ্বেষ্টা তাহারা পশুরূপে জন্মগ্রহণ করে,—জগদম্বা তাহাদিগকে বলি-রূপে গ্রহণপূর্ব্বক কৃতার্থ করিয়া থাকেন।

আজ চণ্ডমুণ্ড মহাপশুর মুণ্ড ছেদন করিয়া চামুণ্ডা ভগবতীকে উপহার প্রদান করিতেছেন, ইহা কি সেই পশুবলি বিহিত মুণ্ড গ্রহণ নহে?

শক্তিবিদ্বেষী অজ্ঞানান্ধ পশুরূপে জন্মিলে পর-বলিরূপে জগদম্বা তাহাকে গ্রহণ করেন, ইহাই আগমের সিদ্ধান্ত। অজ্ঞান চণ্ডমুণ্ড ইহ দেহেই পশুভূত, তজ্জন্যই কালী তাহাদিগকে পশুর ন্যায় মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া ভগবতীর পাদপদ্মে অর্পণ করিতেছেন!

এই নিমিত্তই স্বয়ং ব্রহ্মময়ী তাহার সংহারসাধনে পরাঙ্মুখী হইয়া স্বকীয় সংহারিণী তামসী মূর্ত্তি আবিষ্কারপূর্ব্বক তাহাদের সদ্গতি প্রদান করিলেন। ধন্য জগদম্বার মাতৃস্নেহ! ধন্য ব্রহ্মময়ীর অপক্ষপাত বিচার! চণ্ডমুণ্ড অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়াও পশুরূপে দেবীর পাদপদ্মে উপহৃত হইয়া সদ্গতি লাভ করিল।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্যসাঙ্খ্যতীর্থ।

বালিকা-বিদ্যালয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার আরম্ভ হইতেই শিক্ষিত হিন্দু-যুবকদিগকে বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত উৎকট আগ্রহান্বিত দেখা যাইতেছে। আগ্রহও ব্যর্থ হয় নাই। প্রত্যেক জেলা ও মহকুমায় বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অনেক পল্লীতেও বালিকা-বিদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায়। বিবাহে যাঁহারা কন্যা দেখিতে আসেন তাঁহারাও কন্যার বিদ্যা পরীক্ষা করিতে ভোলেন না।

বিদ্যোৎসাহী ও শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ যাহাই বলুন না কেন, আমরা কিন্তু বালিকা-বিদ্যালয়গুলি দ্বারা ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক দেখিতে পাই। স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সময় অতি সংকীর্ণ। ১০ বৎসর বয়স হইতে ১২।১৪ বৎসরের মধ্যেই অধিকাংশ বালিকার বিবাহ হইয়া থাকে। এখন পাত্রগণের অত্যাধিক্যে কন্যাগণের বিবাহ এক প্রকার অসাধ্য হওয়ায়, অনেক বালিকাকে যৌবনে অবিবাহিতা থাকিতে হইলেও কোন বিদ্যালয়ে ১০।১১ বৎসর বয়সের অধিক বয়স্কা বালিকা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা, তাহাতে ৯।১০ বৎসরের অধিক বয়স্কা কন্যা বিদ্যালয়ে প্রেরণ নিরাপদও

মনে করি না। এই সংক্ষিপ্ত সময় মধ্যে বালিকাগণ যে পরিমাণ লেখাপড়া শিখে তাহা অতি সামান্য। সে শিক্ষা অশিক্ষা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ তদ্দ্বারা অনিষ্ট যথেষ্ট হয়।

শিক্ষয়িত্রী মধ্যে চরিত্রবতী প্রায় দেখা যায় না। যিনি যাহাই বলুন না কেন, স্বাধীনা যুবতী স্ত্রীলোককে আমরা কোন ক্রমেই বিশ্বাস করিতে পারি না। সমাজব্যবস্থাপক মনু বর্ত্তমান উদারচেতাদিগের পক্ষে সংকীর্ণবুদ্ধি বলিয়া গণ্য হইলেও আমরা মনুকেই অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করি। মনু স্ত্রীস্বাধীনতার বিরোধী, সুতরাং আমরাও তদ্বৎ। যে শিক্ষয়িত্রী যৌবনে স্বাধীনবৃত্তি-অবলম্বিতা, তদাদর্শে কোমলমতি বালিকাদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে যে কুবীজ প্রক্ষিপ্ত হয়, যথাসময়ে তাহার কুফল সমুৎপাদন অপরিহার্য্য। যাহাদিগের সহিত নিকট রক্তসম্বন্ধ নাই, তাদৃশ পুরুষও স্ত্রীশিক্ষকতার অযোগ্য। বালিকা-বিদ্যালয়ে যে সকল শিক্ষক নিযুক্ত হয়, তাঁহাদিগের বেতন অল্প, শিক্ষাও যৎসামান্য, তাঁহাদিগের চরিত্রও সুগঠিত নহে, তাঁহারা বেতনের অল্পতাহেতু সপরিবারেও থাকিতে পারে না। বিদ্যালয়ে বা বাড়ীতে বালিকাগণের পক্ষে তাদৃশ শিক্ষক Private teacher) সুসঙ্গতও নহে, নিরাপদ বলিয়াও মনে করি না। অনেক স্থলে যে কুফল প্রত্যক্ষ করি নাই, তাহাও নহে।

সময় সংকীর্ণ জন্য লেখাপড়া অত্যন্ত কম শিখিলেও দোষশিক্ষা নিতান্ত কম হয় না। শিক্ষয়িত্রী অধিকাংশ স্থলেই অহিন্দু। তাহাদিগের আচার-ব্যবহার উপদেশ সমস্তই বিরুদ্ধ। তাহারা যেভাবে বালিকাগণকে প্রস্তুত করে, তাহাতে বালিকাগণ আমাদিগের গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের পক্ষে ঘোর অযোগ্য হইয়া উঠে। শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী দ্বারা বালিকাগণের অন্তরে যে সকল দোষ বদ্ধমূল হইয়া যায়, গৃহস্থালীর পক্ষে তাহা বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। স্ত্রীলোকের ধর্ম্মানুরক্তিই হিন্দুসমাজের পরম গৌরব, এ শিক্ষা সে গৌরবেরও মূলচ্ছেদক।

বিদ্যালয়ে নানা জাতীয়া বালিকা একত্রে মিলিত হওয়ায় তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর চরিত্র-বিনিময় অপরিহার্য্য। লোকে বহু যত্নে সৎ হয়, কিন্তু অনায়াসে অসৎ হয়। সাধুতা যত্নে রক্ষা করিতে হয়, অরক্ষিত থাকিলে অসাধুভাব লক্ষিত বা অলক্ষিতভাবে হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার করিয়া বসে। তজ্জন্য বালিকা-বিদ্যালয় দোষ-বীজসমাকীর্ণ।

বাঙ্গালা ভাষার এখনও বাল্যাবস্থা। বাঙ্গালায় নাটক-উপন্যাস যথেষ্ট হইলেও জ্ঞানপ্রদ পুস্তক অতি দুর্লভ। বাঙ্গালা পড়িয়া কেহ জ্ঞানী হয় না, কেহ পণ্ডিত বলিয়াও সম্মান পায় না। সুলেখকও কেহ হয় না। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তকাদি লিখেন, তাঁহারা ইংরাজী, সংস্কৃত বা অন্য কোন ভাষাভিজ্ঞ। উচ্চশিক্ষার পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। বালিকাগণ বিদ্যালয়ে যৎসামান্য লেখাপড়া শিখিয়াই নাটক উপন্যাসাদি পড়িতে আরম্ভ করে। নাটকউপন্যাসাদি পাঠ করিতে বা বুঝিতে কোন ক্লেশ নাই। সামান্যরূপ অক্ষর-পরিচয় হইলেই নাটকাদি পড়িতে পারা যায়। অক্ষর পরিচয় না হইলেও নাটকাদি বুঝিতে পারা যায়। এ নিমিত্ত মেয়েমহলে নাটক-উপন্যাসাদির অত্যধিক প্রাধান্য। নাটক-উপন্যাস অলসকল্পনা সমুদ্দীপক ও বিলাসতৃষ্ণা প্রবর্দ্ধক। যে সকল বালক নাটক-

উপন্যাসানুরাগী সংসারে তাহারা অকর্ম্মণ্য। কর্ত্তব্যবিমুখতাহেতু তাহারা উন্নতি করিতে পারে না। নাটকোপন্যাসাধ্যায়িনীগণ দ্বারা গার্হস্থ্য ক্রিয়াকলাপ সুসম্পন্ন হইতে পারে না। তাহারা রমণী বা কামিনী হইতে পারে, সহধর্ম্মিণী বা গৃহিণী হইতে পারে না। হিন্দুর ঘরকন্নার পক্ষে বিদ্যালয় সংসৃষ্ট বালিকাগণ অকর্ম্মণ্যা।

সতীত্বের উপর হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠিত। নানা দোষে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও আমরা এখন পর্য্যন্ত সতীত্বগর্ব্বে গর্ব্বিত। সুসভ্য অন্য কোন জাতি উচ্চবক্ষে এ গর্ব্ব প্রকাশে সাহসী হয় না। বর্ত্তমান শিক্ষা সতীত্বের বিরোধী। শিক্ষিতেরাও বাঁধা প্রেম ভালবাসেন না, অন্যে স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য চেষ্টান্বিত, তাঁহাদিগের আদর্শে ও উপদেশে গঠিতচরিত্রা শিক্ষিতাগণের ও তৎপথানুসরণ স্বাভাবিক। এখন পর্য্যন্তও যে সতীত্বাভাস দেখা যাইতেছে তাহা অজ্ঞানাচ্ছন্ন হিন্দুসমাজের পরম্পরাগত অন্তর্নিহিত কুসংস্কারের ফল। জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষণের যে চেষ্টা চলিতেছে, তৎপ্রভাবে পরম্পরাগত কুসংস্কার দূর হইয়া সার্ব্বজনীন উদার প্রেমের অবাধ জ্যোতিবিকাশমান হইলে আমাদিগের সেই কুসংস্কারাশ্রিত গর্ব্ব বিলীন হইয়া যাইবে। উদারচেতা শিক্ষিতগণ তাদৃশ জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ ভালবাসিতে পারেন, আমরা কিন্তু সেই কুসংস্কারান্ধকারই ভালবাসি। তাই বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা আমাদিগের সংকীর্ণ বুদ্ধিতে কুশিক্ষা, সুতরাং আপত্তিজনক। অনেকে হয় তো বলিতে পারেন, তোমরা যে সতীত্বের গর্ব্ব কর, তাহার কি কোথায়ও অপলাপ হয় নাই? স্বীকার করি অপলাপ দেখা যায় এবং আমাদিগের জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মহিলাগণেরও জ্ঞানসঞ্চারহেতু দিন দিন সেই অপলাপের বৃদ্ধিও দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু তথাপিও কাহাকে প্রশস্ত রাজ বর্ত্ম প্রদর্শন ভাল মনে করি না। গভর্ণমেণ্টের কঠোর শাসনসত্ত্বেও চৌর্য্য দস্যুতা খুন যখন সর্ব্বদাই দেখা যায় বলিয়া অরাজকতা প্রার্থনীয় নহে।

হয় তো কেহ কেহ বলিতে পারেন যে স্ত্রীশিক্ষা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন—

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াপি যত্নতঃ।

তদুত্তরে এইমাত্র বক্তব্য যে হিন্দুসমাজ কখনও স্ত্রী শিক্ষায় উদাসীন ছিলেন না, এখনও উদাসীন নহেন। বর্ণজ্ঞান না হইলেই যে শিক্ষা হয় না তাহা নহে, বরং বর্ণজ্ঞান অনেক সময় সুশিক্ষার অবসাদক। যে নিরক্ষর লোকসমূহ তাজমহলাদি প্রস্তুত করিয়া ছিল, তাহারা বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনীয়ার হইতেও সুশিক্ষিত। বর্ত্তমান শিক্ষায় গৃহ-নির্ম্মাণের সে জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা বহু যত্নে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেন, তাঁহারা বিদেশীয় উপদেশে অত্যল্পকালস্থায়ী গৃহ মাত্র নির্ম্মাণ করিতে পারেন, পূর্ব্বগত নিরক্ষর রাজমিস্ত্রিদিগের তুলনায় ইঁহারা বস্তুতঃ অশিক্ষিত।

আমাদিগের প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে স্ত্রীশিক্ষার বিদ্যালয় ছিল। স্ত্রীলোকেরা বাল্যে পিতৃগৃহে, যৌবনে স্বামি গৃহে প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় শিক্ষা করিয়া সুদক্ষা গৃহিণীতে পরিণতা

হইতেন। যে সংসারে যে অবস্থা, সে সংসারের স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা তদনুরূপ হইত। গৃহ-কার্য্যের জন্য তাহারা অন্যের মুখাপেক্ষা করিত না। আয়ের অনুরূপ ব্যয়ের বন্দোবস্ত করিয়া বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন লইয়া তাহারা দক্ষতার সহিত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। দৈববিড়ম্বনায় নিঃসহায় হইয়া পড়িলেও চরিত্র ও ধর্ম্ম অক্ষুন্ন রাখিয়া সদুপায় দ্বারা সংসার চালাইতে সক্ষম হইত। স্ত্রীলোকদিগকে এখন যেরূপে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে সম্ভবতঃ অন্ন প্রস্তুত করিতে ও পাকপ্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাপ নির্ণয়ার্থে বিজ্ঞানবিৎ ডাকিতে হইবে। পূর্ব্বে গৃহকর্ত্রীগণ সুচিকিৎসক ছিলেন, দ্রব্যগুণে তাহাদিগের বিলক্ষণ অধিকার ছিল, পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থাও তাঁহারা সুন্দররূপে করিতে পারিতেন। ফলতঃ চিকিৎসায় তাঁহাদিগের জ্ঞান বর্ত্তমান সিভিল-সার্জ্জনদিগের অপেক্ষা কম ছিল বলিয়া মনে হয় না! কেননা পূর্ব্বের গৃহকর্ত্রীদিগের চিকিৎসায় মৃত্যু সংখ্যা বর্ত্তমান ডাক্তারী চিকিৎসা হইতে অনেক কম। রোগীর সংখ্যাও তৎকালে অপেক্ষাকৃত কম হইত। পূর্ব্বে গৃহিনীরাই অধিকাংশ রোগের চিকিৎসা করিতেন। লোকেও তৎকালে দীর্ঘজীবী হইত। এখনকার ন্যায় মাথা ধরিলেই ডাক্তার ডাকিতে হইত না।

বর্ত্তমানে স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহাতে সামান্য বর্ণবোধ মাত্র শিক্ষা হয়, গৃহস্থস্ত্রীর প্রয়োজনীয় অন্য কিছুই শিক্ষা হয় না। সুতরাং ঈদৃশ শিক্ষাকে অশিক্ষা বা কুশিক্ষা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে শিল্পকার্য্য সম্বন্ধে কোন কোন স্থলে যাহা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাও অকর্ম্মণ্য। তদ্দ্বারা সংসারের কোন উপকার হয় না, বরং অপকার যথেষ্ট। অকর্ম্মণ্য কারপেট বা জুতা প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় ও যে সময় আবশ্যক, সেই অর্থ ও সময়ের সদ্ব্যবহার হইলে সংসারের অনেক উপকার হইতে পারে।

চিঠি পত্র লেখা ও হিসাবাদি রাখা ভিন্ন বর্ত্তমান শিক্ষার অন্য কোন উপকারিতা দেখা যায় না। পূর্ব্বে বিষয়স্থলে পরিবার লইয়া যাইবার প্রথা ছিল না, তজ্জন্য স্ত্রীলোকের লেখাপড়া না জানায় কিঞ্চিৎ অসুবিধা হইত বটে, কিন্তু এখন পরিবার লইয়া কর্ম্মস্থলে যাইবার প্রথা প্রচলিত হওয়ায়, সে অসুবিধা নগণ্য হইয়াছে। পূর্ব্বে নিরক্ষরা স্ত্রীলোকেরা মুখে মুখে যে হিসাবাদি রাখিত, তাহাও যে বিশেষ অসুবিধাজনক ছিল তাহা নহে। তবে লিখিয়া রাখিতে পারিলে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ সুবিধাজনক হয় বটে, কিন্তু তাদৃশ সামান্য সুবিধার্থে ধর্ম্মকর্ম্ম নষ্ট করা সুবোধের কর্ম্ম বলিয়া মনে হয় না। যদি স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্ম ঠিক রাখিয়া ও উহা-দিগকে গৃহকর্ম্মের উপযোগিনী করিয়া বর্ণজ্ঞান শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইতে পারে, তবে তাহা করা মন্দ নয়। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা যেরূপ করা হইয়াছে, তাহা সামাজিক সুখশান্তির প্রতি-কূল্ ইহার উপকারিতা অপেক্ষা অপকারিতাই যখন অত্যধিক, তখন এরূপ শিক্ষা না দেওয়াই উচিত। ইতি পূর্ব্বে এরূপভাবে স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও জগতে অতুলনীয়া স্ত্রীলোকগণ যখন হিন্দুকুলমাত্র গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, তখন এরূপ কুৎসিতভাবে বালিকাদিগকে শিক্ষা

দিয়া পরম পবিত্রা হিন্দু মহিলাদিগের ইহকাল পরকাল নষ্ট করিবার ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয়তা কিছুই দেখা যায় না।

সীতা সাবিত্রী সতীত্বে অতুলনীয়া। জলন্তানলে আত্মসমর্পণকারিণী রাজপুতরমণীগণ জাতীয় গৌরবের আদর্শ, মিরাবাইএর ভগবৎপ্রেমের তুলনা নাই, লক্ষ্মীবাই বীররমণীর শীর্ষ-স্থানীয়া। রাণীভবানীর ন্যায় প্রাতঃস্মরণীয়া রমণী জগতের অন্য কোথাও বিকাশ পায় নাই। বালবিধবা রাণীশরৎসুন্দরী ব্রহ্মচর্য্যের জ্বলন্ত আদর্শ, রাণীস্বর্ণময়ী, রাণীরাসমণি, জাহ্নবী চৌধুরাণী প্রভৃতি রমণীগণ জগতে অতুলনীয়া। শিক্ষা দ্বারা জগতের কোন জাতি কখনও এরূপ স্ত্রীমহিমা বিকাশ করাইতে পারে নাই।

যাহাদিগের আদর্শ লইয়া এইরূপ অসংস্কৃতভাবে অপরিণামদর্শিতাসহ স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহারা যখন সতীত্বে ও ধর্ম্ম শিক্ষায় হিন্দুসমাজের নিকৃষ্টতম বর্ণের স্ত্রীলোক হইতেও নিকৃষ্ট, তখন তাদৃশ কদাদর্শ সম্বর্জ্জনই বিধেয়।

বারবনিতাগণের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদির সৌষ্ঠবদর্শনে দুঃস্থ কুলকামিনীর তদাদর্শ-গ্রহণ প্রশস্ত বলিয়া মনে করিনা।

গার্গী, অরুন্ধতী, আত্রেয়ী প্রভৃতি হিন্দুরমণীগণ জ্ঞানবিদ্যায় জগতে আদর্শস্থানীয়া। ঋষি-কন্যাগণ প্রায় সকলেই লেখাপড়া জানিতেন। কিন্তু তাঁহাদিগের শিক্ষাপ্রণালী অন্য প্রকার ছিল। তাৎকালিক ব্রাহ্মণচরিত সংসারে অতুলনীয়। এমন নির্লোভ এমন চরিত্রবান্ লোক যে মনুষ্যের মধ্যে হইতে পারে, বর্ত্তমান যুগে কেহ তাহা কল্পনায়ও স্থান দিতে পারে না। ব্রাহ্মণের অনিন্দিত বিশুদ্ধিহেতু, সমাজ-দরিদ্রব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বসম্পদের অধিকারী বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মণে অদেয় কিছুই নাই, ব্রাহ্মণের সর্ব্বত্র অবারিত দ্বার ছিল। কোন দেশে কোন কালে কোন জাতি কাহাকেও এরূপ অধিকার দিতে পারে নাই। ঈদৃশ ব্রাহ্মণ তৎকালে শিক্ষক ছিলেন। সুতরাং শিক্ষাজ্ঞান অধিক ছিল। এখানকার শিক্ষা, ধর্ম্ম, সমাজ ও সদাচার বিরোধী, তাৎকালিক শিক্ষা রমণীগণকে ধর্ম্মনিষ্ঠায়, সতীত্বে, সামাজিক আচারব্যবহারে, অতুলনীয়া করিত।

স্ত্রীশিক্ষার বর্ত্তমান ব্যবস্থায় অধিকাংশ স্ত্রীলোকেই অত্যল্প শিক্ষা পায়। ঘটনাচক্রে যে দুই চারিটী স্ত্রীলোক উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম উপাধি প্রাপ্ত হয়, তাহারাও আদর্শ চরিত্র হইতে পারে না। ধর্ম্মে অবিশ্বাস ও সমাজের বিরুদ্ধাচার বর্ত্তমান শিক্ষার মজ্জাগত দোষ।

শ্রীমাধবচন্দ্র সান্যাল।

আলোচনা।

বিগত আষাঢ় মাসের ব্রাহ্মণ-সমাজ পত্রে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্নমহাশয়ের লিখিত জন্মতিথিকৃত্যের ব্যবস্থা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিতেছি।

কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন ;—"অনেক ব্যবস্থায় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের অস্পষ্ট উক্তিনিবন্ধন অধ্যাপকদিগের মতভেদ হইয়া থাকে।" ইহার উদাহরণ স্বরূপে তিনি জন্মতিথিকৃত্যে মাসোল্লেখের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন :—"স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য তিথিতত্ত্বে জন্মতিথিকৃত্যে গৌণচান্দ্রমাস উল্লেখ হইবে লিখিয়াছেন,আবার মলমাসতত্ত্বে ঐ জন্মতিথিকৃত্যেই মুখ্যচান্দ্রমাসের উল্লেখ ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। এখন যে কোন স্মার্ত্ত অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করিবেন, তিনিই মলমাসতত্ত্বে গ্রন্থকারের নিজলিখন ও টীকাকারদিগের লিখন লক্ষ্য না করিয়া কেবল তিথিতত্ত্বের লিখন অনুসারে ব্যবস্থা দিবেন, জন্মতিথিকৃত্যে গৌণচান্দ্রমাস উল্লেখ হইবে।"

সকল স্মার্ত্ত অধ্যাপকই জন্মতিথিকৃত্যে গৌণচান্দ্রমাস উল্লেখের ব্যবস্থা দিবেন, ইহা সত্য। কিন্তু স্মার্ত্ত অধ্যাপকেরা মলমাসতত্ত্বের সন্দর্ভ লক্ষ্য না করিয়া কেবল তিথিতত্ত্বের লিখনানুসারে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, কবিরত্ন মহাশয়ের মত সুপণ্ডিতব্যক্তির পক্ষে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা সঙ্গত নহে। মলমাসতত্ত্বে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য জন্মতিথিকৃত্যে মুখ্য চান্দ্রমাসের উল্লেখ ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন কবিরত্নমহাশয়ের এই লিখা নিতান্ত ভিত্তিহীন ও মলমাসতত্ত্বের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, ইহা বলাই বাহুল্য। মলমাসতত্ত্বের জন্মতিথিকৃত্যবিষয়ক স্মার্ত্ত-সন্দর্ভের আলোচনাদ্বারা বিষয়গুলি উত্তমরূপে প্রণিধান করিলে "জন্মতিথিকৃত্যে মুখ্য চান্দ্রমাস উল্লেখ হইবে" এই প্রকার ব্যবস্থা স্মার্ত্তসম্মত বলিয়া কখনই বিবেচিত হইতে পারে না।

মৃত সজাতীয় তিথিতে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতে হয়।—

"যস্মিন্ রাশিগতে ভানৌ বিপত্তিং যান্তি মানবাঃ
তেষাং তত্রৈব কর্ত্তব্যা পিণ্ডদানোদকক্রিয়া।"

এই সত্যব্রত-বচনানুসারে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধে সৌরমাস গ্রহণ করা হইবে, কি চান্দ্রমাস গৃহীত হইবে ? এই আশঙ্কাতে লঘুহারীত-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তেত সূর্য্যঃকালবশাৎ যতঃ।
অতঃ সংবৎসর শ্রাদ্ধং কর্ত্তব্যং মাসচিহ্নিতং।" ইত্যাদি

শীঘ্র ও বিলম্বগতিদ্বারা রবি রাশিসমূহ ভোগ করিয়া থাকেন। রবির মন্দগতিদ্বারা মেষাদি-রাশি ভোগকালমধ্যে কোন এক সৌরমাসে কাহারও মৃততিথি দুইবার পড়িতে পারে। আবার শীঘ্রগতিদ্বারা রবির তুলাদিরাশি ভোগকালমধ্যে কোন সৌরমাসে কাহারও মৃততিথির এক-কালীন অপ্রাপ্তিও ঘটিতে পারে। একক্ষেত্রে একমাসে দুই মৃততিথির প্রাপ্তি ঘটিলে, কর্ম্মানু-ষ্ঠানে সংশয় উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে কোন মাসে মৃততিথির এককালীন অপ্রাপ্তি ঘটিলে কর্ম্ম লোপও হইতে পারে ; এই কারণে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধে সৌরমাস গ্রহণ করা যাইতে পারে

না। চান্দ্রমাস গ্রহণ করিলে এই প্রকার সংশয় ও কর্ম্মলোপের সম্ভাবনা থাকে না, এই-জন্য লঘুহারীত "অতঃ সংবৎসরং শ্রাদ্ধং কর্ত্তব্যং মাসচিহ্নিতং" এই বচনে হেতুবন্নিগদের অর্থাৎ হেতুতুল্য বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন।

সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধে চান্দ্রমাস গ্রহণমাত্র এই হেতুবন্নিগদের প্রতিপাদ্য, এইজন্য স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন :—"চান্দ্রগ্রহণে হেতুবন্নিগদমাহ যতঃ" ইত্যাদি। সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধে চান্দ্রমাস গ্রহণ করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইলেও মুখ্য ও গৌণভেদে চান্দ্রমাস দুই প্রকার। সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধে কোন্ চান্দ্রমাস গৃহীত হইবে, এই আকাঙ্ক্ষাতে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য বলিতেছেন :—

"অথাত্র শুক্লাদিত্বং কুত ইতি চেৎ ইন্দ্রাগ্নী ইত্যাদিনা নিরুপপদস্য
মাসশব্দস্য শুক্লাদৌ শক্তেত্তমভিধায় চক্রবদিত্যভিধানাৎ।"

সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধে যে মুখ্য চন্দ্রমাস গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার হেতু কি? এই প্রশ্ন-উত্থাপন করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন ইন্দ্রাগ্নী ইত্যাদি বচনদ্বারা নিরুপপদ মাস শব্দের শুক্লাদিমাসে শক্তি, ইহা পূর্ব্বে অভিহিত হইয়াছে, তৎপর "চক্রবৎ পরিবর্ত্তেত" ইত্যাদি বচনে "কর্ত্তব্যং মাসচিহ্নিতং" এই নিরুপপদ মাস শব্দের প্রয়োগ থাকাতে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধে মুখ্য চন্দ্রমাস গৃহীত হইবে।

গ্রন্থকারের এই লিখা দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে হেতুবন্নিগদ চিন্তাদ্বারা সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধের কেবল চান্দ্রমাসীয়ত্ব মাত্র অবধারিত হইয়াছে। মুখ্য চন্দ্রমাস প্রমাণান্তর লভ্য।

আকাঙ্ক্ষার অবিশেষত্বপ্রযুক্ত যে যে কর্ম্মের হেতুবন্নিগদ চিন্তাদ্বারা চান্দ্রমাসীয়ত্বমাত্র অবধারিত হইবে, গ্রন্থকার সেই সকল কর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন :—"·········মাসিক শ্রাদ্ধেষু তত্তন্মাসীয় তিথিবিশেষবিহিতকর্ম্মসুচ হেতুবন্নিগদচিন্তানায়াতি তথাপি তত্তদ্বচনোপাত্তানাং তত্তৎকল্পনামাকাঙ্ক্ষায়া অবিশেষাৎ হেতুবন্নিগদশ্চিন্তনীয়ঃ।·········অতঃ সংবৎসরং শ্রাদ্ধমিতি প্রদর্শনমাত্রং। তেন মাসিকশ্রাদ্ধং জন্মতিথিকৃত্যং তত্তন্মাসীয় তত্ততিথিবিহিতকর্ম্মাপ্যেবম্যং।"

মাসিক শ্রাদ্ধ, জন্মতিথিকৃত্য এবং তত্তন্মাসীয় তিথিবিশেষবিহিত কৃত্যেও হেতুবন্নিগদ চিন্তার অন্বেষণ করিতে হইবে। এক সৌরমাস মধ্যে এই সকল কর্ম্মের তিথির দুইবার প্রাপ্তি ও এককালীন অপ্রাপ্তিবশতঃ কর্ম্মানুষ্ঠানে পূর্ব্বোক্ত সংশয় ও কর্ম্মলোপের সম্ভাবনা আছে। অতএব সাংবৎসরিকশ্রাদ্ধ প্রদর্শন মাত্র। যে স্থলে সংশয় ও কর্ম্মলোপের আশঙ্কা হইবে, সেই স্থলে হেতুবন্নিগদচিন্তাদ্বারা চান্দ্রমাস গ্রহণ করিতে হইবে।

মহামহোপাধ্যায় ৺কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় তাঁহার তত্ত্ববোধিনী টীকাতে লিখিয়াছেন :—"লঘুহারীতেন সাংবৎসরিকশ্রাদ্ধস্য সৌরমাসীয়ত্বে বিঘ্নলোপপ্রসঙ্গেন হেতুনা চান্দ্রমাসীয়ত্বমাত্রং প্রতিপাদিতং ন তস্য শুক্লাদিরূপত্বমপি তৎপর্য্যন্তস্য তাদৃশ হেতোরপ্রতিপাদকত্বাৎ।"

সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধে সৌরমাস গ্রহণ করা হইলে সংশয় ও কর্ম্মলোপ হইতে পারে, এইজন্য

হারীত কর্ত্তৃক হেতুবন্নিগদচিন্তাদ্বারা ইহার চান্দ্রমাসীয়ত্ব মাত্র অবধারিত হইয়াছে। মুখ্য চান্দ্র-পর্য্যন্ত অবধারিত হয় নাই। কেন না, মুখ্যচান্দ্রপর্য্যন্ত অবধারিত হওয়া হেতুবন্নিগদচিন্তার প্রতিপাদ্য নহে।

সাংবৎসরিকশ্রাদ্ধে হেতুবন্নিগদচিন্তাদ্বারা চান্দ্রমাস অবধারিত হইয়া ইন্দ্রাগ্নী ইত্যাদি প্রমাণান্তরদ্বারা যেমন মুখ্যচান্দ্রমাস গ্রহণ করা হইয়াছে, সেইরূপ জন্মতিথিকৃত্যেও হেতুবন্নিগদ-চিন্তাদ্বারা চান্দ্রমাস অবধারিত হইয়া ব্রহ্মপুরাণীয়ত্ব এবং অষ্টকাদি-সাহচর্য্যপ্রযুক্ত গৌণচান্দ্রমাস অবধারিত হইয়াছে। ইহাতে তিথিতত্ত্বের সহিত মলমাসতত্ত্বের কোনরূপ অনৈক্য দেখা যায় না।

কবিরত্ন মহাশয়—স্মার্ত্ত অধ্যাপকদিগের মতভেদের উদাহরণ দেখাইতে উদ্যত হইয়া গ্রন্থকার স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের এক গ্রন্থের সহিত অপর গ্রন্থের বিরোধ দেখাইবার প্রয়াশ পাইয়াছেন। ইহাতে অধ্যাপকদিগের মতভেদের উদাহরণ দেখান সিদ্ধ হয় নাই। পরন্তু, স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের গ্রন্থ বিরোধ দেখাইবার প্রয়াশ ও ব্যর্থ হইয়াছে।

স্মার্ত্ত অধ্যাপকেরা স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের গ্রন্থে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে স্মার্ত্তসন্দর্ভের সঙ্গতি উপপত্তির গুরুভার কে বহন করিবে?

স্মার্ত্ত অধ্যাপকেরা স্মার্ত্তলিখন লক্ষ্য না করিয়া ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, কবিরত্নমহাশয়ের এইরূপ লিখার কোন সঙ্গত কারণ নাই, ইহা বলাই বাহুল্য।

স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য জন্মতিথিকৃত্যের ব্যবস্থা তিথিতত্ত্বে ও মলমাসতত্ত্বে দুই রকম লিখিয়াছেন, কবিরত্নমহাশয়ের এরূপ লিখারও কোন ভিত্তি নাই। স্মার্ত্ত অধ্যাপক মহাশয়েরা ইহা অবশ্যই বিবেচনা করিবেন। ইতি—

শ্রীবিজয়কিশোর স্মৃতিতীর্থ।

সোনার খড়্গ।

—কৃষ্ণপুরে বিখ্যাত রায়চৌধুরীবংশে হরিভূষণবাবুর জন্ম। গ্রামটি প্রায় সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বসতিস্থান। সমস্ত অধিবাসিগণই অল্পাধিক অর্থশালী। শাস্ত্র-অনুশাসনে সকলেই আচার-অনুষ্ঠানপ্রিয়। প্রায় গৃহস্থপল্লীতেই "বারমাসে তের পার্ব্বণ" হইয়া থাকে। শরৎকাল উপস্থিত হইলেই গ্রামবাসী গৃহস্থগণ সারদার সাদরসম্ভাষণজন্য সাধ্যানুযায়ী শক্তি-সামর্থ্যপ্রকাশের কেহ বড় ন্যূনতা করে না।

শুনা যায় এই গ্রামে পূর্ব্বে—বহুপূর্ব্বে—প্রায় সহস্রাধিক দুর্গাপ্রতিমা পূজা হইত। বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যতা জন্য এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার বাহুল্যে সাধারণলোকের ভক্তিবিশ্বাস হ্রাস হওয়া সত্বেও প্রায় ৩।৪ শত বাড়ী দুর্গাপূজা হইয়া থাকে।

কৃষ্ণপুরে দুই সম্প্রদায় হিন্দুর বাস—বৈষ্ণব আর শাক্ত। তবে বিশেষ কোন অজ্ঞাত কারণে শাক্তসম্প্রদায়ের সংখ্যা অধিক। ইহারা প্রায়ই নিঃস্ব। কিন্তু শাক্তগণের উপাসনা-গ্রন্থ তন্ত্রশাস্ত্রের কৃষ্ণপুরে প্রায় গৃহস্থপল্লীতেই আলোচনা হয়, আবার গোস্বামিমহাশয়গণের চেষ্টায় "মালশাভোগ" ও কথনো বাকি থাকে না।

এইবার আশ্বিন মাসের প্রায় শেষ সময় অম্বিকার বোধনারম্ভের দিন। হরিবাবুর একমাত্র পুত্র কালিদাস দ্বাবিংশবর্ষের যুবা। একটী মহাবিশুদ্ধচিত্ত তান্ত্রিকের নিকট দীক্ষিত হইয়া ঘরে বসিয়া মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র পড়িয়াছে। বলাবাহুল্য পিতাপুত্রে ধর্ম্মমত লইয়া বিপরীতভাব পোষণ করে।

কালিদাস রামচন্দ্রের ন্যায় পুত্র হইলেও ধর্ম্মমতের সময় নিজের হৃদয়পোষিত মত লইয়াই চলিত। পিতা পুত্রকে বৈষ্ণবমত গ্রহণ জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিলেও, এমন কোন দিন যায় নাই যে কালিদাস তন্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করে নাই, দুর্গা দুর্গা বলে নাই, এমন কি প্রতি নিঃশ্বাসে মাদুর্গা বলিয়া হাঁপ ছাড়ে নাই।

হরিবাবু পুত্রের এইরূপ ব্যবহারে গৃহিণীকে বলিতেন ওগো কালী আমার শিক্ষিত পুত্র বটে, কিন্তু আমি দেখিতেছি আমার এই বড় সাধের বিষ্ণু-মন্দির ভাঙ্গিয়া একদিন কালী এই স্থানে সেই রক্তখাগী বেটীর আসন পাতিবে। যে স্থানে একটী ফড়িং পর্য্যন্ত হত্যা হয় নাই, সেস্থানে প্রতি শনিবার মঙ্গলবারে পাঁঠা বলি হইবে! কি করি বলতো? গৃহিণী উত্তর করিলেন, তাতে আর দোষ কি, মা কালী কালীকে জীবিত রাখুন—মায়ের অভিপ্রেত যে কার্য্য তাহা করিবে—তাতে আর দোষ কি? তুমি বা কালিদাস নাম রাখিয়াছিলে কেন? আর কালী তো নারায়ণকে কথনো অবহেলা করে না, বরং বলিয়া থাকে যে "কালী কৃষ্ণ হরি ও হর একই"। যাহারা শ্রীভগবানের রূপশক্তি আর গুণশক্তির পার্থক্য বিচার করে, তাহারা বড় ভ্রান্ত।

গৃহিণীর সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তার পর হরিবাবু এই বৎসরের পূজার আয়োজন জন্য কর্ম্মচারী মধুবিশ্বাসের উপর ভার দিয়া সন্ধ্যার পর বৈষ্ণব-সম্প্রদায়সহ নামকীর্ত্তনে মনোনিবেশ করিলেন।

কালিদাস দপ্তরখানায় গিয়া কর্ম্মচারিসহ দুর্গোৎসবের দ্রব্যাদির ফর্দ্দ দেখিল। চিরাগত নিয়মানুযায়ী সমস্তই স্থির হইল। বেশীর ভাগ কালিদাসের ইচ্ছানুসারে পশুবলির পরিবর্ত্তে কুষ্মাণ্ড, ইক্ষু এবং কদলীর আয়োজন রহিল, ইহা কিন্তু কর্ত্তার ইচ্ছার পূর্ণবিরুদ্ধে।

ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যার সময় বোধন আরম্ভ হইল. পুরোহিত পূজার সংগৃহীত দ্রব্যরাশি দেখিতে চাহিলে মধুবিশ্বাস তাঁহাকে ভাণ্ডারে লইয়া গেল। সমস্ত দ্রব্য দেখার পর পুরোহিত বলির উপযুক্ত দ্রব্য দেখিয়া একটুকু হাসিয়া হরিবাবুকে তাহা জানাইলেন।

সর্ব্বনাশ আর কি! হরিবাবু আসিয়া ভাণ্ডার হইতে সেই সমস্ত দ্রব্য ফেলাইয়া দিলেন। পুত্রকে ধমকাইয়া আবার বৈরাগীদলের সহিত নামকীর্ত্তনে রত হইলেন। কালিদাস দুঃখিত-

চিত্তে মায়ের নিকট পিতার নামে নালিশ করিল। তাহার পরে বোধনের যোগাড় করিয়া দিল। পুরোহিত বোধন শেষ করিয়া জলযোগের সময় বলিলেন,—এস কালিবাবু! আহার করা যাক্। কালিদাস উত্তর করিল—পূজার কয় দিন আমি মাত্র ফলাহার করিব। আপনি আহার করুন।

রাত্রি দশটায় হরিবাবু পুত্রকে ডাকিয়া বলির বিরুদ্ধে তর্কযুক্তি, অনুশাসন ইত্যাদি বুঝাইয়া পরিশেষে বলিলেন,—তোমার দ্বারা বংশপ্রথা রহিত হইলে আমি বড় দুঃখিত হইব।

কালিদাস ভক্তিবিনম্র মস্তকে ভাবে গদগদ হইয়া মৃদুস্বরে বলিল পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য,—আমি বংশপ্রথা বিনষ্ট করিব না, রক্ষার চেষ্টাই করিব, ইহা বলিতে বলিতে ধীরপদে প্রস্থান করিল।

হরিবাবু পুত্রের শাক্তমতের ঐকান্তিকতা বিষয়ে মনে মনে আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন যে খোকা যাহাই বলুক,—এবাড়ীতে পূজায় বলি? বাপ্‌রে! তা কি হ'তে পারে? পূজা ত নিরাকার ঈশ্বরের সাকারমূর্ত্তির আরাধনা। ইহাতে মানসিক ভাব যাহার যেরূপ সে সেইরূপ করিবে। আমি শাক্তের বংশে জন্মিয়াছি বটে, বাল্যকালে এই চণ্ডীমণ্ডপে বলি দেখিয়াছি তাহাও সত্য, কিন্তু এখন আর না। জীবহিংসা? ওরে বাপরে! তাও কি হয়? যিনি কৃপাময়ী জগজ্জননী তাহার সামনে নিরীহ ছাগশিশু বধ!

ইত্যাদি প্রকার চিন্তা করিয়া হরিবাবু জয় রাধারাণী, জয় রাধারাণী—জগন্ময়ী বলিয়া নিদ্রিত হইলেন।

প্রাতে সপ্তমীর প্রভাতিবাদ্য বাজিয়া উঠিল—দূরে একটা শিউলী ফুলের ডালে দুই চারিটা দোয়েল বসিয়া শিশ দিয়া জগন্ময়ীর আবাহন-গীতি গাহিয়া উড়িয়া গেল। সেই কম্পনে শেফালী ফুলগুলি ঝরিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। প্রভাত-স্নিগ্ধ-সমীরণ তাহার গন্ধ লইয়া হরিবাবুর গৃহ-প্রাঙ্গণ ভরপুর করিয়া তুলিল, একটা ভৃত্য একরাশি পদ্মফুল আনিয়া বারান্দায় রাখিল,। গৃহিণী নিজেই স্থলপদ্ম, অতসী, অপরাজিতা ও দোপাটী ইত্যাদি ফুল তুলিয়া সাজি ভরিয়া রাখিলেন। তাঁহার পুত্রবধূ, একটী অগ্নিসংযুক্ত ধূনচীতে ধূপ গুগ্‌গুল দিতে দিতে বোধনতলায় রাখিয়া গেল। তখন সমস্ত বাড়ী কুসুম-নিকর-সৌরভে আর ধূপ ধূনার গন্ধে আমোদিত হইয়া উঠিল। হরিবাবু পবিত্র সাত্ত্বিক সুগন্ধে পুলোকিত হইয়া মা! ত্রিতাপহারিণি! হরিবোল, হরিবোল বলিতে বলিতে বাহির হইলেন।

পূজার সমস্ত কার্য্য কর্ম্মঠ যুবক কালিদাসের তত্ত্বাবধানে সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল, পূর্ব্বাহ্ণে সপ্তমীপূজা শেষ করিতে হইবে। পুরোহিত পূজায় বসিলেন, কালিদাস একবার প্রতিমার মুখের দিকে, একবার তাহার পূর্ব্বপিতামহগণের নির্দ্দিষ্ট বলির চিহ্নিত স্থানের দিকে চাহিয়া একটা ক্ষুদ্র রকমের নিঃশ্বাস ফেলিল,—মনে মনে বলিল মাগো সর্ব্বমঙ্গলা! তোমার পূজার ক্রম, যাহা ঋষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার অঙ্গহানি হইতেছে কি? মা! তুমি অন্তর্য্যামিনী, আমি আমার সমস্ত আমিত্ব তোমার পদে বলিদান করিলাম; সাধক

পঞ্চইন্দ্রিয় বলি দিয়া তোমার সাধনা করিবে, ইহাই বলির নিগূঢ় অর্থ। আবার পূজামন্ত্রেও মানস বলির বিধি আছে, তুমি আমার সর্ব্বইন্দ্রিয়ের সর্ব্ববাসনা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম, শক্তি সমস্তই লইয়া এই পূজা গ্রহণ কর মা! মহানবমীতে আমি পশুবলির অনুকল্পে অন্তরূপ বলি দিয়া তোমার পূজার পূর্ণত্ব রক্ষা করিব।

পরদিন মহা অষ্টমী। কালিদাস আজ নিজহস্তে পূজার ফুল বিল্বপত্র হইতে আরম্ভ করিয়া হোমের কাঠগুলি পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতেছে।

এই রায়চৌধুরীবংশের কুলপুরোহিতব্যতীত উহাদের মণ্ডপে অন্য কোন পূজকের আধিপত্য নাই। পুরোহিত একাই চণ্ডীপাঠ, পূজা, তন্ত্রধারকের কার্য্য ও হোম ইত্যাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; তবে পূজার সময় তাঁহার বার্দ্ধক্য জন্য পাছে মন্ত্র ভুল হয় বলিয়া একজন তন্ত্রধারের আবশ্যক হয়। এই কারণ কালিদাস পুঁথি লইয়া তন্ত্রধারের কার্য্য করিতেছে। মহাস্নানের মন্ত্র পাঠান্তে যখন দেবীর ধ্যানমন্ত্র পড়াইবার আবশ্যক হইল, তখন কালিদাস পুঁথির দিকে দৃষ্টি না দিয়া মুদ্রিত নেত্রে তন্ময় তদ্গতচিত্তে ধ্যান মন্ত্র পড়াইতে পড়াইতে নিজেই একেবারে বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া পড়িল। পুরোহিতঠাকুর মন্ত্রের অর্দ্ধেকটা উচ্চারণ করিয়াই একটুকু উচ্চারণ বিশৃঙ্খলার জন্য কালিদাসের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কালি! একটুকু স্পষ্ট করিয়া বল। এবাক্য কিন্তু কালিদাসের কর্ণে আদৌ পৌছিল না। "অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণ-ভূষিতাং" পড়াইয়াই কালিদাস কদম্বকোরকাকার উৎফুল্ল শরীরে মুদিত নয়নে যন্ত্রচালিতের ন্যায় মন্ত্র পড়িতেছে, আর ঈষৎ কম্পিতদেহে নিশ্চল হইয়া কুশাসনে বসিয়া আছে।

এই সময় একটী লুব্ধ মার্জ্জারশিশু নৈবেদ্যোপকরণ ভক্ষণ আশায় আসিয়া মণ্ডপের বাহিরের লোকের তাড়নায় কালিদাসের শরীরের উপর দিয়া চলিয়া গেল, তথাপি ধ্যানস্থ যুবকের মহাধ্যান ভঙ্গ হইল না। স্বেদনিঃসৃত রোমাঞ্চিত পুলকপূরিত প্রশান্তচিত্তে ভগবদ্ভক্ত সাধক মাতৃধ্যানে প্রকৃতই বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়াছে।

অনুষ্ঠানান্বিত ভক্ত পুরোহিত কালিদাসের এই সাত্ত্বিকভাব অবলোকন করিয়া নিজেই ধ্যানধৃতপুষ্পস্তবক ভক্তিপুলকিতহস্তে ঘটে অর্পণ করিয়া একটী ভৃত্যকে কহিলেন, বাবুকে বাতাস কর। এই বলিয়া বিষ্ণুস্মরণান্তে মাতৃপূজার অনুষ্ঠানগুলি পুলকিত চিত্তে অতি সন্তর্পণে কালিদাসের সাহায্য অপেক্ষা না করিয়াই করিতে আরম্ভ করিলেন। কালিদাসের সমস্ত শরীর তখন স্বেদাপ্লুত। ধ্যানমন্ত্র একবার দুইবার পড়া হইল, তথাপি কালিদাস আবার পড়িতে যাইতেছিল, এই সময় তাহার হাতের পুঁথি তাম্র টাঁটের উপর পড়িয়া গেল।

তখন তাহার জননী আসিয়া একটুকু উচ্চৈঃস্বরে "ও গো এই দিকে এস গো! পুত্রের মাতৃপূজা দেখিয়া জীবন সার্থক কর" বলিয়া হরিবাবুকে আহ্বান করিলেন, হরিবাবু নিকটেই বিষ্ণুমণ্ডপের দ্বারে দাঁড়াইয়া ছিলেন, আসিয়া দেখিলেন পুত্র প্রকৃতই মাতৃধ্যানে নিমগ্ন।

তখন তাহার বৈষ্ণবাচারে স্ফীত গর্ব্বিত হৃদয়ও অবনমিত হইল। কালিদাস তান্ত্রিকমতাবলম্বী

সাধক, তাহার মাতৃপূজা যে তামসিক নহে, অথবা হিংসাপ্রণোদিত নহে, ইহা বাবুর পূর্ণবিশ্বাস হইল। দেবী পূজকের হৃদয় চাহেন, তাহার বাহ্য আচার ব্যবহার চাহেন না। ঋষিকল্প পূর্ব্বসাধকগণের প্রবর্ত্তিত প্রথায় সাধক নিজের হৃদয় বলি দিয়া চিন্ময়ীকে পূজা করিলে তবেই তাহার প্রকৃত পূজা হয়, প্রকৃত দুর্গোৎসব হয়। ইহা বুঝিয়া হরিবাবু কালিদাসের অনুষ্ঠিত তান্ত্রিক মতের শ্রেষ্ঠতা বুঝিয়া বলিলেন, গৃহিণি, আমি মহাভ্রম করিয়াছি, পিতা-পিতামহ যে প্রথায় দুর্গোৎসব করিতেন, আমি তাহা না করিয়া অন্যায় করিয়াছি, এই যে আমার একমাত্র বংশধর আজ মায়ের প্রকৃত পূজা করিয়া খাঁটী দুর্গোৎসব করিতেছে, ইহাতে আমার চৌদ্দপুরুষ মুক্ত হইলেন। তুমি অতঃপর কালিদাসের ইচ্ছানুযায়ী পূজার উপকরণ সংগ্রহ রাখিও।

হরিবাবু বসিয়া পড়িলেন। পুরোহিত করণীয় কার্য্য করিতে লাগিলেন,কালিদাস মুদিত নেত্রে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা তদবস্থা থাকিয়া একবার হাসিয়া বলিয়া উঠিল,মা ব্রহ্মাণ্ডময়ি! তুমি এত সুন্দর! আবার করুণকণ্ঠে কহিল কৈ মা! কৈ তোমার দশ হাতের দশ আয়ুধ কৈঃ

মণ্ডপের সমস্তলোকে তখন কালিদাসের দিকে চাহিয়া প্রতিমার দিকে চাহিবা মাত্র কি যেন একটা স্নিগ্ধজ্যোতিঃ চকিতবিদ্যুদ্দামতুল্য স্ফুরিত হইয়া খেলিয়া চলিয়া গেল। উপস্থিত নর-নারীগণের হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্য কি একটা অতুল্য বিস্ময়লহরে কাঁপিয়া উঠিল।

এদিকে কর্ম্মদক্ষ পুরোহিত ঠাকুর অভ্যাসবলে পর পর ক্রিয়াগুলি করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে কালিদাস প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার তন্ত্রধারের কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিল। তাহার অবশভাবের কথা কেহই তাহাকে বলিল না, অষ্টমীপূজা শেষ হইল। রাত্রি আটটায় সন্ধিপূজার সময়, তথাপি এই সময় হইতে আয়োজন হইতে লাগিল। কালিদাস বাহিরে আসিয়া সান্ধ্যগগনের এককোণে একটা ক্ষীণস্নিগ্ধ আলো দেখিয়া ভাবে গদগদচিত্তে আবেগভরে বলিয়া উঠিল, কত ইঙ্গিত করিতেছ মা! বুঝিয়াছি, পূর্ব্বপ্রথানুযায়ী কার্য্য আমাকেই করিতে হইবে।

এইরূপে রায় বাড়ীর পূজার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বাড়ীর অষ্টমীপূজার সমস্ত শেষ হইল। যথাসময়ে চারিদিকে সন্ধিপূজার বাদ্য বাজিয়া উঠিল। মণ্ডপে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, ফুল, চন্দন ইত্যাদি একত্র হইল। উপবাসী কালিদাস আবার তন্ত্রধারের আসনে আসিয়া বসিল, পুরোহিত পূজা করিতে বসিলেন।

এই সময় কালিদাসের একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল যে, ওহে কালিদাস! তোমার বাড়ীতে তো বলিরহিত পূজা? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কুষ্মাণ্ড, ইক্ষু, ইত্যাদি বলি দিতেও কি বাধা আছে? কালিদাস বলিল না, তা বাধা নাই, তবে কি জান, আমাদের বংশের ধারা যে নবমীর দিন পশু বলির পর, কদলী, ইক্ষু, কুষ্মাণ্ড বলি হইত, কিন্তু পিতাঠাকুর আজ তিন চারি বৎসর সাত্ত্বিক পূজার অছিলায় বৈষ্ণবী প্রথায় বলিহীন পূজা করিয়া আসিতেছেন।

আমি কিন্তু এইবার স্থির করিয়াছি—মহানবমীতে অন্ততঃ কুষ্মাণ্ডবলি দিয়াও দুর্গোৎসবে কুলাগত আচার রক্ষা করিব। তুমি ভাই একটী কার্য্য কর—অদ্য রাত্রিতেই একটী সুন্দরবৃন্ত রসাল কীটদংশনশূন্য মধ্যমাকার কুষ্মাণ্ড আনিয়া মধুবিশ্বাসের নিকট দাও! আমি অদ্য রাত্রিতে দেবীপূজার বলির উপযোগী করিয়া রাখিব। প্রাতেই হাড়িকাঠের পরিবর্ত্তে দুইখানি বাঁশ হাড়িকাষ্ঠের ন্যায় পুতিয়া দিব। দুই বন্ধুর এইরূপ আলাপ হইতে হইতে সন্ধিপূজার ক্ষণ উপস্থিত হইলে পুরোহিত ঠাকুর কালিদাসকে সন্ধিপূজার মন্ত্র পড়াইতে ইঙ্গিত করিয়া আচমনান্তে প্রাথমিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া পর পর ক্রমিক অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। দেবীভক্ত কালিদাস পুস্তক হস্তে তুলিয়া একবার প্রতিমার দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল, সাধক যুবক বিস্ফারিত নেত্রে দেখিল—মা দুর্গার মৃন্ময়ীমূর্ত্তি যেন রুধিরলোলুপা রাক্ষসী মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া লেলিহান জিহ্বায় অজস্র জীবরক্ত পান করিতেছেন। মায়ের এই বিকটমূর্ত্তি দেখিয়া কালিদাস ভীতিবিহ্বলচিত্তে চক্ষুঃ মুদ্রিত করিবামাত্র তাহার হৃদয়পদ্মে একটী স্নিগ্ধশান্ত ষোড়শীমূর্ত্তি জাগিয়া গণেশজননীরূপে মৃদু মধুর হাস্যে যেন সমগ্র জগৎ হাস্যময় করিয়া তুলিল। কালিদাস তখন আবার প্রতিমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসী মূর্ত্তি অপসৃতা হইয়াছে, মা মৃন্ময়ী দশভুজার পরিবর্ত্তে ব্রজসুন্দর নন্দদুলালের মূর্ত্তিতে অধরে মুরলী-সংলগ্ন করিয়া পীতাম্বর উড়াইয়া—বঙ্কিমঠামে বংশী বাজাইতেছেন।

মায়ের এই বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া কালিদাস আত্মবিস্মৃত স্বপ্নাদিষ্টের ন্যায় পিতাকে ডাকিল—হরিবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সে সেই ভাববিজড়িতকণ্ঠে ভাব পরিচালিত হইয়া বলিল বাবা! ওই দেখ, মা শ্যামসুন্দরের রূপে তোমার মণ্ডপ উজ্জ্বল করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, শুনিতেছনা বাবা বংশীরব! হরিবাবু কিন্তু কিছু বুঝিলেন না শুনিলেনও না, মাত্র বলিলেন কালি! আমি এত ভাগ্য লইয়া আসি নাই। মাতৃপূজার প্রকৃত অধিকারীও হই নাই, তুমি দেখ, শোন, তাহাতেই আমার হইবে। আমার আমিত্ব তোমাতে আছে। বলিয়া হরিবাবু বসিয়া পড়িলেন। কালিদাসের কর্ণে সে কথার বর্ণমাত্রও পৌঁছিল না, আবার সেইরূপভাবে ভক্তিগদগদকণ্ঠে আপনা আপনি বলিতে লাগিল—জগন্ময়ী শ্যামা! তুমি এত সুন্দর, তোমার শ্যামরূপে প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে, এমণ্ডপে প্রতি বৎসর তোমার পূজা হইয়া থাক। কিন্তু কই মা! অন্যান্য বৎসর তো এত সুন্দর হও না, এমন বিশ্ববিমোহন শ্যামরূপে আলো করনা, এত নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ দাও না, জানিনা জননী কোন সূত্রে কোন সাধনাবলে—কিসের শক্তিতে—এরূপ ভুবনমোহনরূপ দেখিতেছি, মাগো আমার ন্যায় ভক্তিহীন সাধনভজনশূন্য মহাপাপীকে তোমার নবনীরদনিন্দিত সুবঙ্কিম ব্রজবিহারী বংশীবদনের মূর্ত্তি দেখাইয়া তুমি কখনও কালা, কখন হও কালী, কখন ব্যোমকেশ; জগৎ-সমীপে এই তোমার সাধক-সঙ্গীতের সত্যতা প্রমাণ করিতেছ ইহা তোমারই মহিমা, ইহা জীবজগতের প্রতি তোমার অখণ্ড কৃপা কিন্তু মা! তুমি যে রক্তভুক্‌মূর্ত্তি দেখাইয়াছ, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে দিয়াও দেও নাই, ওগো চিন্ময়ী মহাশক্তি! তোমার শক্তিমূর্ত্তির পূজায় ঋষিগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া

গিয়াছেন, আমাদের মণ্ডপে আজ তিন চারি বৎসর তাহার বৈপরীত্য ঘটিয়াছে, তাই তুমি সংহারময়ী রক্তশোষণমুখী হইয়া আমার সম্মুখে উদয় হইয়াছিলে।

সচ্চিদানন্দময়ি! আমি মহানবমীতে তোমার সম্মুখে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সর্ব্বকামনা ও সর্ব্বরূপ আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্তি কুষ্মাণ্ড, ইক্ষু বলি দিয়া দুর্গোৎসবের পূর্ণত্ব রক্ষা করিব। তুমি আমার মর্ত্তের প্রত্যক্ষ দেবতা পিতার সন্দেহাকুল চিত্তের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দেও মা!

কালিদাস যখন এইরূপ ভাবে উন্মাদের ন্যায় আপনা-আপনি মৃন্ময়ী প্রতিমাকে লক্ষ্য করিয়া কথা কহিতেছিল, তখন কালিদাসের ভাবপ্রবণতা অবলোকন করিয়া নিজেই কর্ম্মদক্ষ ভক্ত পুরোহিত মহাশয় অভ্যাস বলে সন্ধিপূজাবিহিত সমস্ত কার্য্যই শেষ করিয়াছেন। সাধারণ দর্শক-গণ কালিদাসের অবস্থা আলোচনা করিতে করিতে যে যাহার গন্তব্যস্থানে গমন করিল। শয়ন-কালে পুরোহিত কালিদাসের সেই ভাবাবেগের কথা চাপা দিয়া তাহার হৃদয় পরীক্ষার জন্য বলি-লেন, কালিবাবু! নবমীতে তুমি বলির উদ্যোগ করিতেছ, ইহাতে গ্রামস্থ বৈষ্ণব প্রতিবাসিগণ আর কর্ত্তা বড় অসন্তুষ্ট হইবেন, সামাজিক নিয়মটা লঙ্ঘন করা কি উচিত? কালিদাস বলিল, পুরোহিত ঠাকুর! এক সময়ে আপনি এই মণ্ডপে ছাগ বলি দিয়া পূজা করিয়াছেন, আবার বাবার ইচ্ছায় বলিহীন পূজাও করিতেছেন, ইহাতে সামাজিক সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই, আজ হইবে কেন? আর যদিই বা তাই হয়, আমি তাহাতে ভীত নহি, সর্ব্বভয়নিবারিণী জননীর যখন তাহা ইচ্ছা তখন আমি তাহা করিবই; দেখিবেন ঠাকুর! জগদম্বা ইহাতে জগতে একটা অভিনব ক্রিয়া পূর্ণ করিবেন। তাই ইচ্ছাময়ী আজ বৈষ্ণববাড়ীর পূজায় বলি খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, সপ্তমীর দিন কুমারীপূজার সময় যখন সেই অষ্টমবর্ষীয়া ব্রাহ্মণ-কুমারী আসনে বসিয়াই "আমি পাঁঠা খাব, পাঁঠা-খাব" বলিয়াছিল, আমি সেই দিনই বুঝিয়াছি উহা মায়ের বলি খাইবার প্রণোদনা মাত্র। আবার অষ্টমীর দিন কুমারীপূজার পর যখন একটী নবমবর্ষীয়া অপরিচিতা কুমারী গৌর দেহে লোহিত বস্ত্র পরিয়া মণ্ডপের এক কোণে দাঁড়াইয়া বলি দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, আবার পরক্ষণে বলিহীন পূজা দেখিয়া সহসা অন্তর্হিতা হইল, তখনই বুঝিয়াছি, বলিহীন পূজায় মা তৃপ্তা নহেন। পুরুতঠাকুর! ঋষিগণ যে বলিপ্রথার প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন, যে পণ্ডিতেই উহার যতরূপ আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করুন না অথবা বেদের দৃষ্টান্ত দিয়া বলি হিংসাপ্রণোদিত কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করুন না,—আমি জানি উহা পূর্ণরূপে আচরিত হইলে, বিন্দুমাত্র অভিচার নাই, পরন্তু মহত্ত্ব ও পূর্ণত্ব আছে।

দুই জনে এইরূপ ভাবে আলাপ করিতে করিতে নিদ্রিত হইলে একই সময়ে দুই জনে দুইরূপ স্বপ্ন দেখিলেন। পুরোহিত প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে নদী হইতে বাটীতে উপস্থিত হইয়া কালিদাসকে দেখিয়া বলিলেন আমি চিন্ময়ীর সংহার মূর্ত্তি দেখিয়াছি, আর পদ্ধতিহীন পূজার জন্য শাসন বাক্যও শুনিয়াছি; কালিদাস বলিল আমি ত্রিতাপহারিণীর বৈষ্ণবীমূর্ত্তি দেখিয়াছি, আর শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধিবিহিত পূজার আয়োজনহীনতা জন্য—স্নেহের বাণী-আদেশের বাণী শুনিয়াছি।

আমি কিন্তু এইবার স্থির করিয়াছি—মহানবমীতে অন্ততঃ কুষ্মাণ্ডবলি দিয়াও দুর্গোৎসবে কুলাগত আচার রক্ষা করিব। তুমি ভাই একটী কার্য্য কর—অদ্য রাত্রিতেই একটী সুন্দরদৃশ্য রসাল কীটদংশনশূন্য মধ্যমাকার কুষ্মাণ্ড আনিয়া মধুবিশ্বাসের নিকট দাও! আমি অদ্য রাত্রিতে দেবীপূজার বলির উপযোগী করিয়া রাখিব। প্রাতেই হাড়িকাঠের পরিবর্ত্তে দুইখানি বাঁশ হাড়িকাষ্ঠের ন্যায় পুতিয়া দিব। দুই বন্ধুর এইরূপ আলাপ হইতে হইতে সন্ধিপূজার ক্ষণ উপস্থিত হইলে পুরোহিত ঠাকুর কালিদাসকে সন্ধিপূজার মন্ত্র পড়াইতে ইঙ্গিত করিয়া আচমনান্তে প্রাথমিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া পর পর ক্রমিক অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। দেবীভক্ত কালিদাস পুস্তক হস্তে তুলিয়া একবার প্রতিমার দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল, সাধক যুবক বিস্ফারিত নেত্রে দেখিল—মা দুর্গার মৃন্ময়ীমূর্ত্তি যেন রুধিরলোলুপা রাক্ষসী মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া লেলিহান জিহ্বায় অজস্র জীবরক্ত পান করিতেছেন। মায়ের এই বিকটমূর্ত্তি দেখিয়া কালিদাস ভীতিবিহ্বলচিত্তে চক্ষুঃ মুদ্রিত করিবামাত্র তাহার হৃদয়পদ্মে একটী স্নিগ্ধশান্ত ষোড়শীমূর্ত্তি জাগিয়া গণেশজননীরূপে মৃদু মধুর হাস্যে যেন সমগ্র জগৎ হাস্যময় করিয়া তুলিল। কালিদাস তখন অবার প্রতিমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসী মূর্ত্তি অপসৃতা হইয়াছে, মা মৃন্ময়ী দশভুজার পরিবর্ত্তে ব্রজসুন্দর নন্দদুলালের মূর্ত্তিতে অধরে মুরলী-সংলগ্ন করিয়া পীতাম্বর উড়াইয়া—বঙ্কিমঠামে বংশী বাজাইতেছেন।

মায়ের এই বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া কালিদাস আত্মবিস্মৃত স্বপ্নাদিষ্টের ন্যায় পিতাকে ডাকিল—হরিবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সে সেই ভাববিজড়িতকণ্ঠে ভাব পরিচালিত হইয়া বলিল বাবা! ওই দেখ, মা শ্যামসুন্দরের রূপে তোমার মণ্ডপ উজ্জ্বল করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, শুনিতেছনা বাবা বংশীরব! হরিবাবু কিন্তু কিছু বুঝিলেন না শুনিলেনও না, মাত্র বলিলেন কালি! আমি এত ভাগ্য লইয়া আসি নাই। মাতৃপূজার প্রকৃত অধিকারীও হই নাই, তুমি দেখ, শোন, তাহাতেই আমার হইবে। আমার আমিত্ব তোমাতে আছে। বলিয়া হরিবাবু বসিয়া পড়িলেন। কালিদাসের কর্ণে সে কথার বর্ণমাত্রও পৌঁছিল না, আবার সেইরূপভাবে ভক্তিগদ্গদকণ্ঠে আপনা আপনি বলিতে লাগিল—জগন্ময়ী শ্যামা! তুমি এত সুন্দর, তোমার শ্যামরূপে প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে, এমণ্ডপে প্রতি বৎসর তোমার পূজা হইয়া থাকে। কিন্তু কই মা! অন্যান্য বৎসর তো এত সুন্দর হও না, এমন বিশ্ববিমোহন শ্যামরূপে আলো করনা, এত নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ দাও না, জানিনা জননী কোন সূত্রে কোন সাধনাবলে—কিসের শক্তিতে—এরূপ ভুবনমোহনরূপ দেখিতেছি, মাগো আমার ন্যায় ভক্তিহীন সাধনভজনশূন্য মহাপাপীকে তোমার নবনীরদনিন্দিত সুবঙ্কিম ব্রজবিহারী বংশীবদনের মূর্ত্তি দেখাইয়া তুমি কখনও কালা, কখন হও কালী, কখন ব্যোমকেশ; জগৎ-সমীপে এই তোমার সাধক-সঙ্গীতের সত্যতা প্রমাণ করিতেছ ইহা তোমারই মহিমা, ইহা জীবজগতের প্রতি তোমার অখণ্ড কৃপা কিন্তু মা! তুমি যে রক্তভুক্‌মূর্ত্তি দেখাইয়াছ, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে দিয়াও দেও নাই, ওগো চিন্ময়ী মহাশক্তি! তোমার শক্তিমূর্ত্তির পূজায় ঋষিগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া

গিয়াছেন, আমাদের মণ্ডপে আজ তিন চারি বৎসর তাহার বৈপরীত্য ঘটিয়াছে, তাই তুমি সংহারময়ী রক্তশোষণমুখী হইয়া আমার সম্মুখে উদয় হইয়াছিলে।

সচ্চিদানন্দময়ি! আমি মহানবমীতে তোমার সম্মুখে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সর্ব্বকামনা ও সর্ব্বরূপ আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্তি কুষ্মাণ্ড, ইক্ষু বলি দিয়া দুর্গোৎসবের পূর্ণত্ব রক্ষা করিব। তুমি আমার মর্ত্তের প্রত্যক্ষ দেবতা পিতার সন্দেহাকুল চিত্তের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দেও মা!

কালিদাস যখন এইরূপ ভাবে উন্মাদের ন্যায় আপনা-আপনি মৃন্ময়ী প্রতিমাকে লক্ষ্য করিয়া কথা কহিতেছিল, তখন কালিদাসের ভাবপ্রবণতা অবলোকন করিয়া নিজেই কর্ম্মদক্ষ ভক্ত পুরোহিত মহাশয় অভ্যাস বলে সন্ধিপূজাবিহিত সমস্ত কার্য্যই শেষ করিয়াছেন। সাধারণ দর্শকগণ কালিদাসের অবস্থা আলোচনা করিতে করিতে যে যাহার গন্তব্যস্থানে গমন করিল। শয়নকালে পুরোহিত কালিদাসের সেই ভাবাবেগের কথা চাপা দিয়া তাহার হৃদয় পরীক্ষার জন্য বলিলেন, কালিবাবু! নবমীতে তুমি বলির উদ্যোগ করিতেছ, ইহাতে গ্রামস্থ বৈষ্ণব প্রতিবাসিগণ আর কর্ত্তা বড় অসন্তুষ্ট হইবেন, সামাজিক নিয়মটা লঙ্ঘন করা কি উচিত? কালিদাস বলিল, পুরোহিত ঠাকুর! এক সময়ে আপনি এই মণ্ডপে ছাগ বলি দিয়া পূজা করিয়াছেন, আবার বাবার ইচ্ছায় বলিহীন পূজাও করিতেছেন, ইহাতে সামাজিক সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই, আজ হইবে কেন? আর যদিই বা তাই হয়, আমি তাহাতে ভীত নহি, সর্ব্বভয়নিবারিণী জননীর যখন তাহা ইচ্ছা তখন আমি তাহা করিবই; দেখিবেন ঠাকুর! জগদম্বা ইহাতে জগতে একটা অভিনব ক্রিয়া পূর্ণ করিবেন। তাই ইচ্ছাময়ী আজ বৈষ্ণববাড়ীর পূজায় বলি খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, সপ্তমীর দিন কুমারীপূজার সময় যখন সেই অষ্টমবর্ষীয়া ব্রাহ্মণকুমারী আসনে বসিয়াই "আমি পাঁঠা খাব, পাঁঠা-খাব" বলিয়াছিল, আমি সেই দিনই বুঝিয়াছি উহা মায়ের বলি খাইবার প্রণোদনা মাত্র। আবার অষ্টমীর দিন কুমারীপূজার পর যখন একটী নবমবর্ষীয়া অপরিচিতা কুমারী গৌর দেহে লোহিত বস্ত্র পরিয়া মণ্ডপের এক কোণে দাঁড়াইয়া বলি দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, আবার পরক্ষণে বলিহীন পূজা দেখিয়া সহসা অন্তর্হিতা হইল, তখনই বুঝিয়াছি, বলিহীন পূজায় মা তৃপ্তা নহেন। পুরুতঠাকুর! ঋষিগণ যে বলিপ্রথার প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন, যে পণ্ডিতেই উহার যতরূপ আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করুন না অথবা বেদের দৃষ্টান্ত দিয়া বলি হিংসাপ্রণোদিত কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করুন না,—আমি জানি উহা পূর্ণরূপে আচরিত হইলে, বিন্দুমাত্র অভিচার নাই, পরন্তু মহত্ত্ব ও পূর্ণত্ব আছে।

দুই জনে এইরূপ ভাবে আলাপ করিতে করিতে নিদ্রিত হইলে একই সময়ে দুই জনে দুইরূপ স্বপ্ন দেখিলেন। পুরোহিত প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে নদী হইতে বাটীতে উপস্থিত হইয়া কালিদাসকে দেখিয়া বলিলেন আমি চিন্ময়ীর সংহার মূর্ত্তি দেখিয়াছি, আর পদ্ধতিহীন পূজার জন্য শাসন বাক্যও শুনিয়াছি; কালিদাস বলিল আমি ত্রিতাপহারিণীর বৈষ্ণবীমূর্ত্তি দেখিয়াছি, আর শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধিবিহিত পূজার আয়োজনহীনতা জন্য—স্নেহের বাণী—আদেশের বাণী শুনিয়াছি।

পুরোহিত-যজমানে যখন এইরূপ আলাপ চলিতেছিল,—তখন অরুণদেব পূর্ব্বদিকে মহাষ্টমী নিশার অবসান করিয়া দিয়াছেন। নবমীর প্রভাতে বাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে, লোহিতস্নিগ্ধ শরতের উষাকরস্নাত মেঘগুলি মৃদুবায়ুতাড়নে সরিয়া সরিয়া উড়িয়া যাইতেছে, চিন্ময়ীকে চিদাধারে আরাধনা করিতে নবারুণকিরণোদ্দীপ্ত লোহিতাভায় জগৎ ছাইয়া ফেলিয়াছে। পূজাবাড়ীতে আবার নবীন উদ্যমে নবমীপূজার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে।

মহানবমীর দিন ছয় দণ্ডের মধ্যে পূজা সমাপ্ত করিতে হইবে জানিয়া পুরোহিতের তাড়নায় আয়োজনকারীরা অতি সত্বর অর্চ্চনার সামগ্রীসমূহ সংগ্রহ করিয়া মণ্ডপ ভরিয়া দিল।

কালিদাস কিন্তু আজ আর অন্যান্য দিনের ন্যায় পূজার যোগাড় করিতেছে না। তাহার সমস্ত ক্ষিপ্রকারিতা আজ দেবীর বলির দ্রব্যসংগ্রহে ব্যয়িত হইতেছে। একটী অতি সুন্দর নাতিবৃহৎ, নাতিহ্রস্ব সুগোল, সুঠাম, সুরসাল কুষ্মাণ্ডোপরি হরিদ্রা গোধূমচূর্ণসহ নরাকৃতি পুত্তলিকা নির্ম্মাণে কালিদাস একমনে নিযুক্ত হইয়াছে। সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে কুষ্মাণ্ডদেহের ঊর্দ্ধাংশ কাটিয়া তাহাতে গলিত চূর্ণহরিদ্রা পূর্ণ করা হইল। শেষে একখানি রেশমসূত্রনির্ম্মিত বস্ত্রাংশে তাহা আবৃত করা হইল। তাহার পর সুরসাল স্থূলকাণ্ড একখানি কীটদংশনশূন্য ইক্ষু দণ্ড পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইল। আবার একটী সুপক্ক কদলী লইয়া ধুইয়া মুছিয়া তিন দ্রব্যই একস্থানে কদলীপত্রোপরি রক্ষিত হইল। বাহিরে আসিয়া নবীন বংশদণ্ডবিনির্ম্মিত হাড়িকাঠ মণ্ডপের সম্মুখে নাটমন্দিরের পার্শ্বে প্রোথিত করা হইল। আবার গোময় সংযোগে একটী নাতি উচ্চ স্তম্ভও তথায় প্রস্তুত হইল।

পূজাদর্শক নরনারীগণ আশ্চর্য্য হইয়া কালিদাসের কার্য্য দেখিতেছে, আর পরস্পর পিতা-পুত্রের ধর্ম্মমত লইয়া সমালোচনা করিতেছে। কেহ বলিল রায়চৌধুরীর বাড়ী চিরদিনই বলি ছিল, বাবু তাহা বন্ধ করিয়া দ্বিতীয় পুত্রের শোক সহ্য করিয়াছেন। কেহ বলিতে লাগিল যে নিয়মে পূজা আজ তিন চারিবৎসর চলিতেছে, তাহাই করা উচিত; তা কালিবাবু দেখি আবার পূর্ব্বের নিয়ম আরম্ভ করিলেন। দর্শকগণের কথা শুনিয়া হরিভূষণবাবু পুত্রের কৃতকার্য্যের প্রতিবাদ করিতে আর সাহসী হইলেন না, কেননা তিনি নিজেই সপ্তমী অষ্টমী দুদিন কালিদাসের ভক্তিপূর্ণ ক্রিয়া আর সাধকমূর্ত্তির ভাষা শুনিয়াছেন, সুতরাং বলি দিতে নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও অদ্য আর নিষেধ করিলেন না। ভক্ত কালিদাসের মাতৃচরণে প্রার্থনার প্রথমাংশ পূর্ণ হইল।

এদিকে নবমীপূজার অন্যান্য অঙ্গ সমস্ত পূর্ণ হইলে, পুরোহিত যখন বলি উপহার দিবার অনুকল্পানুসন্ধান করিতে ছিলেন, কালিদাস তখন বলিল না—পুরোহিত ঠাকুর, ওস্থানটা আর পূর্ব্ববৎ অনুকল্পে সারিবেন না। আসুন, এই যে আমি বলির দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি।

তখন চারিদিকে একটা কোলাহল জাগিয়া উঠিল, বাদ্যকরদল বাজাইতে বাজাইতে আসিয়া মণ্ডপের নিকট উপস্থিত হইল। পল্লীবালকদল মহাকৌতুকে আসিয়া নাটমন্দির পূর্ণ করিয়া দাঁড়া-

হল,রমণীগণ অনবরত উলুধ্বনি করিতে লাগিল,মন্দিরে কাঁসর,শাঁখ,ঘণ্টা ধ্বনিত হইতে লাগিল, তাহার মধ্যে একটা ক্ষীণ বংশীরব মিশিয়া দর্শকগণের হৃদয়কে ঐশী শক্তির দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। পুরোহিত খড়্গ কুষ্মাণ্ড উৎসর্গ করিয়া হাড়িকাঠের নিকটে খড়্গপূজা করিলেন। ভক্ত কালিদাস নিজেই অর্চ্চিত খড়্গ লইয়া নতজানু হইয়া প্রাণ খুলিয়া মাকে ডাকিতে লাগিল। এই সময় হরিবাবু দূরে দাঁড়াইয়া পুত্রের এই রাজসিকভাবসমন্বিত ভক্তিগদগদমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। গৃহিণী আসিয়া কালিদাসের অতি নিকটেই যুক্তকরে মৃদু মধুরস্বরে দুর্গা দুর্গা বলিয়া ব্যাকুল প্রাণে পুত্রের তৎকালীন ভক্তিভীতিসংকোচসাধক ঘাতক মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন। কালিদাসের বালিকা পত্নী গললগ্নি-কৃতবাসা হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে ব্রীড়া-সঙ্কোচ বদনে একবার দেবীর প্রতিমার দিকে, আরবার উদ্যত খড়্গাধারী স্বামীর দিকে চাহিয়া ভয়-ভক্তিপুলকপূরিত হৃদয়ে মৃদু কম্পনে দুর্গা দুর্গা বলিয়া নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল। উপস্থিত দর্শক মাত্রেই মা! মা! বলিয়া সমস্ত শরৎপ্রকৃতিকে মুখরিত করিয়া তুলিল।

পুরোহিত বলিলেন ওহে! মধুবিশ্বাস, তুমি ধুপাধারে ধূপ নিক্ষেপ কর। তখন ধুপাধারে আয়োজনকারিগণ ধূপ গুগ্‌গুল দিয়া নাটমন্দির পর্য্যন্ত ধূম্রময় করিয়া তুলিল, নাটমন্দিরের একধারে একটী অপরিচিত সাধুপুরুষ দক্ষিণ করে ত্রিশূল ধারণ করিয়া রক্তচন্দনানুলেপিত উন্নতকলেবর রক্তবস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া আবক্ষ রুদ্রাক্ষবিলম্বিতকণ্ঠে দুর্গা দুর্গা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাঁহার উন্মুক্ত মাতৃসম্বোধনে শরতের সূর্য্যকরদীপ্ত সমীরণ পর্য্যন্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, দর্শকগণের এক পলক দৃষ্টি তাঁহার বিরাট মূর্ত্তির দিকে পতিত হইল।

কালিদাস নিশ্চল—স্থিরদৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ-বন্ধুকে বলিল – দাও ভাই, সময় হইয়াছে, এই ঠিক সময় হাড়িকাঠের নিকট কুষ্মাণ্ড সরাইয়া দাও। ওই যে মায়ের হাসিমাখা মুখ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। মায়ের এখন রুধির-পিপাসা হইয়াছে, এই বলির উপযুক্ত সময়।

কালিদাসের ব্রাহ্মণবন্ধু হাড়িকাঠের নিকট কুষ্মাণ্ড সরাইয়া দিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীদ্বারা স্পর্শ করিয়া রহিল, কালিদাস প্রতিমার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মায়ের অনুমতি লইল, আর একবার দূরস্থিত সাধুর পাদপদ্মের দিকে দৃষ্টি করিয়া “মা লও” বলিয়া অতি কৌশলে অতি বেগে, অথচ নাতিশক্তি নাতি দুর্ব্বলতায় আঘাত করিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে কুষ্মাণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইল। দর্শকগণ শিহরিয়া উঠিয়া দেখিল কর্ত্তিত কুষ্মাণ্ড হইতে বেগে রক্তস্রাব হইতেছে। বলিধৃতকারী ইক্ষুদণ্ড ধারণ করিল, খড়্গোত্তলিত হইলে সমস্ত দর্শকগণ দেখিল কালিদাসের হস্তস্থিত লৌহময় খড়্গ স্বর্ণময় হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে ইক্ষু, কদলী দ্বিখণ্ডিত হইল। মা! তোমার ইচ্ছা, তুমি জান বলিয়া কালিদাস উঠিয়া দাঁড়াইল।

নাটমন্দিরের পার্শ্ব হইতে ভৈরববেশধারী স্বামী যোগানন্দ কালিদাসকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, মা, ওগো অঘটনঘটনঘটিয়সী, তোমার ভক্ত সাধক, তোমার রুধির-পিপাসা, তোমার বলিগ্রহণেচ্ছা কেমন সুন্দরভাবে মিটাইয়া দিল। ওহে! দর্শকমণ্ডলী চেয়ে দেখ—

দেখ! একেই বলে শক্তি-উপাসনা একেই বলে দুর্গোৎসব। আজ হইতে যুবক সাধকের বংশপরম্পরা সকলেরই নাম হইল "সর্ব্বজয়া বংশ", আর এই পল্লীর নাম হইল "সোণার খাঁড়া"। কই, হরিভূষণবাবু কই—দেখুন আপনার তান্ত্রিক পুত্র কেমন সাত্বিক দুর্গোৎসব করিল! শক্তি-উপাসনার ক্রম, পদ্ধতি, আচার, অনুষ্ঠান আর প্রাণের ঐকান্তিক নিষ্ঠা থাকিলে, প্রতি বৎসর চিন্ময়ীর মৃন্ময়ীমূর্ত্তির পূজা এইরূপেই হইয়া থাকে, ইহাই প্রকৃত ভগবদারাধনা, ইহাই প্রকৃত দুর্গোৎসব।

যাহার ইঙ্গিতে এই রবি-তারা-শশিকরদীপ্ত অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত সেই "একমেবদ্বিতীয়া" সচ্চিদানন্দময়ীর শিবশান্তমদ্বৈতমখণ্ডশক্তি-সত্তের পূজাই নরজীবনের চরম লক্ষ্য।

আমি অদ্য তিন চারিবর্ষ পুত্র প্রতিম শিষ্য কালিদাসকে তান্ত্রিক শিক্ষায় দীক্ষিত করিয়াছিলাম আজ তাহা পূর্ণ হইল। প্রাণাধিক কালিদাস! তোমার নামের আজ পূর্ণ সার্থকতা জন্মিল, আমারও গুরুগিরির অবসান হইল। জগৎ চক্ষু মেলিয়া দেখ, দুর্গোৎসবে জীবদুর্গতিনাশিনীর প্রকৃত অর্চনা করিতে হইলে কালিদাসের স্থায় ঐকান্তিকী নিষ্ঠা অনন্যসাধারণ বিশ্বাস, আর শুদ্ধ স্বভরা ভক্তি লইয় দুর্গোৎসব করিতে হয়।

যাও কালি, তোমার আর এ জীবনে কোন ক্রিয়া নাই, এই প্রতিমা বিসর্জ্জন দিও না, নিত্য নিজে পঞ্চোপচারে পূজা করিও। শরতে, বসন্তে ষোড়শোপচারে পূজা করিও, এই খড়্গ তোমার সর্ব্বজয়াবংশের গৃহে থাকিতে শত্রুর উৎপাৎ, কর্ম্মের বিঘ্নতা, আর মুক্তিমার্গে আগমনের অন্তরায় কখনও ঘটিবে না। হরিভূষণবাবু! তুমি কালিদাসের স্থায় পুত্রদেহে জগতে জগজ্জননীর প্রকৃত পূজা—প্রকৃত দুর্গোৎসব করিলে, কালি! আমি চলিলাম, আর একদিন যেদিন তোমার মুক্তআত্মা তোমার দেহ ত্যাগ করিয়া পরমাত্মায় বিলীন হইবে, সেই দিন আমার অন্তরূপ মূর্ত্তির দর্শন পাইবে।

বলিতে বলিতে সাধু অন্তর্হিত হইলেন। ভক্তশিষ্য ঐ অবস্থাতে গুরুদেবের চরণ বন্দনা উদ্দেশ্যে মৃত্তিকায় লুটাইয়া পড়িল, কিন্তু উঠিয়া আর দর্শন পাইল না! মহানবমীর দিন মহাগুরুর দর্শন পাইয়া আর মায়ের অতুল্য করুণা লাভ করিয়া গুরুদেবের আদেশ পালনার্থে পুরোহিতকে দর্পণ বিসর্জ্জন করিতে নিষেধ করিল, সোণার খড়্গ দুই হস্তে ধারণ করিয়া মণ্ডপে যোগাসনে উপবিষ্ট হইলে দর্শকগণ জয়দুর্গা, জয় মা জগদম্বা, বলিয়া যে যার স্থানে চলিয়া গেল।

রায় চৌধুরী বাড়ীর দুর্গোৎসব এইভাবে নির্ব্বাহ হইল। গ্রামস্থ অন্যান্য বাড়ীতেও শক্তিপূজার ক্রমগুলি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। সোণার খাঁড়া গ্রামের বৈষ্ণব মতাবলম্বিগণও সেই দিন হইতে হরিনামের সহিত মা দুর্গা বলিয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ।

বার্ষিকসভা—একাদশ অধিবেশন।

প্রাতে পূজা চণ্ডিপাঠ প্রভৃতি সম্পাদনের পর বেলা ৩॥০টার সময় সঙ্গীত, মঙ্গলাচরণ বেদপাঠদ্বারা সভার উদ্বোধন হয়।

রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর অসুস্থতা বশতঃ যথাসময়ে উপস্থিত হইতে না পারায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতি ক্রমে ত্রিপুরা রাজের দ্বারপণ্ডিত প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন।

২। সভাপতির আদেশমতে শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন।

৩। গতবর্ষে ব্রাহ্মণসভা গৃহীত সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে মানপত্র বিতরণের সময় দেখা গেল অধিকাংশ উত্তীর্ণ ছাত্র অনুপস্থিত। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাহাদিগকে মানপত্র প্রদান করা হয়।

৪। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালিকীশোর স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের প্রস্তাবে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচরণ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ লইয়া পণ্ডিতসমাজের উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণার্থ এক কমিটি গঠিত হয়। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ তর্কভূষণ শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ, রায়ঃশ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য বাহাদুর প্রভৃতি।

৫। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র জ্যোতীরত্ন মহাশয় পঞ্জিকাসংক্রান্ত এক জ্যোতিষ প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং সভ্যগণ পঞ্জিকা সংস্কার বিষয়ে আলোচনা করেন।

৬। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আগামীবর্ষেরজন্য পারিষদ সভ্য প্রভৃতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়, বিচারপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর।

সম্পাদক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মান্যবর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মান্যবর কুমার শ্রীযুক্ত শিবশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্মথেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য এম, এ।

হিঃ পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত বীরভদ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

কার্য্যকরী সমিতির সভ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাসুন্দর কৃতিরত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার তর্কনিধি, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সাংখ্যবেদান্ত-তীর্থ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ শিরোরত্ন, শ্রীযুক্ত শ্রীরামশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত শশিকুমার শিরোমণি, শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ তর্করত্ন, রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর, মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, কুমার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায়, কুমার শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু রায়, রাজা শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত রায়, জমিদার শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার আচার্য্য চৌধুরী, জমিদার শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, জমিদার শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পান্নালাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার, শ্রীযুক্ত চিরসুহৃদ লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হর্ষনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালিকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার আচার্য্য, শ্রীযুক্ত গিরিজাকান্ত সান্যাল।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ আবশ্যকমত ৩ জন এতদতিরিক্ত সভ্য মনোনীত করিতে পারিবেন।

পারিষদগণ শ্রীযুক্ত দুর্গাসুন্দর কৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত কালীকিশোর স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত বৈকণ্ঠনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত অন্নদানাথ বেদান্তশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ, শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ শিরোমণি, শ্রীযুক্ত রঘুরাম শিরোমণি, শ্রীযুক্ত জগদীশ স্মৃতিকণ্ঠ, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ, শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত জানকীনাথ তর্করত্ন।

সম্পাদকগণ আবশ্যকমতে কার্য্যকরীসমিতির মতানুসারে অতিরিক্ত ২ জন পরিষদ নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন। বিগত ব্রাহ্মণমহাসম্মিলনের অনুষ্ঠানসমিতির সভাপতি এবং সম্পাদকগণও কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির সভ্য গণ্য হইলেন।

৭। তাহেরপুরের রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুরের প্রস্তাবমতে বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণ-সভা এই স্থির করিলেন যে, এই সভাসংসৃষ্ট ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহোদয়গণ এবং সামাজিক ব্রাহ্মণ-মহোদয়গণ এখন হইতে কোন শ্রাদ্ধাদি বা দেবসেবাদি ধর্ম্মকার্য্যে ও অন্যান্য সামাজিক কার্য্যে যোগদান করিবেন না যেস্থলে (বাজারের) ভেজালঘৃত ব্যবহৃত হইবে বলিয়া তাঁহারা জ্ঞাত হইবেন এবং যতদিন বিশুদ্ধ ঘৃতের ব্যবস্থাসমাজে না হইবে ততদিন তাঁহারা ঘৃতের ব্যবহার সমস্তকার্য্যে বর্জ্জন করিবেন। মাড়োয়ারী ব্রাহ্মণ যে দৃঢ়তর হইয়া ভেজাল ঘৃত ব্যবহার

নিবারণকল্পে চেষ্টা করিতেছেন বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণসভা কায়মনোবাক্যে তাহাতে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন। এবং আরও স্থির করিলেন যে ভেজাল ঘৃত ব্যবহারকারী ও তৎসাহায্য-কারী ব্যক্তিগণ প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবেন।

৮। ভারতমিত্র সম্পাদক ও মাড়োয়ারী ব্রাহ্মণগণ [illegible] বি[illegible]স্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। পরে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সাংখ্য[illegible] ও শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয় প্রভৃতি ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেন

সভায় উপস্থিত জন সংখ্যা ৩০০ শতেরও [illegible] অনেকেই ফিরিয়া গিয়াছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণেতর জাতির [illegible] ও [illegible] হইয়াছিলেন। রাত্রি ৯॥ টার সময় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠের স্বর্গার্থে পরিষদ সভাগণকে বিদায় দেন এবং পরদিন প্রাতে মান্যবর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় বিদেশাগত অধ্যাপক-গণকে আহ্বানপূর্ব্বক বিদায় করেন।

আগমনী।

(১)

আজি—মুগ্ধ-শরত-লগনে,
জাগগো জননী বিশ্বমাঝারে,
শঙ্খনাদিতবোধনে—
এসগো শুভ্রচারুহাসিনী,
এসগো সাধকসিদ্ধিদায়িনি!
ভাবে গদগদ বিভোর চিত্ত
বঙ্গবাসীর পরাণে;
মুগ্ধ-শরত-লগনে।

(২)

এস—কল্যাণময়ি জননি!
বহিছে শারদস্নিগ্ধসমীর,
শস্যশ্যামলাধরণী;
দীঘিসরোবরে তুহিনধবল
কুমুদকমল করে টলমল,
ছুটিছে তটিনী, গাহিছে বিহগ,
এসগো শঙ্খুঘরণি!
কল্যাণময়ি জননি।

(৩)

আজি—সান্ধ্যসিঁদুরকিরণে,
এসগো নিখিলপূজ্যাজননী।
চঞ্চল চারুচরণে,
বিশকোটীকণ্ঠে ডাকিছে সন্তান,
আর কেন মা রাখ অভিমান?
ধরি গণপতিকার্ত্তিকেয় কর,
এসগো দীনের ভবনে;
সান্ধ্যসিঁদুরকিরণে।

(৪)

অয়ি—ফুল্লকুসুমশোভিতা!
রমাবাণীসহ আসিয়া ভারতে,
নাশগো এ ঘোর দীনতা;
রোগশোকজ্বালা তীব্রহাহাকার,
বহিছে সতত বিষাদের ধার,
নাশগো জননী, রিপুভয় হরা,
এসগো ত্রিলোকপূজিতা।
ফুল্লকুসুমশোভিতা!

(৫)

ওমা—চারুচন্দ্রভালিকে,
পূজিতে বাসনা ওপদপঙ্কজ,
দাওমা শকতি সেবকে ;
কেঁপে ওঠে বুক, মেতে ওঠে প্রাণ,
দূরে সরে যায়, দ্বেষ অভিমান,
যদি পায় কভু মায়ের সন্তান,
পূজিতে ওপদ পুলকে ;
চারুচন্দ্রভালিকে !

(৬)

এস—বিশ্বজননি অম্বিকে !
বারে বারে যাও ফেলিয়া মোদের,
কাঁদাতে পলকে পলকে,
ভক্তির পূত নয়নের মণি,
নিরাশার আশা, মুক্তি সুধা খনি,
ওপদ পাসরি, রহিতে না পারি,
যেওনা মা আর দ্যুলোকে ;
বিশ্বজননি অম্বিকে।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সরস্বতী।

জ্যোতিঃশাস্ত্রের অবনতির কারণ।

পঞ্জিকা সংস্কার বিষয়ে কর্ত্তব্য অবধারণজন্য পঞ্জিকা সমিতি নামে বঙ্গীয়ব্রাহ্মণ-সভার একটী স্বতন্ত্র শাখাসভা স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মণ-সভার অদ্যকার অধিবেশনে পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধীয় কোন কথা উত্থাপন করা নিষ্প্রয়োজন। তবে বঙ্গে জ্যোতিঃশাস্ত্রের এই ঘোরতর অবনতির দিনে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজকে জ্যোতিঃশাস্ত্রের আলোচনা বিষয়ক দুই একটী কথা জানাইয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্যবোধে আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। আশা করি, আমার এই অল্প কয়েকটী কথা ব্রাহ্মণ- সভা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া পঞ্জিকা-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গে অধঃপতিত জোঃতিশাস্ত্রের পুনরুত্থানের যদি কোন সুব্যবস্থা হইতে পারে, তবে তাহা করিবেন। রোগের মূল উৎপাটন করিতে না পারিলে যে চিকিৎসার ফল দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, একথাটা বোধ হয় সকলেই জানেন। একবার পঞ্জিকাসংস্কার না হয় বিদেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের সাহায্যেই করা হইল ; কিন্তু এই সংস্কারের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং প্রয়োজনমত পুনঃ পুনঃ কালান্তর সংস্কার করিয়া চিরকাল বিশুদ্ধভাবে পঞ্জিকা গণনা করিতে হইবে তো ? সুতরাং এখন হইতে তাহার সুব্যবস্থা না করিলে পঞ্জিকা-সংস্কার যে পরে বিড়ম্বনার কারণ হইতে পারে, একথাটীও বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণ-সভা চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

জ্যোতিষ ষড়ঙ্গবেদের প্রধানঅঙ্গ চক্ষু। জ্যোতিষকে চক্ষু বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সমগ্র বেদ হইতে জ্যোতিঃশাস্ত্রটী বাদ দিলে বেদ অন্ধ হইয়া যায়, অর্থাৎ বেদবিহিত কোন ক্রিয়াকর্ম্মই যথাকালে নিষ্পন্ন হইতে পারে না।

"বরমেকাহুতিঃ কালে না কালে লক্ষ কোটয়ঃ।"

বেদোক্ত কর্ম্মসমূহ যথাকালে নিষ্পন্ন না হইলে তাহার ফল হয় না। কাজেই কালনির্ণায়ক জ্যোতিষশাস্ত্রের দ্বারা যদি অশুদ্ধকাল নির্দ্ধারিত হয়, তবে বেদবিহিত সমস্ত কর্ম্মপণ্ড হইয়া যায়।

বৈদের চক্ষুস্বরূপ কালনির্ণায়ক জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক অষ্টাদশজন ঋষির নাম শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

"সূর্য্যঃ পিতামহো ব্যাসো বশিষ্ঠোঽত্রি পরাশরঃ।
কশ্যপো নারদো গর্গো মরীচির্ম্মনুরঙ্গিরা॥
লোমশঃ পৌলিশশ্চৈব ভার্গবো যবনো গুরুঃ।
শৌনকোঽষ্টাদশাশ্চৈতে জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকাঃ॥

সূর্য্য, পিতামহব্রহ্মা, ব্যাস, বশিষ্ঠ, অত্রি, পরাশর, কশ্যপ, নারদ, গর্গ, মরীচি, মনু, অঙ্গিরা লোমশ, পৌলিশ, ভার্গব, যবন, বৃহস্পতি এবং শৌনক এই অষ্টাদশজন ঋষি জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক।

তৎকালে প্রাচীন ঋষিগণের সকলেই যে কালনির্ণায়ক জ্যোতিশাস্ত্রের প্রভূত চর্চ্চা করিতেন, তাহার প্রমাণ তাঁহাদিগের প্রণীত সংহিতাগুলির নামেরদ্বারা পাওয়া যায়; কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ সংহিতাগুলির অধিকাংশই আজকাল আর পাওয়া যায় না।

স্কন্ধত্রয়াধিষ্ঠিত সম্পূর্ণ জ্যোতির্গ্রন্থের নাম সংহিতা। বৃহৎসংহিতায়াং -

জ্যোতিঃশাস্ত্রমনেক ভেদ বিষয়ং স্কন্ধত্রয়াধিষ্ঠিতং।
তৎকার্ৎস্ন্যোপনয়নস্য নাম মুনিভিঃ সংকীর্ত্ত্যতে সংহিতা॥
স্কন্ধেঽস্মিন্ গণিতেন যা গ্রহগতি স্তন্ত্রাভিধানস্ত্বসৌ।
হোরান্যোঽঙ্গ বিনিশ্চয়শ্চ কথিতঃ স্কন্ধস্তৃতীয়োঽপরঃ॥

অর্থাৎ অনেক ভেদবিশিষ্ট বিস্তৃত জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রধানতঃ তিন স্কন্ধে বিভক্ত। এই ত্রিস্কন্ধ জ্যোতিষের সমগ্র বিষয় যাহাতে বিবৃত হইয়াছে, তাহারই নাম সংহিতা। জ্যোতিষের যে স্কন্ধদ্বারা গ্রহগতি প্রভৃতি নিরূপিত হয় তাহার নাম জ্যোতিষ তন্ত্র। যে স্কন্ধেরদ্বারা ভাগ্যফল বিচার ও প্রশ্নাদি গণনা করা হয় তাহার নাম হোরাস্কন্ধ। আর যে স্কন্ধেরদ্বারা গ্রহবারের ফল, রাষ্ট্রবিপ্লব, ঝড়বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প ও উল্কাপাতপ্রভৃতি আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক উৎপাতসমূহের গণনা এবং গণিত ও ফলিত উভয়ের মিশ্রিত বহুবিধ গণনা হয়, তাহার নাম মিশ্রস্কন্ধ।

এই ত্রিস্কন্ধ জ্যোতিষসংহিতা যে প্রাচীন ঋষিগণ বেদাঙ্গ বলিয়া যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিতেন এবং অপরকেও অধ্যয়ন করিবার জন্য উপদেশ দিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। বঙ্গীয়ব্রাহ্মণ-সমাজে জ্যোতিঃশাস্ত্রের এই লাঞ্ছনার দিনে তাহার দুইএকটী প্রমাণ মাত্র আমি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

বশিষ্ঠসংহিতায়াং—

অধ্যেতব্যং ব্রাহ্মণৈরেব তস্মাৎ
জ্যোতিঃ শাস্ত্রং পুণ্যমেতদ্রহস্যম্।
এতদ্বুদ্ধ্যা সম্যগাপ্নোতি বস্মাদর্থং
ধর্ম্মং মোক্ষ মগ্র্যাং যশশ্চ॥

বশিষ্ঠ বলিতেছেন—

এই পুণ্য জনক রহস্যপূর্ণ জ্যোতিঃ শাস্ত্র ব্রাহ্মণগণের অবশ্য অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। যে হেতু জ্যোতিঃশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিলে অর্থ, ধর্ম্ম, মোক্ষ, পণ্ডিতাগ্রগণ্যতা এবং যশ সম্যক্ প্রকারেই লাভ হইয়া থাকে।

মাণ্ডব্য—

এবম্বিধঞ্চ শ্রুতিনেত্র শাস্ত্রং
স্বরূপভর্ত্তুঃ খলু দর্শনং বৈ।
নিহন্ত্যশেষং কলুষং জনানাং
ষড়্বর্গজং ধর্ম্মসুখাস্পদংস্যাৎ॥

মাণ্ডব্য বলিতেছেন—

এবম্প্রকার শ্রুতিনেত্র স্বরূপ জ্যোতিঃশাস্ত্র অধ্যয়নে মনুষ্যগণের কামক্রোধাদি ষড়্বর্গ-সম্ভূত পাপরাশি বিদূরিত হইয়া ধর্ম্ম, সুখ এবং ব্রহ্মস্বরূপদর্শন লাভ হইয়া থাকে।

গর্গসংহিতায়াং—

জ্যোতিশ্চক্রেতু লোকস্য সর্ব্বস্যোক্তং শুভাশুভং।
জ্যোতির্জ্ঞানন্তু যোবেদ স যাতি পরমাং গতিম্॥
স্পষ্টার্থ।

সিদ্ধান্ত শিরোমণৌ—

তস্মাদ্দ্বিজৈরধ্যয়নীয় মেবং
পুণ্যং রহস্যং পরমঞ্চতত্ত্বম্।
যো জ্যোতিষং বেত্তি নরঃ স সম্যক্
ধর্ম্মার্থ মোক্ষান্ লভতে যশশ্চ॥
স্পষ্টার্থ।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

গ্রন্থত স্বার্থতশ্চৈব কৃৎস্নং জানাত্যসৌ দ্বিজঃ।
অগ্রভুক্ স ভবেৎশ্রাদ্ধে পূজিতঃ পংক্তি পাবনঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে, যে দ্বিজ ব্যাখ্যার সহিত ত্রিস্কন্ধ জ্যোতিঃশাস্ত্র জানেন, তিনি শ্রাদ্ধে অগ্রভোজী, সকলের নিকট পূজিত এবং পংক্তি পাবন হইয়া থাকেন।

প্রমিতাক্ষরায়াম্—

দশদিনকৃত পাপংহন্তি সিদ্ধান্তবেত্তা
ত্রিদিন জনিত দোষং তন্ত্রবিদ্ দৃষ্টএব।
করণ ভগণবেত্তা হন্ত্যহোরাত্র দোষং
জনয়তি বহুদোষং তত্র নক্ষত্র সূচী॥

জ্যোতিষের তন্ত্রস্কন্ধকে ত্রিভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার প্রত্যেক ভাগের ফলশ্রুতি বিষয়ে প্রমিতাক্ষরায় উক্ত হইয়াছে যে, সিদ্ধান্তবেত্তাকে দর্শন করিলে দশদিনের পাপ নাশ হয়। তন্ত্রবিৎকে দর্শন করিলে তিন দিনের এবং করণভগণবেত্তা জ্যোতির্ব্বিৎকে দর্শন করিলেও অহোরাত্রের পাপ নষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু নক্ষত্রসূচী দর্শনে বহুবিধ দোষের উৎপত্তি হয়।

নক্ষত্রসূচীলক্ষণং বৃহৎ-সংহিতায়াম্—

অবিদিত্বৈব যঃ শাস্ত্রং দৈবজ্ঞত্বং প্রপদ্যতে।
স পংক্তিদূষকঃ পাপো জ্ঞেয়ো নক্ষত্রসূচকঃ॥
তিথ্যুৎপত্তিং ন জানন্তি গ্রহাণাং নৈব সাধনম্।
পরবাক্যেন বর্ত্তন্তে তে বৈ নক্ষত্রসূচকাঃ॥

বৃহৎ-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়ে জ্ঞান উপার্জ্জন না করিয়া আপনাকে জ্যোতিষী বলিয়া পরিচয় দেয়, তিথির উৎপত্তি এবং গ্রহসাধন কিছুই জানে না, কেবল পরের গণিত পঞ্জিকার উপর নির্ভর করিয়া নক্ষত্রাদির শুভাশুভ ফল বলিয়া বেড়ায়, তাহার নাম নক্ষত্রসূচী। পাপস্বরূপ এই নক্ষত্রসূচী পংক্তির দূষক অর্থাৎ পতিত হইয়া থাকে।

উপরোক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, ত্রিস্কন্ধ জ্যোতিঃশাস্ত্রে পারদর্শী ব্রাহ্মণ সকলের নিকট পূজনীয়। শ্রাদ্ধে অগ্রভোজী, পংক্তিপাবন এবং তাঁহাকে দর্শন করিলেও বহুবিধ পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। যিনি কেবল সিদ্ধান্ত, তন্ত্র বা করণে পারদর্শী, তাহাকে দর্শন করিলেও যথাক্রমে দশদিন, তিনদিন এবং একদিনের পাপ নষ্ট হয়। আর প্রতারক নক্ষত্র সূচিগণ পাপস্বরূপ এবং তাহাদিগের মুখ দর্শন করিলেও পাপ হইয়া থাকে।

পূজ্যপাদ প্রাচীন মহর্ষিগণ ষড়ঙ্গবেদের প্রধান অঙ্গস্বরূপ জ্যোতিষ ও জ্যোতির্ব্বিদের প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, আর কোন বেদাঙ্গ বা বেদাঙ্গবিৎকে সেরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু এত সম্মানের জ্যোতিঃশাস্ত্রের ব্যবসা আজকাল বঙ্গদেশে এত হেয় হইয়া পড়িয়াছে কেন? কেহ তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন কি?

বোধ হয় প্রধান কারণ—জ্যোতির্ব্বিদের প্রতি বঙ্গীয় রাজশক্তির ও ব্রাহ্মণ-সমাজের উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের অভাব এবং গৌণ কারণ, নক্ষত্রসূচীর সমাদর ও সংখ্যা বৃদ্ধি।

বখ্তিয়ার খিলিজির বঙ্গপ্রবেশের পর হইতে দুর্ভাগ্য রাজা লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গ হইতে হিন্দুশাসন তিরোহিত হয়। মুসলমান রাজপ্রতিনিধিগণ সিদ্ধান্তজ্যোতিষের মর্ম্ম একবারেই বুঝিতেন না। ফলিতজ্যোতিষের বলে, অথবা হাত দেখিয়া যে তাঁহাদিগকে ঠিক ঠিক দুই চারিটা কথা বলিয়া দিতে পারিত, তাহারাই তাঁহাদিগের নিকট আদর ও ও সম্মান পাইত। সিদ্ধান্তজ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ শত পণ্ডিত হইলেও তাঁহাদিগের দরবারে

ঘেঁসিতে পারিতেন না। কাজেই ক্রমে সিদ্ধান্তজ্যোতির্ব্বিদের অভাব এবং নক্ষত্রসূচীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। করণগ্রন্থের দ্বারা ও গণিত পঞ্জিকা দ্বারাই প্রশ্নগণনা এবং মোটামুটি কোষ্ঠীর ফল বলা যাইতে পারে—সুতরাং এত কষ্ট স্বীকার করিয়া সিদ্ধান্তজ্যোতিষ অধ্যয়ন করিতে কে যায়? সূর্য্যসিদ্ধান্তের বীজসংস্কারক পণ্ডিত রাঘবানন্দ ভট্টাচার্য্যের পর, গত তিন শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গদেশে আর কোন খ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদের নামই শোনা যায় না।

মুসলমান রাজশক্তির শাসন বঙ্গদেশে জ্যোতিঃশাস্ত্রের অবনতির প্রধান কারণ হইলেও, এ বিষয়ে বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণ-সমাজ একবারে নির্দ্দোষ নহেন। তাহার কারণ - সিদ্ধান্ত জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ রাজশক্তিদ্বারা অনাদৃত হইলেও, জ্যোতিঃশাস্ত্রের মর্য্যাদারক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ সমাজে তাঁহাদিগের সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকা উচিত ছিল। সিদ্ধান্তবিদগণের সংখ্যা হ্রাস হইয়া যখন অতি অল্পসংখ্যায় পরিণত হইল, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজ তখন তাঁহাদিগকে একেবারে নক্ষত্রসূচীর সহিত সমন্বয় করিয়া দিলেন। ক্রমে ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষে তাঁহাদিগের নিমন্ত্রণ বন্ধ হইল এবং অতিকষ্টে দুরূহ জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত অধ্যয়ন করিয়া, অর্থ ও সম্মানের পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগের ভাগ্যে অনর্থ ও অবজ্ঞামাত্র সার হইল। কোষ্ঠীঠিকুজীর ব্যবসা করিয়া কোন প্রকারে তাঁহারা দিনপাত করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে জ্যোতিঃসিদ্ধান্তের চর্চ্চা বঙ্গদেশ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইল।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজের সেই কৃতকর্ম্মের প্রতিক্রিয়া এতদিনে উপস্থিত হইয়াছে। পঞ্জিকা-বিভ্রাটের প্রবল আবর্ত্তে নিপতিত হইয়া আজ আমরা উদ্ধারের উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিনা। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণেতর জাতি এবং পরদেশীয়ের শরণাপন্ন হইয়াও কূল পাইতেছিনা। যে বঙ্গ—শাস্ত্রচর্চ্চায় একদিন ভারতের সমস্ত প্রদেশের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, সেই বঙ্গ হইতে জ্যোতিঃশাস্ত্রের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি বোম্বাই নিখিলভারতজ্যোতির্ব্বিৎসম্মিলনে প্রেরিত হইতে পারে নাই, ইহা কি সামান্য অনুতাপের বিষয়?

আমার অদ্যকার বক্তব্য এইখানেই শেষ হইল। বঙ্গে জ্যোতিঃশাস্ত্রের অধঃপতনের কারণ—আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যতটুকু বুঝি, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের গোচর করিলাম। এখন ইহার কোন প্রতিকারের উপায় আছে কিনা, তাহা ব্রাহ্মণসমাজের বিচার্য্য। দৈহিক ব্যাধির ন্যায় সামাজিক ব্যাধি গুলিও একেবারে বদ্ধমূল হইয়া পড়িলে কৃচ্ছ্রসাধ্য হয় বটে, কিন্তু ঐকান্তিক চেষ্টায় নিকট অসাধ্য হয়না বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

শ্রীকুলচন্দ্র জ্যোতীরত্নভট্টাচার্য্য।

পঞ্জিকা-সংস্কার সমালোচনার বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তাঁহার ব্যঙ্গোক্তি "অশুদ্ধ সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিকতা" তাঁহারি নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইল। তবে ইঁহার তর্কশক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না (ক); ঐতিহাসিক ঘটনাও ইঁহার তর্কবলে বিচলিত। যখন দেখিলেন যে ইউরোপীয় পঞ্জিকা-সংস্কারে ভ্রান্তি আংশিক রহিয়া গিয়াছে, তখন দেখাইলেন কেন সেই ভ্রান্তি আছে। কেন আছে দেখাইলে যে 'নাই' একথা প্রমাণ হয় না 'আছে' এই কথাই সবল হইয়া দাঁড়ায়,তাহা বিস্মৃত হইলেন। ইঁহার উদ্ভাবনা শক্তি দেখিলে প্রাচীন উপকথার বীরোপাধিক স্থূল কলেবর রাজকুমারসহচরের কথাটা মনে হয়, কেহ তাঁহাকে কখন আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই।

সপ্তম উদাহরণ। সিদ্ধান্তজ্যোতির্ভূষণ মহাশয় সিদ্ধান্তসাগর মন্থন করিয়া যে সকল রত্নোদ্ধার করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন ব্রাহ্মণ সমাজের ১৩২৩ চৈত্র সংখ্যার ৭১ পৃষ্ঠার নিম্ন দেশে লিপি বদ্ধ হইয়াছে; "সূর্য্যসিদ্ধান্তে পরিষ্কার লিখিত আছে যে অয়নারম্ভের সময় ৪২১ শক।"

সকলের সূর্য্যসিদ্ধান্ত সমভাবে পড়া নাই; সেই জন্য সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় তাঁহার পঠিত সূর্য্যসিদ্ধান্তের অধ্যায় ও শ্লোক নির্দ্দেশ করিয়া দিলে সাধারণের শ্রম লাঘব করিতেন। আমরা পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া "স্পষ্ট ভাষায় লিখিত অয়নারম্ভ কাল ৪২১ শক" কোথাও পাইলাম না। সূর্য্যসিদ্ধান্তের অন্যান্য সকল গণনার ন্যায় অয়ন গণনাও সৃষ্টির আদি হইতে। জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় কি বলিতে চাহেন যে সূর্য্যসিদ্ধান্ত ৪২১ বা তৎপরবর্ত্তী কোন শকে বিরচিত? এইরূপ ধারণার আবরণ দিবার জন্যই কি তিনি পুনঃ পুনঃ যোগবলাদির কথা উত্থাপন করিয়াছেন? যাহাই হউক, নিরপেক্ষ পাঠকের অবগতির জন্য আমরা সূর্য্যসিদ্ধান্তের ত্রিপ্রশ্নাধিকারের নবম ও দশম শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

ত্রিংশৎকৃত্যো যুগে ভানাং চক্রং প্রাক্ পরিলম্বতে।
তদ্‌গুণাদ্ভুদিনৈর্ভক্তাদ্‌দ্যুগণাদ্যদবাপ্যতে॥
তদ্দোস্ত্রিঘ্না দশাপ্তাংশা বিজ্ঞেয়া অয়নাভিধাঃ।

ইহার অর্থ বোধের জন্য রঙ্গনাথ টীকা করিলেন যুগে ষট্‌শতকৃত্বো হি ভচক্রং পরিলম্বতে। অহর্গণাৎ তদ্‌গুণাৎ ষট্‌শত গুণিতাদ্ ভুদিনৈঃ যুগীয় সূর্য্যসাবনদিনৈর্ভক্তাৎ যৎ ফলং ভগণাদিকং প্রাপ্যতে তস্য ভগণত্যাগেন রাশ্যাদিকস্য ভুজঃ কার্য্যস্তস্মাৎ দশাপ্তাংশা দশভির্ভজনেন আপ্তাংশাঃ ত্রিগুণিতা অয়ন সংজ্ঞকা জ্ঞেয়াঃ।

(ক) Northern logician etc.

এক যুগে ভচক্র (=রাশিচক্র) ৬০০ বার আবর্ত্তন করে। অহর্গণকে * ... দ্বারা গুণ করিয়া যুগীয় দিনসংখ্যা † দ্বারা ভাগ করিতে হইবে। পূর্ণ সংখ্যক ভাগফল ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট রাশ্যংশাদির ভুজাংশ ‡ গ্রহণ করিতে হইবে। ভুজাংশকে দশভাগ করিয়া তিন গুণ করিলে অয়নাংশ হয়।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের শ্লোক ও রঙ্গনাথের টীকায় দেখা যায় যে অয়নারম্ভ "স্পষ্ট ভাষায় লিখিত ৪২১ শকে" না হইয়া সৃষ্টির আদিতে। সিদ্ধান্তজ্যোতির্ব্বিভূষণ মহাশয়ের মতে যদি সূর্য্য-সিদ্ধান্ত রচনাকাল ৪২১ বা তৎপরবর্ত্তী কোন শকও হয়, তাহা হইলেও তাঁহার লেখায় অসঙ্গতি দোষ হইয়াছে। কারণ তিনি তাঁহার প্রবন্ধের সূচনায় সূর্য্যসিদ্ধান্তকে ঋষিপ্রণীত আর্ষ শাস্ত্র বলিয়াছেন। ৪২১ শকের পর কোন ঋষির আবির্ভাবের কথা আমাদের জানা নাই। শ্রীযুক্ত সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় এরূপ ঋষি নির্দ্দেশ করিলে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু অপাততঃ আমাদের বিশ্বাস এই যে তিনিও ৪২১ শকের পরবর্ত্তী কোন ঋষি-কথা জানেন না। আশু বাবুর ভ্রান্তি নির্দ্দেশের আগ্রহাতিশয্যে বিস্মৃত হইয়াছেন যে আরম্ভে তিনি সূর্য্যসিদ্ধান্তকে আর্ষ পুস্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। §

অষ্টম উদাহরণ। সাতকড়ি বাবু লিখিতেছেন "সায়নানুরোধে প্রাচীন নক্ষত্র পরিবর্ত্তন বশতঃ স্বতন্ত্রতা বর্ত্তমানে নাক্ষত্রিক প্রণালীতে সীমাবদ্ধ হওয়ায় ভাস্করের অয়নাংশের মূল্য প্রভৃত হ্রাস হইয়াছে"। ¶ এক বর্ণও বুঝিলাম না; ৬০ "full of sound and fury"! অবশ্য ভাস্করের মূল্য হ্রাস হইয়া কাহার বাড়িতেছে তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছি, তবে বুদ্ধির চালনা স্থগিত হইয়া গিয়াছে। বিষমেনৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।

নবম উদাহরণ। বর্ত্তমান অয়নাংশাদি লইয়া জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় অনেক কথা লিখিয়াছেন। প্রবন্ধের কলেবর বর্দ্ধনের আশঙ্কায় কয়েকটি বিষয় এই উদাহরণে একত্রে অনুশীলন করা যাউক। জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় বিশুদ্ধ বর্ষমান ও বিশুদ্ধ অয়নগতি লইতে বলিতেছেন। একস্থলে লিখিলেন "বর্ষমান বলিতে সূর্য্য যে ক্ষণে একবার রেবতীনক্ষত্র ভেদ করিয়া

---

* সৃষ্টির আদি হইতে যে দিনের অয়নাংশ আবশ্যক সেই দিন পর্য্যন্ত দিন সংখ্যার নাম অহর্গণ।

† যুগীয় দিন সংখ্যা = বসুদ্ব্যষ্টাদ্রিরূপাঙ্ক সপ্তাদ্রিতিথয়ো যুগে।

‡ ভুজাংশ—that angle in the first or the fourth quadrant, of which the sine is arithmetically equal to the sine of the angle in question.

§ "The latter end of his commonwealth forgets the beginning. It would be a commonwealth and he would be the king on it."

¶ ব্রাহ্মণ সমাজ ১৩২৩ চৈত্র, ৩৭১ পৃষ্ঠা।

ভগণ* পরিভ্রমণের পর পুনরায় ঐরূপ ভেদ করিবেন, ইহার অন্তর কালকে বুঝাইবে। তজ্জন্যই মৃত বাপুদেব আবার লিখিয়াছেন It is to be observed here that the Signs Aries, Taurus etc, are reckoned from the star Revati (Zita Picium)" আর এক স্থলে লিখিলেন "রবিমার্গ (a) বিষুবদ্ রেখায় প্রতিবর্ষে যে পরিমাণে অপসৃত হয় তাহাই বার্ষিক অয়নগতি।" সংক্ষেপে বলিতে গেলে Zita Pisiumএ সূর্য্য আসিলেই বর্ষান্ত হয় ও সূর্য্যের স্ফুট শূন্যরাশি শূন্যঅংশ শূন্যকলা হয়। বিষুব বৃত্ত এবং রবিমার্গ (ecliptic) এতদুভয়ের সন্ধিস্থল হইতে Yita picium যতদূর তাহাই (সেই দূরত্বই) অয়নাংশ। এই কথা লেখক মহাশয় নানাপ্রকারে সুদীর্ঘভাবে বলিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাক তিনি কি করিয়াছেন। তাঁহার পঞ্জিকার গত বৈশাখ প্রদং ইংরাজি ১৯১১ সাল ১৩ই এপ্রিল প্রাতঃকাল ৭।৩১।১৮ সাতটা একত্রিশ মিনিট আঠারো সেকেণ্ড সময়ে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে এই সময় নিরয়ণ রবিস্ফুট ০।০।০ এবং সূর্য্য রেবতী নক্ষত্রে আসিয়াছেন। এই সময় যদি নাবিক পঞ্জিকাসাহায্যে আমরা স্থির করিতে পারি যে রবি আকাশের কোথা এবং রেবতী বা Zieta picium কোথা তাহা হইলে বিষয়টি পরিষ্কার বোধগম্য হইবে।

(a) By the way, it is not the ecliptic that slips upon the equator but the equator slips upon the ecliptic.

প্রথমতঃ দেখা গেল কলিকাতা ১৯১১ সালের ১৩ই এপ্রিল প্রাতঃ ৭ টা ৩১ মি ১৮ সেঃ সময়ে গ্রীন্‌উইচের জ্যোতিষিক* ১২ই এপ্রিল ১৩ টা ৩৭ মি ৫৭ সে। নাবিক পঞ্জিকা প্রদত্ত সূর্য্যের সায়ন স্ফুট ১২ই এপ্রিল ২২।০।৫ এবং ১৩ই ২২।৫৮।৫২। অনুপাত দ্বারা পাওয়া যায় যে ১২ই ১৩টা ৩৭ মি ৫৭ সেকেণ্ড অর্থাৎ সিদ্ধান্তভূষণমহাশয়ের পঞ্জিকার বৈশাখপ্রদং সময়ে রবির সায়নস্ফুট ২২।৩৩।২৯। আবার এই সময়ে রেবতী বা Zieta Picium এর সায়ন স্ফুট ১৮।৪৩।৩০। এতদুভয়ের অন্তর তিন অংশ ৫০ কলা) প্রায় চারি অংশ। সিদ্ধান্ত জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়ের বচন ও কার্য্যের মধ্যে চারিঅংশের প্রভেদ। আবার দেখুন, অয়নাংশ অর্থ সায়ন ও নিরয়ণের প্রভেদ। সিদ্ধান্তজ্যোতির্ভূষণমহাশয়ের সূর্য্যের নিরয়ণ স্ফুট যখন ০।০।০ তখন তাহার সায়ন স্ফুট ২২।৩৩।৩৫ সুতরাং অয়নাংশ ২২।৩৩।৩৫, আবার তাঁহার কথামত রেবতী তারাকে আদিবিন্দু ধরিলে এবৎসরের অয়নাংশ ১৮।৪৩।৩০ হয়। তাঁহার পঞ্জীতে, লিখিত অয়নাংশ ২১।২৬।১২।সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে সিদ্ধান্ত জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়ের রবিতে লুক্কায়িত অয়নাংশ ১২।৩৩।২৯।

---

*জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় ৩৬৬ পৃষ্ঠায় ভগণ অর্থে revolution through the signs বলিয়া এক্ষণে ৪৬৭ পৃষ্ঠায় ভচক্রের পরিবর্ত্তে ভগণ লিখিলেন। বস্তুত সিদ্ধান্তজ্যোতিষে ভগণ অর্থ revolution, ভচক্র নহে।

*The Nautical Almanac uses Greenwich Astronomical date and hour. This count is 12 hours behind the civil reckoning.

তাঁহার প্রচারিত অয়নাংশ ১৮।৪৩।৩০

তাঁহার পঞ্জিকাতে লিখিত অয়নাংশ ২১।১৬।১২

Let a man take out the beams that are in his own eyes before he attempts to notice the moats in other people's eyes.

শ্রীআশুতোষ মিত্র।

পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধে মন্তব্য।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশীয় পঞ্জিকাসমূহের অনৈক্য লক্ষ্য করিয়া বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণসভা পঞ্জিকার সংস্করণ প্রয়োজন বোধ করায় তদ্বিষয়ক আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। ঐ জাতীয় আন্দোলনে বিভিন্ন দেশীয় পণ্ডিতগণও বিভিন্নরূপ সংস্কারের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন।

কেহ বলেন পূর্ব্বাচার্য্যাদিগের ন্যায় হিন্দুগণনা-প্রণালীতে বীজসংস্কার করিতে, কেহ বা যন্ত্রের সাহায্য না লইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি দ্বারা গ্রহাদিপর্য্যবেক্ষণ শাস্ত্রসিদ্ধ মনে করিয়া তদনুরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে বলেন। কোন কোন সম্প্রদায় নাবিক-পঞ্জিকা হইতে গণনাদি গ্রহণ করা বিধেয় মনে করেন। ইঁহারা বলেন যে ঐ সকল পঞ্জিকা মহাপরাক্রমশালী পাশ্চাত্য ভূপতিগণের সাহায্যে উপযুক্ত কর্ম্মচারীর দ্বারা গণিত হওয়ায় উহাতে ভ্রমের সংখ্যা অল্পই হইবার কথা। সংখ্যায় ঐ সম্প্রদায়ের আধিক্য লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় "ধর্ম্মশাস্ত্রের অবিরুদ্ধ দৃক্‌সিদ্ধগণনা গ্রহণীয়" এইরূপ ব্যবস্থা পত্রে সম্মানভাজন কতিপয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও কোন কোন সুবিজ্ঞ ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন। ঐ স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ "ধর্ম্মশাস্ত্রের অবিরুদ্ধ" এই অংশটী বাদ দিয়া কেবলমাত্র "দৃগৈক্যগণনা গ্রহণীয়" এই অংশেই স্বাক্ষর করিয়াছেন। এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে দৃগৈক্যগণনা ধর্ম্মশাস্ত্রের অবিরুদ্ধ নহে। ক্রমশঃ এই বিষয়ের প্রমাণ উল্লেখ করা যাইতেছে। অতি প্রামাণিক সূর্য্যসিদ্ধান্তাদি জ্যোতিঃশাস্ত্রে তিথি, নক্ষত্রাদির যে সাধন-প্রণালী উল্লিখিত হইয়াছে, সেই প্রণালী অনুসারে তিথ্যাদির সাধন করিলে গণিতাগত যে কালপ্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই কালে "বাণবৃদ্ধি রসক্ষয়" এই নিয়ম অব্যভিচরিতভাবে সর্ব্বত্র জাগরূক রহিয়াছে। এইরূপ প্রামাণিক গ্রন্থে "বাণবৃদ্ধি রসক্ষয়" নিয়মের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া "চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণি" নামক স্মৃতিশাস্ত্র সংগ্রহকার হেমাদ্রি সুস্পষ্টভাবে পরাশর মাধবকার মাধবাচার্য্য বা সায়নাচার্য্য "মুহূর্ত্তত্রয় ক্ষয়বশাৎ" এই উক্তি দ্বারা "নির্ণয়সিন্ধু" নামক স্মৃতিশাস্ত্রসংগ্রহকার ও জ্যোতিঃসংগ্রহকার কমলাকর ভট্ট

---

* এই অয়নাংশ বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকার। বিশুদ্ধসিদ্ধান্তপঞ্জিকার বর্ষমান ও বৈশাখ প্রভৃতি সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের পঞ্জিকায় প্রকাশ্যভাবে আছে; ও তাহার অয়নাংশ ইঁহার পঞ্জিকায় রবিতে প্রচ্ছন্নভাবে আছে।

অতিশয় স্পষ্টভাবে এবং অষ্টাবিংশতিতত্ত্বকার রঘুনন্দন বা স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য "যত্র পূর্ব্বদিনে দিবা সার্দ্ধমুহূর্ত্তমাত্রে অমাবস্যা পরদিনে সার্দ্ধ দশম মুহূর্ত্তমাত্রে তত্র চোভয়দিনে কর্ম্মযোগ্যামাবস্যা ন প্রাপ্যতে", এই সন্দর্ভ দ্বারা ও ঐ সমস্ত স্মৃতিনিবন্ধের টীকাকারগণ ও ঐ সমস্ত গ্রন্থাধ্যায়ী পরম পণ্ডিত পূর্ব্বাপর গুরুশিষ্যসম্প্রদায় এমন কি ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যায়ী ব্যক্তিমাত্রেই "বাণবৃদ্ধি রসক্ষয়" এই স্থায়ীনিয়মেরই শাস্ত্রীয়তা স্থিরীকৃত করিয়াছেন ও করিয়া আসিতেছেন। এবং জ্যোতিঃশাস্ত্র নিবন্ধকারবর্গের মধ্যেও "বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়" এই পরিমিত নিয়ম সম্পূর্ণ প্রামাণিক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদগ্রণী ভাস্করাচার্য্য স্বপ্রণীত "সিদ্ধান্ত-শিরোমণি" গ্রন্থে যেরূপ তিথ্যাদি সাধন-প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন—তদনুসারে তিথ্যাদি সাধন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে "বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়" এই নিয়ম অব্যাহত রহিয়াছে। জ্যোতির্নিবন্ধকার গণেশ দৈবজ্ঞও "গ্রহলাঘব" গ্রন্থে যে তিথি সাধন-প্রণালী দেখাইয়াছেন তাহাতেও "বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়" এই নিয়ম অব্যাহত রহিয়াছে। এই সমস্ত বিশেষরূপে স্থির করিয়াই মকরন্দ নামক সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিঃশাস্ত্র নিবন্ধকার নিজকৃত "সারণী"তে স্পষ্টাক্ষরে "বাণবৃদ্ধি রসক্ষয়" রূপ স্থির নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যথা—

"তিথিনক্ষত্র যোগানাং বৃদ্ধিঃ পঞ্চরসাক্ষিভিঃ।
ক্রমেণৈবচ হীয়ন্তে রসবেদগজৈস্তথা"।

অর্থাৎ তিথির পাঁচদণ্ড বৃদ্ধি ছয়দণ্ড ক্ষয়, নক্ষত্রের ছয়দণ্ড বৃদ্ধি চারিদণ্ড ক্ষয়, যোগের দুই দণ্ড বৃদ্ধি আটদণ্ড ক্ষয়। এই মকরন্দ কৃত "সারণী" অনুসারে গণিত পঞ্জিকার মতে ভারতের পবিত্র বিদ্যাতীর্থ ৺কাশীধামে ধর্ম্মকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণিকার হেমাদ্রি—"বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়" কেবল এইমাত্র বলিয়াই নিরস্ত হন নাই। তিনি অতিস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে ঐ বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়রূপ নিয়মের অধিক ক্ষয়বৃদ্ধির কদাচও সম্ভাবনা নাই। যথা—"ত্রিমুহূর্ত্তাধিক তিথিহ্রাসঃ কদাপি ন সম্ভবতি"। অর্থাৎ পারিভাষিক বা স্থূলতিথিরই ধর্ম্মকর্ম্মে গ্রাহ্যতা। ঐ স্থূল তিথির ছয়দণ্ডের অধিক হ্রাসের সম্ভাবনা এই যুগে কোন কালেই হইবে না। এই হেমাদ্রির চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণি গ্রন্থ আদর্শ রাখিয়া স্মার্ত্ত প্রভৃতি প্রায় সমস্ত নিবন্ধকার স্ব স্ব নিবন্ধপ্রণয়ন করিয়াছেন। এবং যে গ্রন্থে ভাস্করাচার্য্যাদি প্রণীত সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি জ্যোতিগ্রন্থ সমূহের সন্দর্ভ স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইয়া মীমাংসিত হইয়াছে সেই গ্রন্থকার হেমাদ্রি বা ঐ গ্রন্থের পংক্তির প্রামাণ্য যে অসন্দিগ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। সূর্য্যসিদ্ধান্ত ব্যাখ্যাকার রঙ্গনাথ—

"শাস্ত্রমাদ্যং তদেবেদং যৎপূর্ব্বং প্রাহ ভাস্করঃ।
যুগানাং পরিবর্ত্তেন কালভেদোঽত্র কেবলম্"॥

এই বচনের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে "পূর্ব্বশাস্ত্রকালাদনন্তরশাস্ত্রকালো ভিন্ন, ইতোশাস্ত্রেষু ভেদো ন শাস্ত্রোক্তরীতিভেদঃ"। অর্থাৎ পূর্ব্ব শাস্ত্রকাল হইতে অনন্তর শাস্ত্রকাল বিভিন্ন হইলেও শাস্ত্রোক্ত রীতিভেদ কদাচ গ্রহণীয় নহে। অর্থাৎ সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থের নিয়ম-

বিরুদ্ধ অভিনব নিয়ম আদরণীয় নহে। জ্যোতিঃশাস্ত্র বেদের একটী প্রধান অঙ্গ। বর্ত্তমান যুগে ঐ বেদাঙ্গ জ্যোতিগ্রর্ন্থের নাম সূর্য্যসিদ্ধান্ত। ষড়ঙ্গ শাস্ত্রের প্রত্যেকেরই বক্তা এক একজন আপ্ত আছেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তের বক্তা সূর্য্যাংশ পুরুষ বা সূর্য্যাবতার। ঐ সূর্য্যাবতার ঋষির মতের অন্যথা হইলে ধর্ম্মবিরুদ্ধ মতের পরিগ্রহরূপ দোষের সম্ভাবনা। "পঞ্চসিদ্ধান্তিকায়" বরাহ বলিয়াছেন যে – পৈতামহ, বাশিষ্ঠ, রোমক, পৌলিশ ও সৌরসিদ্ধান্ত এই পঞ্চসিদ্ধান্তের মধ্যে সৌরসিদ্ধান্তই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক। ইহা হইতেও বুঝা যাইতে পারে যে সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মতানুযায়ী গণনাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিকী।

বর্ত্তমান সময়ে নাবিক-পঞ্জিকার সহিত যে অনৈক্যের কথা উঠিয়াছে—তাহা বোধ হয় দণ্ড পল পরিমাপক সূক্ষ্মযন্ত্রের আবিষ্কারের কাল বা অনুপল বিপলাদি সম্যক্ না লইবার কাল। ঐ অনুপল বিপলাদি লইয়া বা সূক্ষ্মযন্ত্রের সাহায্যে গণনা করিয়া শাস্ত্রীয় মতের সহিত অনৈক্য উপলব্ধি হইলেও রোমক-জাতীয় সিদ্ধান্তপন্থী নাবিক-পঞ্জিকার মত গ্রহণ করা বিধেয় নহে, ইহা "ব্রহ্মগুপ্তের" বচনদ্বারা বুঝিতে পারা যায়। যথা—

"যুগমন্বন্তরকল্পাঃ কালপরিচ্ছেদকাঃ স্মৃতাবুক্তাঃ,
যস্মান্ন রোমকে তে স্মৃতিবাহ্যো রোমকস্তস্মাৎ"।

অর্থাৎ যুগ, মন্বন্তর, কল্প, কালাদির পরিচ্ছেদক না থাকায় ঐ দৃগৈক্য রোমক-জাতীয় সিদ্ধান্ত অন্যাংশে নির্ভুল বোধ হইলেও ধর্ম্মশাস্ত্র বহির্ভূত বলিয়া উহা পরিত্যাজ্য। ইহা হইতে বুঝা যায় যে যুগমন্বন্তরকল্পাদিবিরহিত নাবিক-পাঞ্জিকারও স্মৃতি বাহ্যতাদোষ সমানভাবেই রহিয়াছে। উহার কিয়দংশের সহিত শাস্ত্রীয় কিয়দংশের সংমিশ্রণও অভ্রান্ত সত্যরূপে গ্রহণ করিবার প্রমাণ নাই। এবং সত্যযুগের শেষভাগের সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইতে কলিযুগের রাঘবানন্দ পর্য্যন্ত সমস্ত জ্যোতিঃস্মৃতিশাস্ত্র-নিবন্ধকারগণ ঐকমত্যে "বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়"রূপ নিয়ম দ্বারা পারিভাষিক স্থূল তিথিকে ধর্ম্মকর্ম্মে গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতে বলিয়াছেন। এইরূপ ক্ষেত্রে বাণবৃদ্ধিরসক্ষয় স্থলে সপ্তবৃদ্ধি দশক্ষয়রূপ দৃক্‌সিদ্ধমতে ধর্ম্মকর্ম্ম অর্থাৎ বিবাহাদি সংস্কার ও পূজাব্রত শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম প্রায় সর্ব্বত্র বিলুপ্তপ্রায় হইবার সম্ভাবনা। কারণ ভারতবর্ষের সর্ব্বদেশেই প্রায় কোন না কোন স্মৃতিনিবন্ধকারের নিবন্ধ দর্শন করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মাদি করা হইয়া থাকে। অথচ ঐ সমস্ত গ্রন্থকারের অভিমত তিথিমান অগ্রাহ্য করিয়া অভিনবোদ্ভাবিত তিথিমান অনুসারে কার্য্য করিলে স্মৃতিসংগ্রহকারগণের কাহারও মতের অনুবর্ত্তন করা হইবে না। সপ্তবৃদ্ধি দশক্ষয়বাদিগণ কোনও স্মৃতিশাস্ত্র, বা জ্যোতিষ শাস্ত্র বা স্মৃতি-জ্যোতিষ সংগ্রহ হইতে "সপ্তবৃদ্ধিদশক্ষয়াদি" দেখাইতে পারেন নাই বা পারিবেন বলিয়াও বোধ হয় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিষ্ণুচরণ তর্করত্ন।

৺দুর্গাপূজাদি ব্যবস্থা।

৪ঠা কার্ত্তিক রবিবার সায়ংকালে দেবীর বোধন আমন্ত্রণ ও অধিবাস। ৫ই কার্ত্তিক সোমবার দিবা দং ৩।৪৯।৪৫ ঘ৭।৩৫।১১ সেঃ মধ্যে ষষ্ঠ্যাদিকল্পারম্ভ। এবং ঐ ৫ই কার্ত্তিক সোমবার দিবা দং ৯২৯।০ ঘং ৯।৫০।৫৩ পূর্ব্বাহ্ণ, কিন্তু সপ্তমী অনুরোধে এবং চরলগ্নাদি অনুরোধে দং ৩।৩৯।৪৫ ঘঃ ৭।৩৫।১১ গতে দং ৫।১৮।২৮ ঘ ৮।১০।১৯ মধ্যে চরলগ্নে ও পরে চরনবাংশে অথবা ঘং ৮।৪০।২৯ গতে ৮।৫৫।৩৪ সেঃ মধ্যে চরাংশে অথবা ঘং ৯।২৫।৪৩ গতে ৯।৪০।৪৯ সেঃ মধ্যে চরাংশে—সপ্তম্যাদি কল্পারম্ভ, নবপত্রিকাপ্রবেশ, স্থাপন ও সপ্তমী বিহিতপূজারম্ভ।

যাঁহারা পূজাদিকার্য্যেও কালবেলাদি মানিয়া চলেন, তাঁহাদের পক্ষে ঘং ৭।২৮।৩৮ সেঃ মধ্যে ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ। পরে ঘং ৮।৫৩।৫৯ সেঃ গতে উক্ত চরনবাংশ মধ্যে পূর্ব্বাহ্ণে অর্থাৎ ঘং ৯।২৫।৪৪ সেঃ গতে ঘং ৯।৪৩।৪৯ সেঃ মধ্যে নবপত্রিকাপ্রবেশাদি হইবে।

৬ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার দিবা দং ৯।২৭।৫১ ঘং ৯।৫০।৫৬ পূর্ব্বাহ্ণমধ্যে মহাষ্টমীবিহিতপূজা, মহাষ্টমীর উপবাস, ও বীরাষ্টমীব্রত।

রাত্রি দং ১৪।৪৮।৫৬ রা ঘং ১১।২০।৩১ সেঃ গতে রাত্রি দং ১৬।৪৮।৫৬ রা ঘং ১২।৮।৪৮ মধ্যে কুলাচারমতে অর্দ্ধরাত্রিবিহিতপূজা।

দং ৫৩।৫১।৩২ রা ঘ ৩।৩৬।২৫ সেঃ গতে সন্ধিপূজারম্ভ।

দং ৫৪।৫১।৩২ রা ঘং ৪।০।২৫ সেঃ গতে বলিদান।

দং ৫৫।৫১।৩২ রা ঘং ৪।২৪।২৫ সেঃ মধ্যে সন্ধিপূজা সমাপ্য।

৭ই কার্ত্তিক বুধবার দিবা দং ৯।২।৪২ ঘং ৯।৫১।৩ পূর্ব্বাহ্ণমধ্যে মহানবমীবিহিতপূজা। মন্বন্তরা স্নানদান।

৮ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার দং ৯।২৫।৩৩ ঘং ৯।৫১।৮ মধ্যে পূর্ব্বাহ্ণ, কিন্তু চরলগ্নানুরোধে ও চরনবাংশানুরোধে দিবা দং ৪।৪৩।৫২ ঘং ৭।৫৮।২৮ সেঃ মধ্যে অথবা চরনবাংশে ঘং ৮।২৮।৩৮ গতে ৮।৪৩।৪৩ সেঃ মধ্যে, ঘং ৯।১৩।৫২ সেঃ গতে ৯।২৮।৫৭ সেঃ মধ্যে দশমীবিহিতপূজা সমাপন ও দেবীর বিসর্জ্জন।

১২ই কার্ত্তিক কোজাগরী পূর্ণিমা, প্রদোষে লক্ষ্মীপূজা, রাত্রিতে নারীকেল জলপান এবং অক্ষক্রীড়াদ্বারা রাত্রি জাগরণ।

২৭শে কার্ত্তিক ভূতচতুর্দ্দশী—দিবাতে চতুর্দ্দশ শাক ব্যবহার, ও সন্ধ্যাকালে দেবগৃহাদিতে চতুর্দ্দশ দীপদান, মস্তকোপরি অপামার্গ পল্লব মন্ত্রপাঠ করিয়া ভ্রামণ করিতে হয়।

২৮শে কার্ত্তিক বুধবার অপরাহ্ণে পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ, প্রদোষে উল্কাদান ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা এবং রাত্রিতে শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা। ব্রাহ্মণসভা চতুষ্পাঠীর ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীদুর্গাসুন্দর স্মৃতিরত্ন।:

সংবাদ।

আউনাড়া—শাখাসভা।

(১) আউনাড়া, (২) কাল্লুটিয়া, (৩) ধোয়াইল, (৪) দীঘা, (৫) কুমকল, (৬) দাচিয়াদহ, (৭) ধুলজুরী।

সভাপতি—৺ব্রহ্মণ্যদেব।

সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মৌলিক।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়।

সহকারী কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ রায়।

হিসাব পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়।

ধর্ম্ম ব্যবস্থাপক—শ্রীযুক্ত আশুতোষ স্মৃতিরত্ন।

মহম্মদপুর—শাখাসভা।

১। মহম্মদপুর, ২। ধুপড়িয়া, ৩। জুগনাইল, ৪। বাইজানি, ৫। রায়পাশা, ৬। নৈহাটী, ৭। কোটাবারী, ৮। নারায়ণপুর, ৯। গোকুলনগর, ১০। গোপালপুর।

সভাপতি—৺ব্রহ্মণ্যদেব। সভাস্থান—৺লক্ষ্মীনারায়ণের বাটী।

সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত দীননাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত মহাদেব চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ পাঠক, শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঠাকুরতা, শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন ভট্টাচার্য্য।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সহকারী কর্ম্মাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ঠাকুরতা।

হিসাব পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহকারী হিসাব পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত হিরণ্যকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ধর্ম্মব্যবস্থাপক—শ্রীযুক্ত দীননাথ বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ,

রামেরচর কুবিরদীয়া শাখাসভা—

১। কুবিরদীয়া, ২। রামেরচর, ৩। কান্দী, ৪। পুড়োপাড়া, ৫। পশ্চীম-আলগী, ৬। পূর্ব্ব আলগী, ৭। কাইচেল, ৮। চাঁদড়া, ৯। মুন সুরাবাদ, ১০। মাণিকাদি, ১১। ঈশ্বরদী, ১২। মধ্য জগদীয়া, ১৩। গাং জগদীয়া, ১৪। খাশ জগদীয়া।

সহঃ সভাপতি—

শ্রীযুক্ত কৃপানাথ সমাদ্দার, শ্রীযুক্ত তারিণীনাথ সমাদ্দার, শ্রীযুক্ত মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রসিকলাল মুখোপাধ্যায়,

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সমাদ্দার।

সহকারি সম্পাদক—শ্রীযুক্ত গুরুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার সমাদ্দার, শ্রীযুক্ত লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্ত্তী।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত শশধর সমাদ্দার।

সহকারি সম্পাদক—শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রসিকলাল ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সমাদ্দার, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

হিসাব পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত বনমালী চট্টোপাধ্যায়।

সহঃ—শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধর্ম্ম ব্যবস্থাপক শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত রসিকলাল স্মৃতিভূষণ, শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী।

প্রাপ্তপত্র।

সম্মাননীয়—

শ্রীযুক্ত 'ব্রাহ্মণ-সমাজ' পত্র সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু—

মহাত্মন্!

জ্যৈষ্ঠসংখ্যক 'ব্রাহ্মণ-সমাজ'পত্রে "স্বাধীন-ত্রিপুরা ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সভা" সংস্থাপনের সংবাদ ও কার্য্যবিবরণী এবং সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করিলাম। তদুপলক্ষে কয়েকটি প্রশ্ন মনোমধ্যে সমুদিত হইল, তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

১। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সভার সভাপতি ক্ষত্রিয়কুলাবতংস শ্রীশ্রীমন্মহারাজ বাহাদুর এবং সহকারিসভাপতি তদ্বংশীয় জনৈক মহারাজকুমার হওয়াতে ব্রাহ্মণ্যের মর্য্যাদা কতদূর সংরক্ষিত রহিয়াছে?

২। স্বাধীন-ত্রিপুরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সভার সদস্যবর্গের মধ্যে ১।২ জন ব্যতীত সকলেই 'স্বাধীন ত্রিপুরার বহির্ভাগস্থ স্থাননিবাসী। কয়েকজন রাজ-সরকারে কাজ করেন বলিয়া আগরতলায় আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও অন্য স্থানের লোক। এই অবস্থায় ঐ স্থানে হঠাৎ এক 'ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সভার' উদ্ভব কেন হইল?

৩। ত্রিপুরা ও ঢাকা জেলার পণ্ডিত দুইচারি জনের নাম দেখিলাম। কিন্তু ত্রিপুরার অব্যবহিত পার্শ্ববর্ত্তী মৈমনসিংহ বা শ্রীহট্ট বা নোয়াখালী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ বহুল স্থানের কাহারও নাম দেখা গেল না। বিশেষতঃ শ্রীশ্রীযুতের রাজ্য কৈলাসহর ও ধর্ম্মনগর এই দুই বিভাগে শ্রীহট্টের বহু ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন। ইঁহাদের উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক ঢাকার দুএকজন লোকের আনয়নের উদ্দেশ্য কি?

আপাততঃ এই তিনটি প্রশ্ন করা গেল—সদুত্তর পাইলে আরও এবিষয়ে আলোচনা করার বাসনা রহিল।

শ্রীশ্রীযুত ত্রিপুরেশ্বর বাহাদুর স্বয়ং ব্রাহ্মণ-ভক্ত ও স্বধর্ম্মানুরক্ত। তিনি নিজে অসুস্থতা ব্যপদেশে সভায় উপস্থিত না হইয়া বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিয়াছেন। অভিভাষণে তিনি যথেষ্ট বিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা অতিশয় শোভনও হইয়াছে। তিনি সভার "অভিভাবক" বা "পৃষ্ঠপোষক" এইরূপ পদ গ্রহণ করিলেই সাধু হইত। 'মন্ত্রিগুণে রাজা'—এ বিষয়ও মন্ত্রণা-দায়কদিগকেই আমরা দায়ী করিব। অপর দৃষ্টান্ত দেখুন। শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুর বর্ণাশ্রমের পরিপোষক। অথচ দেখা যায় তদীয় রাজ্যের বহির্ভূত স্থলবিশেষেও ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপনে তাঁহার রাজকোষ হইতে অর্থ প্রদত্ত হইতেছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম লোপ করিবার জন্যই যে ব্রাহ্ম-সমাজ উদ্ভূত হইয়াছে, অবশ্যই শ্রীশ্রীযুত তাহা অবগত আছেন। তথাপি মন্ত্রিবর্গের প্ররোচনায় এবম্বিধ অর্থ সাহায্য!

শ্রীসমাজসেবক দেবশর্ম্মা।

ব্রাহ্মণ-সভার প্রচারক মাননীয় শ্রীযুত তরঙ্গবিহারি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় ফরিদপুর জেলার পল্লীসমূহে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার যেসকল শাখা-সভা স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার মধ্যে বর্ত্তমান সংখ্যায় কয়েকটী তালিকা প্রকাশ করা হইল, অবশিষ্ট ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে, ব্রাহ্মণ-সভার প্রচারক মহোদয়গণ যেরূপ উদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং প্রত্যেক পল্লীর সামাজিকগণের যেরূপ উৎসাহের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে ভরসা হয় অল্পকাল-মধ্যেই বঙ্গীয় সমগ্র ব্রাহ্মণ-সমাজ শাখা-সভা স্থাপনদ্বারা একসূত্রে গ্রথিত হইয়া সদাচারসংরক্ষণে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিবেন।

ব্রাহ্মণ-সমাজের নিয়মাবলী।

১। বর্ষগণনা—১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্বিন হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত বৎসর পরিগণিত হইয়া থাকে। ১৩২৪ সালের বর্ত্তমান আশ্বিন হইতে ইহার ষষ্ঠ বর্ষ চলিতেছে।

২। মূল্য—ব্রাহ্মণ-সমাজের বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র দুই টাকা। ভিঃ পিঃ ডাকে লইতে হইলে দুই টাকা দুই আনা লাগিবে। স্বতন্ত্র ডাকমাশুল লাগিবে না। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। ব্রাহ্মণ-সমাজের মূল্য অগ্রিম দেয়। বৎসরের কোন ভগ্নাংশের জন্য গ্রাহক গৃহীত হয় না। বৎসরের যে মাসেই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আশ্বিন হইতেই তাঁহার বার্ষিক চাঁদার হিসাব চলিবে।

৩। পত্রপ্রাপ্তি—ব্রাহ্মণ-সমাজ বাঙ্গলা মাসের শেষ তারিখে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কোনও গ্রাহক পর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে ব্রাহ্মণ-সমাজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া সেই মাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। না জানাইলে পরে তাঁহাদের ক্ষতি পূরণ করা কঠিন হইবে।

৪। ঠিকানা পরিবর্ত্তন—গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া—তাঁহাদের নাম ধাম পোষ্ট-অফিস ইত্যাদি যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কিম্বা অন্য প্রয়োজনে চিঠিপত্র লিখিলে অনুগ্রহ করিয়া সর্ব্বদা নিজের গ্রাহক নম্বরটী লিখিয়া দিবেন।

৫। চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি—"ব্রাহ্মণ-সমাজে" কোনও প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইলে লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। আর সর্ব্বদাই কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। ব্রাহ্মণ-সমাজ-সম্পাদক প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইবার ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম। চিঠিপত্র বা প্রবন্ধ এসমস্তই সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদকের নামে ৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। টাকাকড়ি—৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ব্রাহ্মণসভার কার্য্যালয়ে ব্রাহ্মণসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

বিদেশীয় গ্রাহকগণকেও টাকার রসিদ দেওয়া হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ২য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনের হার মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ৩য় পৃষ্ঠা ও পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠার সম্মুখস্থ পৃষ্ঠা ৪৲ চারি টাকা হিসাবে লওয়া হয়। অন্য পেজ ৩৲ তিন টাকা—বার্ষিক স্বতন্ত্র।

২। তিন মাসের কম সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। তিন মাসের মধ্যে বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তিত হয় না।

৩। বিজ্ঞাপনের মূল্যের অর্দ্ধেক টাকা অগ্রিম জমা না দিলে ছাপা হয় না।

৪। দীর্ঘকালের নিমিত্ত বিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইলে কার্য্যালয়ে জানিতে পারা যায়।

ব্রাহ্মণসমাজ সম্পাদক
৬২ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা—৭২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ নবদ্বীপ সমাজ সম্মিলিত—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা হইতে ব্রাহ্মণসমাজ কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১২ নং সিমলাষ্ট্রীট্, জ্যোতিষ-প্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা মুদ্রিত।

, REGISTERED No. C—675.

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

(মাসিক পত্র)

A Non—Political Hindu Religious & Social Magazine.

ষষ্ঠ বর্ষ—পঞ্চম সংখ্যা।

মাঘ।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ দুই টাকা।

প্রতি খণ্ড ।০ আনা।

সন ১৩২৪ সাল।

মাঘ সংখ্যার লেখকগণ।

শ্রীযুক্ত কালীচরণ কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ।

শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র সান্যাল।

শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন কাব্যপুরাণতীর্থ।

শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ।

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সান্যাল চৌধুরী।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদকদ্বয়—

শ্রীযুক্ত [illegible] তর্কনিধি।

কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

	বিষয়		নাম	পৃষ্ঠা
১।	অভিনন্দন (পদ্য)	..	শ্রীযুক্ত কালীচরণ কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ	১৬৭
২।	পঞ্চ মকার	...	শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র সান্যাল।	১৬৯
৩।	রামায়ণ	...	শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮০
৪।	দুর্ব্বুদ্ধি	...	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন কাব্যপুরাণতীর্থ	১৮৪
৫।	ভক্তিতত্ত্ব	...	শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ	১৯০
৬।	পঞ্জিকা-সংস্কার	...	শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সান্যাল চৌধুরী	১৯৫
৭।	কৌলীন্য ও কন্যাদায়	..	শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	১৯৮
৮।	পরীক্ষার ফল	...		২০৬
৯।	সংবাদ	..		২১০

REGISTERED No. C—675.

ষষ্ঠ বর্ষ। { ১৮৩৯ শক, ১৩২৪ সাল, মাঘ। } পঞ্চম সংখ্যা।

ওঁ

"নমো ব্রহ্মণ্য দেবায়"

অভিনন্দন।

(১)

শীতল শিশিরস্নাত প্রকৃতিসুন্দরী,
তুষার-বসনজাল পরিধান করি,
মানসমোহন সাজে
বিরাজয়ে ধরামাঝে,
নেহারি নীহারকণা মুকুতার হার
গলায় পরিয়া সুখে করয়ে বিহার।

(২)

স্বাগত ব্রহ্মণ্যদেব! জ্ঞানগরীয়ান্,
জগতের জ্ঞানগুরু আদর্শ মহান্,
সাধিতে বিশ্বের হিত,
জগতের পুরোহিত,
ব্রাহ্মণ্য-মহিম-জ্যোতিঃ অঙ্গে সদা জ্বলে,
প্রণত নিখিল বিশ্ব যাঁর পদতলে॥

(৩)

অজ্ঞান—তমসাবৃত এই ধরাতলে
আজিও ব্রাহ্মণ-হৃদে মিটি মিটি জ্বলে
বিমল জ্ঞানের বাতি,
পরকাশ দিবারাতি,
জ্ঞানের আলোকমালা বিতরিতে মন,
বিপ্ররূপে অবতীর্ণ দেব নারায়ণ।

(৪)

পরহিত জগতের মঙ্গলবিধান,
জীবনের মহাব্রত ক্ষমার নিধান।
ব্রহ্মতেজো গরিমায়
উজ্জ্বল পবিত্র কায়,
ত্যাগের মূরতি যেন স্বভাবসুন্দর,
ভূলোক-দেবতা ব'লে খ্যাত চরাচর॥

(৫)

পবিত্র লগনে অই মানসগগনে,
আশার আলোক যেন ফুটিতেছে ক্রমে।
তরুণ অরুণ রেখা
ক্রমেই যেতেছে দেখা,
মনে হয় পুনঃ বুঝি সে দিন আসিবে,
ব্রহ্মতেজঃ অজ্ঞানতা-তিমির নাশিবে॥

(৬)

সুদীর্ঘ মোহের নিশা কাটিয়াছে প্রায়,
তমসা টুটিয়া আলো ফুটেছে ধরায়,
ব্রাহ্মণ্য জ্যোতিরময়,
এই বিশ্ব সমুদয়,
উষার রক্তিম ছটা পূরব গগনে
ভাতিয়া উঠিল অই মাহেন্দ্র লগনে॥

(৭)

অনাবিল ধর্ম্মজ্ঞান বিলাবার তরে
নিতি নিতি উপদেশ মোদের অন্তরে
ভূদেব ব্রাহ্মণগণ
করুন সরব ক্ষণ,
পূরব গরবে স্ফীত হউন ত্বরায়,
ব্রাহ্মণ ভূদেব ব'লে পূজিত ধরায়।

(৮)

অজ্ঞান-আঁধারে পড়ি সংসার-আধারে,
অমানিশা সম যেন হেরি চারি ধারে!
জ্ঞানের আলোকে লোক,
পুলকে মগন হোক্,
কোকিল-কাকলী-সম সামের ঝঙ্কারে,
মুখরিত হোক্ বিশ্ব পবিত্র ওঙ্কারে।

(৯)

বিধাতৃ-ইঙ্গিতে অই সুর বালাগণ
স্বরগে মঙ্গল-ঘট করিয়া স্থাপন,
সাজায়ে পূজার ডালা,
গাঁথিয়ে ফুলের মালা,
উলুধ্বনি করে সবে মঙ্গল কারণ,
ব্রাহ্মণ উপরে করে আশিষ্ বর্ষণ।

(১০)

স্বরগসুষমা-দীপ্ত পূত কলেবর,
পূর্ণব্রহ্ম অংশরূপী মরত ভিতর।
সত্য-শম-দম-জপ,
ক্ষমা-সদাচার-তপ,
শাস্ত্র জ্ঞান, তত্ত্ব জ্ঞান, সরলতা আর,
ব্রাহ্মণ-সুলভ সর্ব্ব গুণের আধার॥

(১১)

দেবতার হিতকল্পে নিজ অস্থিদান,
মধুর জীমূতমন্দ্রে ভাগবত গান!
শ্রীহরি আপন বক্ষে
চরণ কমল রক্ষে,
বালক-উদরে যাঁর কথায় মুষল,
নমি সেই ব্রাহ্মণের চরণকমল॥

(১২]

জনমি ব্রাহ্মণকুলে অতি অভাজন,
দীন হীন জন আমি না জানি পূজন।
এ ব্রাহ্মণ—পরিষদে,
নিবেদিনু সভাসদে,
এ অভিনন্দন দিয়া করি যোড়হাত,
স্বাগত ব্রাহ্মণপদে করি প্রাণপাত॥

শ্রীকালীচরণ কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ।

শ্রীহট্ট ব্রাহ্মণপরিষদের ৫ম বার্ষিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তক পঠিত।

পঞ্চমকার।

সত্যযুগে বৈদিক ধর্ম্ম, ত্রেতায় স্মৃতি এবং দ্বাপরে পুরাণোক্ত ধর্ম্ম প্রশস্ত ছিল। কলিযুগে তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মই লোক উদ্ধারের একমাত্র উপায়।

কৃতে শ্রুত্যুদিতো ধর্ম্ম স্ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্মতঃ॥
নান্যঃ পন্থা মুক্তিহেতু রিহামুত্র সুখাপ্তয়ে।
যথা তন্ত্রোদিতো মার্গো মোক্ষায় চ সুখায় চ॥

যাঁহারা সদাশিবের এই বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া কলিতে বৈদিকাদি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা হেতু ভগবদ্ভক্তি বিশ্বাস শিথিল হইয়া নিরীশ্বরভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তর্কে লোক ভুলান যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সত্যের অপলাপজনিত কুফল নিবারিত হয় না। সদাশিব বলিয়াছেন—

কলি-কল্মষদীনানাং দ্বিজাদীনাং সুরেশ্বরি!
মেধ্যামেধ্যাবিচারাণাং ন শুদ্ধিঃ শ্রৌতকর্ম্মণা।
ন সংহিতাদ্যৈঃ স্মৃতিভি রিষ্টসিদ্ধি র্নৃণাং ভবেৎ॥
নির্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব॥
পাঞ্চালিকা যথা ভিত্তৌ সর্ব্বেন্দ্রিয়সমন্বিতাঃ।
অমুরশক্তাঃ কার্য্যেষু তথান্যে মন্ত্ররাশয়ঃ॥

কলিযুগে ব্রাহ্মণাদি সমস্ত বর্ণই মেধ্যামেধ্যবিচারশূন্য, সুতরাং পাপভারে মলিন হওয়ায় শ্রুতি, স্মৃতি বা পুরাণসম্মত বিধানানুষ্ঠানে তাহারা বিশুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না, সেই সকল অনুষ্ঠান দ্বারা তাহাদিগের অভীষ্টও সিদ্ধ হইবে না। সত্যাদি যুগত্রয়ে লোক সকল অপেক্ষাকৃত ধার্ম্মিক ছিল, তজ্জন্য শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান ফলপ্রদ ছিল, কলিতে পাপের অতিবৃদ্ধিহেতু সেই সকল কর্ম্ম মৃতবৎ নিষ্ফল, সুতরাং অভীষ্ট ফলদানে অক্ষম।

'কার্য্যেষু অশক্তাঃ' অর্থাৎ অভীষ্ট ফলদানে অক্ষম বলিবার তাৎপর্য্য এই যে অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র নির্জীব নহে, তাহা তর্কাতীত। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংসা মনুষ্যের তর্কাধীন নহে, উহার ফল প্রত্যক্ষ। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র স্বয়ং ভগবানের উক্তি। পূর্ণজ্ঞানময়ী ভগবদুক্তির বিচার অসম্যক্ জ্ঞানী মনুষ্যের অধিকারভুক্ত নহে; তাহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ জন্য সংশয়াতীত। হিন্দুশাস্ত্রে যে কর্ম্মের যে ফল নির্দ্দেশ করা আছে, তদনুষ্ঠানে সে ফল নিশ্চয়ই লাভ হইবে। যে অনুষ্ঠানে অভীষ্ট ফললাভ হয় না, নিশ্চয় জানিবে সে অনুষ্ঠান যথাশাস্ত্র সম্পাদিত

হয় নাই। পারত্রিক ফল পরোক্ষ হইলেও ঐহিক ফল প্রত্যক্ষ, সুতরাং শাস্ত্রীয় বিধান-সমূহের সত্যতায় সংশয়শূন্য হইবার তাহাই প্রশস্ত উপায়। সত্যযুগে বৈদিক ক্রিয়া দ্বারা, ত্রেতায় স্মার্ত্তকর্ম্মে এবং দ্বাপরে পৌরাণিক অনুষ্ঠান দ্বারা লোকের অভীষ্ট সিদ্ধ হইত। সত্যাদি যুগে তত্তদাদিষ্ট শাস্ত্রীয় বিধানসমূহ সজীব ও অভীষ্ট ফলদানে সক্ষম ছিল। কলিতে সেই সকল ক্রিয়া দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না, কারণ এখন সেই সকল বিধান মৃতকল্প। তর্কদ্বারা সেই মৃতকল্প মন্ত্রসমূহের জাগরণ অসম্ভব।

কলিযুগে পাপমলিন লোকের পক্ষে তন্ত্রোক্ত বিধানই অভীষ্ট ফলবিধায়ক, তজ্জন্য কলিজাত মনুষ্যের পক্ষে একমাত্র আগমোক্ত মার্গই অনুসরণীয়। তন্ত্রোক্ত মার্গাবলম্বন ব্যতীত কলিযুগের মনুষ্যের পক্ষে গত্যন্তর নাই।

সদাশিব বলিয়াছেন—

> কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণফলপ্রদাঃ।
> শস্তাঃ কর্ম্মসু সর্ব্বেষু জপযজ্ঞক্রিয়াদিষু॥
> সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
> বিনা হ্যাগমমার্গেণ * কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে॥

কলিতে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রসমূহ সিদ্ধ ও আশু ফলপ্রদ, এ নিমিত্ত জপযজ্ঞ ক্রিয়াদি সকল কর্ম্মেই তন্ত্রোক্ত মন্ত্রই প্রশস্ত। কলিতে আগমোক্ত পন্থা ব্যতীত অন্য গতি নাই।

সদাশিব বলিয়াছেন—

> "কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণফলপ্রদাঃ"

কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই আমরা এই বাক্যের সার্থকতা অনুভব করিতে পারি না। তাহার কারণ এই যে আমরা যে সকল তান্ত্রিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করি, তাহা শাস্ত্রীয় বিধানমতে হয় না। কলিতে বৈদিক, স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক ক্রিয়াসমূহ কোনক্রমেই ফলপ্রদ হইতে পারে না। তান্ত্রিক ক্রিয়া ফলপ্রদ হইতে পারিত, কিন্তু আমরা উহা যথাশাস্ত্র সম্পাদন করি না, তজ্জন্য উহা দ্বারা অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারি না। পাশ্চাত্য জ্ঞান আমাদিগের মন কলুষিত করিবার পূর্ব্বে যখন ভগবদ্ভক্তি—বিশ্বাস এতদপেক্ষা প্রবল ছিল, তখন তান্ত্রিক ক্রিয়ার ফল কতক পরিমাণে প্রত্যক্ষীভূত হইত। এখন ভক্তিবিশ্বাসবর্জ্জিত কপটভাব লোকের অন্তঃকরণ দোষাশ্রিত করায় আশানুরূপ ফল দেখিতে পাওয়া যায় না। রীতিমত মন্ত্রোদ্ধার, মন্ত্রজাগরণাদি করিতে পারিলে এখনও তান্ত্রিক ক্রিয়াগুলি ফলপ্রদ হইতে পারে।

তান্ত্রিক সাধনাসমূহ পঞ্চমকারাত্মক। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পাঁচটিকে

---

* হরপার্ব্বতীর কথোপকথন তন্ত্র নামে কথিত। শিব যাহা বলিয়াছেন তাহার নাম আগম এবং পার্ব্বতীর বাক্য নিগম। কখন বা তন্ত্র আগম নিগম একার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

পঞ্চমকার বলে। পঞ্চমকার তান্ত্রিক সাধনার অপরিহার্য্য উপাদান ; এ নিমিত্ত উহা পঞ্চতত্ত্ব নামে পরিগণিত। সদাশিব বলিয়াছেন—

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
পঞ্চতত্ত্বং বিনা দেবি নার্চ্চয়েদ্ জগদম্বিকাম্॥

তান্ত্রিক বিধানমতে ভগবদারাধনা পঞ্চমকার ব্যতীত হইতে পারে না। এস্থলে জগদম্বা ব্রহ্মবোধক শব্দ। ঈশ্বর স্ত্রীপুরুষ উভয়াত্মক। স্ত্রীপুরুষ উভয়ের সম্মিলন ব্যতীত জীবোৎপত্তি হয় না। ঈশ্বর জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা, সুতরাং তিনি স্ত্রীপুরুষ উভয়াত্মক। কেহ তাঁহাকে পিতা, কেহ মাতা, কেহ স্বামী, কেহ সখা, কেহ বন্ধু, কেহ পত্নী, কেহ কন্যা, কেহ বা পুত্র বলিয়া পূজা করে। অন্তর্য্যামী ভগবান সকলেরই পূজা তুল্যরূপে গ্রহণ করেন। সদাশিবও বলিয়াছেন—

যথা ব্রহ্মোপদেশেন বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ।
গচ্ছতি ব্রহ্মসাযুজ্যং তথৈব তব সাধনাৎ॥

ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইলে যেমন সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হইয়া মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, শক্তিসাধনার ফলও সেইরূপ ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ। ফলতঃ সদাশিব জগদম্বিকার স্বরূপ যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে পরব্রহ্মের প্রতিকৃতি ভিন্ন অন্য ধারণা আসিতে পারে না। সদাশিব বলিয়াছেন—

ত্বং পরাপ্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে॥
মহদাদ্যণুপর্য্যন্তং যদেতৎ স চরাচরং।
ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ॥
ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি॥
উপাসকানাং কার্য্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধাস্তনূঃ॥
ত্বং সর্ব্বরূপিণী দেবী সর্ব্বেষাং জননী পরা।
তুষ্টায়াং ত্বয়ি দেবেশি সর্ব্বেষাং তোষণং ভবেৎ॥
সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসী স্তমোরূপমগোচরম্।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং পরব্রহ্ম সিসৃক্ষয়া॥
সদ্রূপং সর্ব্বতোব্যাপী সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
সদৈকরূপং চিন্মাত্রং নির্লিপ্তং সর্ব্ববস্তুষু॥
ন করোতি ন চাশ্নাতি ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি।
সত্যং জ্ঞানমনাদ্যন্ত মবাঙ্মনসগোচরং॥

যিনি এইরূপ, তিনি ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহেন। সুতরাং ব্রহ্মোপাসনা ও জগদম্বার আরাধনা উভয়ই এক ; এবং ফলও উভয় প্রকার আরাধনারই ব্রহ্মসাযুজ্য।

এখন আমাদিগের দেখা উচিত যে ঈদৃশ ব্রহ্মোপাসনায় মদ্যাদি পঞ্চমকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে কেন? পঞ্চমকার তৃষ্ণাবর্দ্ধক ও কামোদ্দীপক, সুতরাং ভগবদারাধনার বিরোধী। ভোগোপভোগে ভোগপিপাসা প্রশমিত না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥

তৃষ্ণা প্রশমিত না হইলেও ভগবৎ ধ্যানপরায়ণ হওয়া যায় না। এ অবস্থায় ভগবদারাধনার্থে পঞ্চমকারের ব্যবস্থা কেন? পার্ব্বতী ও এই নিমিত্ত সদাশিবকে বলিয়াছিলেন—

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্য,—মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
এতানি পঞ্চতত্ত্বানি ত্বয়া প্রোক্তানি শঙ্কর ॥
কলিজা মানবা লুব্ধাঃ শিশ্নোদরপরায়ণাঃ।
লোভাৎ তত্র পতিষ্যন্তি ন করিষ্যন্তি সাধনম্ ॥
ইন্দ্রিয়াণাং সুখার্থায় পীত্বা চ বহুলং মধু।
ভবিষ্যন্তি মদোন্মত্তা হিতাহিতবিবর্জ্জিতাঃ ॥
যুগধর্ম্মপ্রভাবেন স্বভাবেন কলৌ নরাঃ।
ভবিষ্যন্ত্যতিদুর্ব্বৃত্তাঃ সর্ব্বথা পাপকারিণঃ ॥
হিতায় যানি কর্ম্মাণি কথিতানি ত্বয়া প্রভো।
মন্যে তানি মহাদেব বিপরীতানি মানবে।
তেষামুপায়ং দীনেশ কৃপয়া কথয় প্রভো ॥

যুগ ধর্ম্ম প্রভাবে কলিতে মনুষ্যগণ স্বভাবতঃই শিশ্নোদরপরায়ণ ও দুর্ব্বৃত্ত হইবে, সুতরাং মদ্যাদির ব্যবস্থা তাহাদিগের পক্ষে উপকারজনক না হইয়া অপকারসাধক হওয়াই আশঙ্কনীয়, এ অবস্থায় তাহাদিগের উদ্ধারের উপায় দয়া করিয়া বলুন।

তাহাতে সদাশিব বলিলেন—

যেনৈব বিষখণ্ডেন ম্রিয়ন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তেনৈব বিষখণ্ডেন ভিষক্ শময়তে রুজম্ ॥

কলি দুরারোগ্য ব্যাধি। বেদ, স্মৃতি, পুরাণোক্ত ধর্ম্ম এ ব্যাধি প্রশমনে সক্ষম নহে। "বিষস্য বিষমৌষধম্" স্বরূপে এক মাত্র তন্ত্রোক্ত বিধানই এ ব্যাধি নিবারণের উপায়। তজ্জন্যই দুরপনেয় পাপব্যাধিগ্রস্ত কলিযুগের মনুষ্যদিগকে পাপমুক্ত করণার্থে আমি পঞ্চমকার রূপ সুতীক্ষ্ণ হলাহলের ব্যবস্থা করিয়াছি। তান্ত্রিক আরাধনা সুতীক্ষ্ণ খড়্গের উপর দিয়া গতায়াতের ন্যায় বিপজ্জনক। আত্মজয়ী হইয়া অতি সাবধানে এ তীক্ষ্ণ ধারের উপর দিয়া যাইতে হয়, কিছুমাত্র আচার ভ্রষ্ট হইলেই ইহাতে পদে পদে মহান্ অনর্থ আশঙ্কনীয়। তান্ত্রিক উপাসনায়

স্বর্গের পথ ও নরকের পথ পাশাপাশী। যে বিশুদ্ধ চরিত্রবান, সে স্বর্গাভিমুখে পরম সুখে চলিয়া যায়, চরিত্রহীন হইলেই নরকে পড়িয়া পাপানলে দগ্ধ হয়।

সদাশিবের এই মহাবাক্যের ফল আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি। যে সকল অসংযতস্বভাব লোক ধর্ম্মধ্বজী, যাহারা কপটতান্ত্রিক সাজিয়া পঞ্চমকার-সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারা তন্ত্রমতে ভগবদারাধনা করিতে যাইয়া স্বর্গভ্রমে নরকাভিমুখে গমন করে।

পঞ্চমকারের মধ্যে আদি তত্ত্ব মদ্য ও শেষতত্ত্ব মৈথুন বা শক্তিসাধন। এই দুইটিই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও বিপজ্জনক। তন্ত্রে এতদুভয়ের সাধনের যে প্রণালী বিধান করা আছে, তদনুসারে কার্য্য করিলে, জ্বলন্ত অনলপরীক্ষায় বিশোধিত স্বর্ণের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়, কৃত্রিম কেমিক্যাল গোল্ড সে প্রখর অনলতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া মলিন হইয়া যায়।

মদ্য তান্ত্রিকমতে ভগবদারাধনার উপাদান, কিন্তু তাহা

অদেয়মপেয়মগ্রাহ্যম্।

সদাশিব স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

ন দদ্যাৎ ব্রাহ্মণো মদ্যং মহাদেব্যৈ কথঞ্চন।
ক্ষেমকামো ব্রাহ্মণো হি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ।

মহাদেবীর আরাধনায় ব্রাহ্মণ কখনও মদ্য ব্যবহার করিবেনা। কল্যাণকামী ব্রাহ্মণের পক্ষে মদ্য মাংসাদি নিষিদ্ধ।

সুরাং পীত্বা দ্বিজো মোহাৎ অগ্নিবর্ণং সুরাং পিবেৎ।
তয়া স্বকায়নির্দ্দগ্ধে মুচ্যতে কিল্বিষাৎ ততঃ॥

দ্বিজাতি যদি মোহবশতঃ কখনও সুরাপান করে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তাহার যে ঘোর প্রত্যবায় জন্মে, অগ্নিবৎ উত্তপ্ত সুরাপানদ্বারা তাহার আত্মদেহ দগ্ধীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত সে সেই প্রত্যবায় হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না।

সদাশিব আরও বলিতেছেন—

স্বগাত্ররুধিরং দত্বা আত্মহত্যামবাপ্নুয়াৎ।
মদ্যং দত্বা ব্রাহ্মণস্তু ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥

মদ্য দ্বারা মহাদেবীর আরধনায় ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্যের হানি হয়, অতএব আত্মদেহরক্তদ্বারা দেবীর আরাধনা করিয়া আত্মহত্যাও সঙ্গত, তথাপি মদ্যপান বিধেয় নহে।

তান্ত্রিকমতে ভগবদারাধনায় মদ্য অত্যাবশ্যক, অথচ জগদম্বার পূজায় মদ্যদান নিষেধ। শাস্ত্রের এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধোক্তির মীমাংসা শাস্ত্রেই আছে। সদ্‌গুরুর উপদেশ লইয়া কার্য্য করিলে আগমোক্ত মার্গ সুগম হয়, কিন্তু অপরিণামদর্শীর পক্ষে বিপদ পদে পদে।

তান্ত্রিক উপাসনায় যেমন মদ্যাদিদানের ব্যবস্থা আছে, তেমনি আবার তদনুকল্পেরও বিধান আছে। যাঁহারা আত্মজয়ী হন নাই, অনুকল্পই তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ব্যবস্থেয়। অধিকাংশ অনুকল্পে মদ্যাদি পঞ্চমকারের সংস্রব একেবারেই নাই।

যাঁহারা বিষয়াসক্ত গৃহী, তাঁহাদিগের পক্ষে মদ্যের পরিবর্ত্তে মধুত্রয় অর্থাৎ দুগ্ধ, শর্করা ও মধু প্রযোজ্য—

গৃহকার্য্যৈকচিন্তানাং গৃহিনাং প্রবলে কলৌ।
আদ্যতত্ত্ব প্রতিনিধৌ বিধেয়ং মধুরত্রয়ম॥
দুগ্ধং সিতা মাক্ষিকঞ্চ বিজ্ঞেয়ং মধুরত্রয়ম।
অলিরূপমিদং মত্বা দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ॥

মদ্যের যেমন দোষ আছে, তেমনই আবার মদ্যের গুণও আছে। অপরিমিত মদ্যপানে মন চঞ্চল, বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত—স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, এবং পরিমিত মদ্যপানে আয়ুর্বৃদ্ধি, শরীর সুস্থ, বুদ্ধি সতেজ হয়, ও ইষ্টদেবতার ধ্যানের গাঢ়ত্তা জন্মে। কিন্তু পরিমিত মদ্যপান লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য। যাহারা পরিমিতভাবে সুরাপান সংকল্প করিয়া মদ্য সেবনে প্রবৃত্ত হয়, অচিরকাল মধ্যেই তাহারা অপরিমিত মদ্যপায়ী হইয়া পড়ে। জ্ঞানীরও এইরূপ ভাব-বিপর্য্যয় সংঘটন করার জন্য পাঁণ্ডতেরা মদ্যকে অদেয়, অপেয়, অগ্রাহ্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্রে তজ্জন্য সাধকের পক্ষে মদ্যপান নিষেধ করিয়াছেন।

অতিপানাৎ কুলীনানাং সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে।
যাবন্ন চালয়েৎ দৃষ্টিং যাবন্ন চালয়েন্মনঃ।
তাবৎ পানং প্রকুর্ব্বীত পশুপানমতঃ পরম্॥
পানে ভ্রান্তি র্ভবেদ্ যস্য ঘৃণী চ শক্তিসাধকে।
স পাপিষ্ঠঃ কথং ব্রূয়াৎ আদ্যাং কালীং ভজাম্যহম্॥

অতিপান, তান্ত্রিক আরাধনায় সিদ্ধিলাভের বিঘ্নজনক। অতএব যে পর্য্যন্ত দৃষ্টি বিভ্রম ও চিত্তচাঞ্চল্য না জন্মে, ততক্ষণ মদ্যপান করা যাইতে পারে। পানে ভ্রান্তি জন্মিলে আদ্যা কালীর আরাধনার অধিকার নষ্ট হয় ও পাপগ্রস্ত হইতে হয়।

মদ্য ইষ্টদেবতার ধ্যানে সহয়তা করে, এজন্য তান্ত্রিক উপাসনায় মদ্যের ব্যবস্থা। কিন্তু মদ্যের হিতে বিপরীত ঘটাইবার শক্তি অতি প্রবল। এ নিমিত্ত বিষয়নিষ্ঠ গৃহীর পক্ষে মদ্যের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষেধ। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে মদ্যের পরিবর্ত্তে দুগ্ধ, শর্করা ও মধু ব্যবস্থা আছে। গৃহীও যখন অভ্যাসযোগে সাধকত্ব লাভ করে, তখন সে আত্মজয়িতার উৎকর্ষানুপাতে পঞ্চপাত্র পর্য্যন্ত পান করিতে পারে।

সাধকানাং গৃহস্থানাং পঞ্চপাত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।

লোক যখন সর্ব্বতৃষ্ণাপরিহারপূর্ব্বক সম্যক্‌ভাবে ভগবদর্পিতমনা হয়, তখন তাহার পক্ষে মদ্যের যথেচ্ছ ব্যবহার অনিন্দিত। যেহেতু তদবস্থায় ভগবৎশক্তি-প্রভাব হেতু মদ্য তাহাকে মাতাল করিতে পারে না। যিনি এইরূপ আত্মশক্তি বুঝিতে না পারিয়া অসময়ে আপনাকে মদ্যের যথেচ্ছ ব্যবহারের অধিকারী মনে করেন, তিনি পান দোষে দূষিত হইয়া অধোগতি লাভ করেন। এই জন্য তন্ত্র বলিয়াছেন—

মন্ত্রার্থস্ফুরণার্থায় ব্রহ্মজ্ঞানোদ্ভবায় চ।
সেবাতে মধুমাংসাদি তৃষ্ণয়া চেৎ স পাতকী॥

ভোগ পিপাসা লোকের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু তাহাতে সুখ নাই, সুখের অভাসমাত্র আছে। ভোগ পিপাসার নিবৃত্তিই প্রকৃত সুখাত্মক।

প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু পরং সুখং।

প্রবৃত্তি বা ভোগতৃষ্ণায় প্রকৃতপক্ষে সুখ না থাকিলেও উহা দুস্ত্যজ্য। সহসা বা সহজে কেহ তৃষ্ণা পরিহার করিতে পারে না। কিন্তু কঠোর অভ্যাসযোগে ভগবদ্ভাবের জাগরণে ভোগ-তৃষ্ণা নিবৃত্ত করিতে পারিলে শান্তিজনিত বিশুদ্ধ সুখ অনুভব করিবার অধিকার জন্মে।

যা দুস্ত্যজা　…　..　…।
যাসৌ প্রাণান্তিকো রোগ স্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্॥

এইরূপ তৃষ্ণাত্যাগে যখন পরাশান্তি লাভ হয়, তখন সংসারে কিছুই অপবিত্র বা অমেধ্য থাকে না। সুতরাং সামাজিক বিচারে যাহা দূষ্য ও নিন্দিত, সর্ব্বতৃষ্ণাপরিশূন্য ভগবদ্ভক্ত আত্মরামের পক্ষে তাহা পরম পবিত্র ও সর্ব্বথা অনিন্দিত হইয়া দাঁড়ায়। এ নিমিত্ত তন্ত্রমতে যাঁহারা কৌল অর্থাৎ তান্ত্রিক অনুষ্ঠান দ্বারা উত্তরোত্তর বিশুদ্ধিলাভ করিয়া সর্ব্বতৃষ্ণাবিমুক্ত আত্মজয়ী বীর, তাঁহাদিগের হস্তগত মুদ্রাখ্য অমেধ্য দ্রব্য সমূহও পরম পবিত্র।

ম্লেচ্ছেন শ্বপচেনাপি কিরাতেনাপি হূনুনা।
আমং পক্কং যদানীতং বীরহস্তার্পিতং শুচিঃ॥

তন্ত্রোক্ত এইরূপ মেধ্যামেধ্যের ও জাতিভেদের বিচারশূন্যতা সকলের জন্য নহে, সর্ব্বাবস্থায়ও নহে। যাঁহারা সর্ব্ববিধ ভোগবিতৃষ্ণ হইয়া আত্মজয়ী এবং চক্রাবস্থিত, কেবলমাত্র তাঁহাদিগের জন্যই ঈদৃশ স্বেচ্ছাচারের বিধান। যাঁহারা কামকামী তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কোন অবস্থাতেই এই বর্জ্জিতবিধি প্রযোজ্য নহে। যাঁহারা আত্মজয়ী কৌল তাঁহারাও যখন চক্রাবস্থিত ন থাকেন, তখন মেধ্যামেধ্যের ও জাতিভেদের বিচার করিতে বাধ্য।

নাত্র জাতি বিচারোঽস্তি নোচ্ছিষ্টাদিবিবেচনম্।
চক্রমধ্যগতা বীরা মম রূপা ন চান্যথা।
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্॥

তন্ত্রে যে সকল স্বেচ্ছাচারিতার বিধান দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বাস্তবিক স্বেচ্ছাচারিতাও নহে, অনিষ্টজনক বা অবসাদকও নহে। যে সকল ধর্ম্মধ্বজী তান্ত্রিক বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া লোকপ্রতারণার্থে ভাক্ত তান্ত্রিক সাজেন, তাহাদিগের কুকীর্ত্তি দর্শনে আমাদিগের মনে কুভাব সমুৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু তাহা তন্ত্রের দোষ নহে। তন্ত্রশাস্ত্র সর্ব্বাবস্থায়ই অনিন্দিত ও মুক্তিপ্রদ।

মৈথুন পঞ্চমকারের শেষতত্ত্ব। ইহাও বিশুদ্ধান্তঃকরণে শক্তিসেবা। সুতরাং পরম পবিত্র; স্থূল দর্শনে উহা যতই বীভৎস বোধ হউক না কেন, উহা ইন্দ্রিয়জয়ের ও চরিত্রগত

বিশুদ্ধির অগ্নিপরীক্ষা। যাঁহাদিগের চরিত্রে বিন্দুমাত্রও কলঙ্ক থাকে তাঁহারা সহস্র বর্ষেও এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। এ পরীক্ষায় যাঁহারা উত্তীর্ণ হন তাঁহারা বাস্তবিকই ব্রহ্মভূত বা শিবস্বরূপ। আমরা যাঁহাদিগকে বিষয়ত্যাগী সন্ন্যাসী বলিয়া সম্মান করি, তাঁহারা কেহই শক্তিজয়ী নিখুঁত ধার্ম্মিক নহেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই আত্মরক্ষার নিমিত্ত স্ত্রীসংস্রব হইতে দূরে থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা আপনাদিগকে শক্তিজয়ী বিশ্বাসে স্ত্রীসংস্রবে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলে নষ্টচরিত্র ও দুর্নামগ্রস্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ বা ঘৃণিত অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া কারাগৃহে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তন্ত্র তাদৃশ অপরীক্ষিত ধার্ম্মিককে কৌলাখ্যা দানে সম্মানিত করেন না। যাঁহারা পঞ্চমকার-সাধনা দ্বারা নিখুঁত ধার্ম্মিক হইয়াছেন, তন্ত্রমতে তাঁহারাই কৌল।

সাধারণ ভাষায় স্ত্রীলোকগণ অবলা নামে কথিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা মহাশক্তি। সংসার এই মহাশক্তিদ্বারা অভিভূত। ভগবৎ প্রসাদে যিনি এই মহাশক্তি আত্মানুগত করিতে সমর্থ হন, তিনি এই মহাশক্তিপ্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। অন্যান্য শাস্ত্রে শক্তি হইতে বিচ্ছিন্নতা সংন্যাসধর্ম্মের লক্ষণ, কিন্তু শক্তি-সঙ্গরূপ অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি নির্ভুলভাবে প্রমাণিত না হইলে তান্ত্রিক সংন্যাসী হওয়া যায় না। শিক্ষা-বিভাগে যেমন নানা পরীক্ষায় কৃতিত্ব লাভ করিয়া সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে লোক কৃতবিদ্য বলিয়া সম্মানিত হয়, তান্ত্রিক পঞ্চমকারও তদ্রূপ চরিত্রশুদ্ধির কঠোর শেষপরীক্ষা। পঞ্চমকার মধ্যে শেষ তত্ত্ব অর্থাৎ শক্তিপরীক্ষা অগ্নিপরীক্ষা স্বরূপ। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে চিত্তশুদ্ধি সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না। যিনি এই শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, তিনি তান্ত্রিক তত্ত্বচক্রের অধিকারী। সদাশিব বলিয়াছেন—

> তত্ত্বচক্রং রাজচক্রং দিব্যচক্রং তদুচ্যতে।
> নাত্রাধিকারঃ সর্ব্বেষাং ব্রহ্মজ্ঞান্ সাধকান্ বিনা ॥
> পরব্রহ্মোপাসকা যে ব্রহ্মজ্ঞা ব্রহ্মতৎপরাঃ।
> শুদ্ধান্তঃকরণাঃ শান্তাঃ সর্ব্বপ্রাণিহিতে রতাঃ ॥
> নির্ব্বিকারা নির্ব্বিকল্পা দয়াশীলা দৃঢ়ব্রতাঃ।
> সত্যসংকল্পকা ব্রহ্মা স্তএবাত্রাধিকারিণঃ ॥
> ব্রহ্মভাবেন তত্ত্বজ্ঞে যে পশ্যন্তি চরাচরম্।
> তেষাং তত্ত্ববিদাং পুংসাং তত্ত্বচক্রেধিকারিতা ॥
> সর্ব্বব্রহ্মময়ং ভাবঃ চক্রেঽস্মিং স্তত্ত্বসংজ্ঞকে।
> যেষামুৎপদ্যতে দেবি! ত এব তত্ত্বচক্রিণঃ ॥

এই নিমিত্তই তন্ত্রশাস্ত্র পঞ্চমকার সাধকদিগকে কুলীন, কৌল ও বীর আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বস্তুতঃ যাঁহারা পঞ্চমকারের এই শেষতত্ত্বের পরীক্ষা পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছেন, সর্ব্বোচ্চ বীর সম্মান কেবল তাঁহাদিগেরই প্রাপ্য।

তন্ত্রশাস্ত্রে এই শক্তিপরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার ক্রমও সুন্দররূপে নির্দ্দেশ করা আছে। যিনি অসংযতস্বভাব, তিনি স্ত্রীসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত থাকিয়া আনুকল্পিক উপাসনা দ্বারা প্রমাথী চিত্তকে ভগবৎপ্রবণ করিতে প্রয়াস পাইবেন।

অথবাত্র স্বয়ম্ভ্বাদিকুসুমং প্রাণবল্লভে।
কথিতং তৎ প্রতিনিধৌ কুশীদং পরিকীর্ত্তিতম্॥

শেষতত্ত্বের পরিবর্ত্তে ইতিপূর্ব্বে আমি যে স্বয়ম্ভু-কুসুমের ব্যবস্থা করিয়াছি, যদি তাহা সুলভ না হয় তবে তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ রক্তচন্দন দ্বারা ভগবতীর আরাধনা করিবে।

শক্তির প্রতিনিধিস্বরূপে পুষ্প বা রক্তচন্দন দ্বারা ভগবতীর আরাধনা করিতে করিতে চিত্ত কথক পরিমাণে পবিত্র হইলে, শক্তির পরিবর্ত্তে ভগবতীচরণ ধ্যান ও ইষ্ট মন্ত্র জপ করিবে।

স্বভাবাৎ কলিজন্মানঃ কামবিভ্রান্তচেতসঃ।
তদ্রূপেণ ন জানন্তি শক্তিং সামান্যবুদ্ধয়ঃ॥
অত স্তেষাং প্রতিনিধৌ শেষতত্ত্বস্য পার্ব্বতি।
ধ্যানং দেব্যাঃ পদাম্ভোজে স্বেষ্টমন্ত্রজপস্তথা॥

চক্রস্থিতা শক্তিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে হয়, কিন্তু কলিজাত মনুষ্যগণ স্বভাবতঃই কামবিভ্রান্তচিত্ত, এ নিমিত্ত তাহারা বুদ্ধিব ন্যূনতা দোষে শক্তিকে তেমন ভাবে জ্ঞান করিতে পারিবে না, অতএব তাহাদিগের পক্ষে শেষতত্ত্বের প্রতিনিধিস্বরূপে ভগবতীর চরণধ্যান ও স্বীয় ইষ্টমন্ত্র জপই বিধেয়।

এই রূপে চিত্ত অধিকতর পরিষ্কৃত হইলে চক্রমধ্যে স্বীয় ধর্ম্মপত্নীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাতে দেবতাবুদ্ধি জাগরণে সচেষ্ট হইবে—

শেষতত্ত্বং মহেশানি নির্বীর্য্যে প্রবলে কলৌ।
স্বকীয়া কেবলা জ্ঞেয়া সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতা॥

কলির প্রাবল্যে লোকের সংযমশক্তি দুর্ব্বল হইবে, অতএব তৎকালে পরশক্তি-সাধনায় সাহসী না হইয়া বিলাসতৃষ্ণাদি সর্ব্বদোষবর্জ্জিতা স্বকীয়া পত্নীকেই একমাত্র চক্রাধিষ্ঠানের উপযোগিনী জ্ঞানে বরণ করিবে।

স্ত্রীসান্নিধ্য চিত্তের চপলতাসমুৎপাদক। চপলচিত্ততা মনঃশুদ্ধির বিরোধী, তজ্জন্য চক্রমধ্যে গাম্ভীর্য্যাবলম্বন বিধেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,—

পরিহাসং প্রলাপঞ্চ বিতণ্ড-বহুভাষিতম্।
ঔদাসীন্যং ভয়ং ক্রোধং চক্রমধ্যে বিবর্জ্জয়েৎ॥

এইরূপে স্বকীয়া পত্নীকে চক্রাধিকারিণী করিয়া যখন চিত্তবিকৃতির প্রশমন সম্বন্ধে সংশয় সম্যক্‌ভাবে নিরাকৃত হয়, তখন পরশক্তিকে চক্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অন্তঃশুদ্ধির চরম পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইবে। তাই উত্তর তন্ত্র বলিয়াছেন,—

স্বশক্তৌ সিদ্ধিমালভ্য পরশক্তৌ সদা জপেৎ।

চরিত্র বিশুদ্ধীকরণের নিমিত্ত "বিষস্য বিষমৌষধং" প্রণালীই প্রশস্ত। ঈদৃশ সর্ব্বোত্তম পরীক্ষা তন্ত্রভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্রে না থাকায় ধর্ম্মশাস্ত্রমধ্যে তন্ত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। তন্ত্রমধ্যে আবার পরশক্তি-সাধনাই সর্ব্বোত্তম। তজ্জন্য উত্তর তন্ত্র বলিয়াছেন,—

সর্ব্বেভ্য শ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মতম্।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরো ন হি॥

আচার সাত প্রকার;—১। বেদাচার ২। বৈষ্ণবাচার ৩। শৈবাচার ৪। দক্ষিণাচার ৫। বামাচার ৬। সিদ্ধান্তাচার ৭। কুলাচার।

বেদাচার শ্রুতিসম্মত, বৈষ্ণবাচার স্মৃতিসম্মত, শৈবাচার পুরাণসম্মত এবং দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কুলাচার তান্ত্রিক।

বেদাচার সর্ব্বোত্তম, উহা ধর্ম্মনিষ্ঠ সত্যযুগের মনুষ্যের জন্য। পাপী কিন্তু বিশুদ্ধ বেদাচারী হইতে পারে না, সুতরাং বেদাচার পাপীকে উদ্ধার করিতে পারে না।

বৈষ্ণবাচার ধর্ম্মনিষ্ঠায় অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ ন্যূন হইলে ও পাপনাশিনীশক্তিহেতু বেদাচার হইতে উত্তম। উহা স্মৃতিসম্মত,ধর্ম্মমূলক এবং ত্রেতাযুগের লোকোদ্ধারের হেতু-ভূত।

শৈবাচার ধর্ম্মবিষয়ে বৈষ্ণবাচার হইতেও কিঞ্চিৎ ন্যূন, কিন্তু ধর্ম্মার্দ্ধক্ষয়িত দ্বাপরযুগের লোকোদ্ধারে সক্ষম জন্য বৈষ্ণবাচার হইতে উত্তম।

দক্ষিণাচার, বামাচার ও সিদ্ধান্তাচার কলিজাত মানবের উদ্ধারক। যুগধর্ম্মের প্রভাবে ক্রমশঃ পাপের ভাগ যত বৃদ্ধি পাইয়াছে, উক্ত আচারত্রয়ও ক্রমশঃ অধিকতর পাপনাশিনী শক্তিহেতু পূর্ব্বাচার হইতে পরবর্ত্তী আচার উত্তমাচার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

কুলাচারও তান্ত্রিক বিধান। উহা দ্বারা অতিশয় গর্হিত পাপীও ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সক্ষম হইতে পারে, এ নিমিত্ত উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পঞ্চমকার স্থূল দর্শনে অপবিত্র বলিয়া বোধ হইলেও পরম পবিত্র। যাহা কলি-কল্মষরূপ অত্যুৎকট ব্যাধির মহৌষধ, তাহাকে কোন ক্রমেই অপবিত্র বলা যাইতে পারে না। অপব্যবহারে সর্ব্ব বস্তুই কুৎসিত বা বিপরীত ফলোৎপাদক হয়। ব্রহ্মজ্ঞান যে সর্ব্ববাদিসম্মত পরম পবিত্র, অপব্যবহারে তাহাও মহানর্থ সমুৎপাদক হয়। সমুদ্র রত্নাকর; কিন্তু যাহারা সমুদ্র হইতে রত্নোদ্ধার করিতে জানে না, ধনতৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া সমুদ্রজলে ঝাঁপিয়া পড়ে, তাহারা তাহাতেই ডুবিয়া মরে; রত্ন কিছুই উদ্ধৃত হয় না এবং প্রাণ বাঁচান দুঃসাধ্য হয়। পঞ্চমকারও সেইরূপ পরাশান্তি ও নির্ম্মল সুখের আধার, অথচ রত্নাকরের ন্যায় উহার গরলোদ্গারেরও শক্তি আছে। অপরিণামদর্শী অসংযত লোক অতর্কিত-ভাবে পঞ্চমকার-সাগরে ঝাঁপিয়া পড়িলে তাহাতেই ডুবিয়া মরে; বিশুদ্ধ না হইয়া অশুদ্ধ হয়, স্বর্গের পরিবর্ত্তে নরকে প্রবেশ করে!

পঞ্চমকার-সাধনার মধ্যে অনেক গুলি প্রক্রিয়া জনসাধারণের বিচারে কুভাব ও কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক জন্য আধুনিক শিষ্টাচারপরায়ণ সুসভ্য শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ উহা সুরুচিবিরুদ্ধ ও অশ্লীল বলিয়া নিন্দা করেন; কিন্তু সে নিন্দা সত্যের অপলাপ ও গুণগ্রাহিতার অভাবব্যঞ্জক। স্থূলদর্শী রোগী তীব্র তিক্তস্বাদ হেতু কুইনাইন বর্জ্জনীয় মনে করিতে পারে, কিন্তু পরিণাম-দর্শী গুণগ্রাহীর নিকট উহা জ্বরনাশক বলিয়া সমাদৃত। পূর্ব্বে টোলের পণ্ডিতগণ অসঙ্কুচিত-ভাবে ছাত্রগণের নিকট ও প্রকাশ্য সভায় অনেক অশ্লীল কথা প্রয়োগ করিতেন, তাঁহারা সুরুচিবান বর্ত্তমান শিক্ষিতদিগের অপেক্ষা চরিত্রগুণে অত্যধিক সমুন্নত ছিলেন। ভগবদ্ভক্তি-বিশ্বাসেও বর্ত্তমান সুশিক্ষিতগণ তাঁহাদিগের চরণ-রেণু গ্রহণেরও অযোগ্য। সুপক্ক মাকাল ফল দেখিতে সুন্দর, কিন্তু তাহার ভিতর অঙ্গারময় জন্য উহা অনাদৃত। পনস ফল কণ্টকাবৃত, কিন্তু সুস্বাদু জন্য সমাদৃত। যাহার মন অসংযত, স্বভাব কুৎসিত, কেবল বাহ্যদৃশ্য মাত্র যাহাদিগের বিচার্য্য, পঞ্চমকার তাহাদিগের বিচারে নিন্দিত হইলেও গুণগ্রাহী কোন ক্রমেই পঞ্চমকার নিন্দিত মনে করিতে পারেন না। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন—

বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাম্
গৃহেষু পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহ স্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্॥

যাহাদিগের মন কুৎসিত, সুসভ্যরীতিমার্জ্জিত হইয়াও তাহারা দূষিতস্বভাব, সুতরাং নিন্দিত; যাহাদের মন পবিত্র, ভগবদ্ভক্তি-শ্রদ্ধার উদ্দীপনা যাহাদিগের লক্ষ্য, তাহাদিগের বাহ্যাচার অসংস্কৃত ও অশ্লীলভাবব্যঞ্জক হইলেও তাহারা ভক্তিভাজন ও তাহাদিগের বাহ্য অশ্লীলাচারও পরমপবিত্র ও প্রশংসনীয়। কলিতে সকল লোকই কোন না কোন আকারে পঞ্চমকার দূষিত। এই পঞ্চমকার দোষখণ্ডনার্থে, সাধুভাবে পঞ্চমকারানুসেবনই বিহিত। তন্ত্র সেই সাধুভাবের পথপ্রদর্শক। তান্ত্রিক সাধনায় পঞ্চমকাররূপ তীব্র গরল অমৃতে পরিণত হয়।

শ্রীমাধবচন্দ্র সান্যাল।

রামায়ণ।

(পরমাত্ম-তত্ত্ব)

পরব্রহ্মের রামাবতারে ভূভারহরণ, লোকশিক্ষা ও ধর্ম্মসংস্থাপনের উদ্দেশ্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন ;—ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

পৃথিবীতে ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য যুগে যুগে ভগবান অবতীর্ণ হয়েন। পরমাত্মা পরব্রহ্ম যুগে যুগে যে যে রূপে অবতীর্ণ হয়েন, সেই সেই রূপেই তিনি জগতের নরনারীর পূজ্য ও ধ্যেয় হয়েন। ভগবান পূর্ণব্রহ্মের সকল অবতারই অসুর ও রাক্ষসগণের বিনাশ করিয়া জগতের শান্তি বিধান করেন এবং ধর্ম্মের সংস্থাপন করেন। রাম-চরিত্রে লোকশিক্ষার অতুলনীয় উপদেশ এবং পরম পবিত্র পরমাত্ম-তত্ত্বোপদেশ রামায়ণ-গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। উপযুক্ত অধিকারীর রামায়ণপাঠে ঐ উভয় তত্ত্বের সম্যক্ উপলব্ধি হয়। তখন তিনি অনায়াসে গ্রন্থের নায়ক নায়িকার প্রকৃতি, কার্য্য—ঘটনাবলী এবং উপাখ্যানভাগের দিক দিয়া লোকশিক্ষার ভাব এবং পরমাত্ম-তত্ত্বের ভাব দেখিতে পান। এই পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ রামায়ণের পরমাত্ম-তত্ত্বভাগের মর্ম্মোদ্ধারে অধিকারিগণ ভগবান রামচন্দ্রের অনুকম্পায় শক্তিষ্ঠ হয়েন, তাঁহারই করুণাপ্রভাবে এবং তাঁহারই প্রেরণায় উপযুক্ত অধিকার লাভ করিয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানব পর্য্যন্ত ভগবৎলীলার সেই পরমাত্মতত্ত্ব-জ্ঞানোপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। সগুণ এবং নির্গুণভেদে এক পরমাত্মাই নরনারীর ধ্যেয় ও উপাস্য। নির্গুণ ব্রহ্মে প্রসন্নাপ্রসন্ন ভাব নাই। অনধিকারী এবং অজ্ঞান নরনারী পরব্রহ্মের অস্তিত্ব বিষয়ে অপ্রত্যয় করিবে, ইহাই বুঝিয়া এবং পরব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্বরূপে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার বিশ্বরক্ষার অভিপ্রায় বুঝিয়া বিশ্বরক্ষার্থ পরব্রহ্ম পরমাত্মা যুগে যুগে এক একরূপ এক এক সময়ে ধারণ করিয়া বিশ্বরক্ষা করেন, এবং অধর্ম্ম অসদাচারের বিনাশ সাধন করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন এবং সদাচার প্রতিষ্ঠা করেন। সগুণ রূপের উপাসনাতে যে নির্গুণতাপ্রাপ্তি ঘটে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি হয়, তাহারই বিজ্ঞাপনার্থ, তাহারই শিক্ষার্থ নির্গুণ পরমাত্মা সগুণ হইয়া অবতীর্ণ হয়েন। নির্গুণ পরব্রহ্ম সগুণ হইয়া রামচন্দ্র উপাধিগ্রহণে রাজা দশরথের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েন।

রাজা দশরথের পূর্ণ ধর্ম্মাধিকার না থাকিলে তিনি কখনও ভগবান রামচন্দ্রের জনক হইতে পারিতেন না। রাজা দশরথ এই নামের তাৎপর্য্য প্রনিধান করিলে,

ইহার নিগূঢ়তত্ত্বের জ্ঞানোদয় হয়। রাজা দশরথ ধর্ম্মের পরমাশ্রয় এবং পূর্ণধর্ম্মাধিকারী। এই তত্ত্ব নরনারীর অবগতির জন্য দশরথ এই নামকরণ হইয়াছে।

রথ শব্দে যান। দশধর্ম্মকে রথ কল্পনা করিয়া দশরথ এই নামকরণ হইয়াছে। ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ এই দশটি ধর্ম্ম-লক্ষণ। এই দশধর্ম্মে অস্খলিতরূপে চলিলে, পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। রাজা কোশলাধিপতি দশরথ দশধর্ম্মারূঢ় হইয়া অস্খলিতরূপে চলিতেন। তদ্ধেতু তাঁহার দশরথ এই নামকরণ হইরাছে।

জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আত্মা, জীব, মনঃ ও অহঙ্কার এই চারিটি ব্রহ্ম পুচ্ছ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়, ইহার অবস্থাচতুষ্টয়। সগুণ অবস্থায় বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, এই চারিজন আত্মব্যূহচতুষ্টয় বলিয়া গণ্য। এস্থলে তুরীয়াবস্থায় বাসুদেবাখ্য আত্মা শ্রীরাম, সুষুপ্তাবস্থায় সঙ্কর্ষণাখ্য আত্মা লক্ষণ, স্বপ্নাবস্থায় প্রদ্যুম্নাখ্য আত্মা ভরত, জাগ্রদবস্থায় অনিরুদ্ধাখ্য আত্মা শত্রুঘ্ন, এই পরমাত্মা পরব্রহ্ম একেরই এই চারি-রূপে শ্রীরামের অবতার।

পরমাবিদ্যা সীতানামে অভিহিতা। সীতা—ভূমি হইতে উত্থিতা হইয়াছেন। পৃথিবী সমস্ত ধর্ম্মের আধারভূতা, "ধর্ম্মধারা বসুন্ধরা" এই তত্ত্বজ্ঞান বিদিতাভিপ্রায়ে পরমাবিদ্যা সীতার পৃথিবী হইতে উৎপত্তি হইরাছে॥ বিনাধর্ম্মে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না, চিত্তশুদ্ধি না হইলে বিদ্যালাভও হয় না। তদ্ধেতু যজ্ঞভূমিকর্ষণে সীতার জন্ম।

মিথিলাধিপতি জনক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি যোগী। যোগদ্বারা পরমাবিদ্যা এবং তৎপর পরমাত্মার প্রাপ্তি ঘটে। রাজা জনক যোগ সাধনাদ্বারা পরমাবিদ্যা জ্ঞানস্বরূপা সীতাকে কন্যারূপে লাভ করেন। তৎপর জ্ঞানলাভ হইলেই যে পরমাত্মা লাভ হইবে, এই পরমাত্মতত্ত্বের বাহ্যাবরণ জগতের সম্মুখে উন্মোচিত হউক, পরব্রহ্মের এই ইচ্ছা জন্যই রাজর্ষি জনক পরমাবিদ্যারূপিণী জ্ঞানস্বরূপা সীতা "কন্যা" দানে পরমাত্মা রামকে জামাতৃরূপে প্রাপ্ত হন্। ইহা অসামান্য সাধনার ফল। যোগসাধনা হইতে পরমাবিদ্যা পরমাত্মজ্ঞান লাভ এবং পরমাত্মজ্ঞান লাভ দ্বারা পরমাত্মালাভ। ইহার অধিক সাধনা আর কি আছে?

সীতা বিবাহে হরধনুর্ভঙ্গরূপ "পণ" নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ক্রিয়াবান না হইলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না। তত্ত্বজ্ঞান প্রদানে পুরুষপরীক্ষার্থ কঠিন প্রতিজ্ঞা আবশ্যক। এতাদৃশ পুরুষ সাধনা-চতুষ্টয়সম্পন্ন ভিন্ন হইবার উপায় নাই। এই তত্ত্ব প্রদর্শনার্থ স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র হরধনুঃ ভঙ্গ করেন।

রামের বনবাস। তত্ত্ব জ্ঞানাপহারকগণ দৈত্য, দানব ও রাক্ষসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া লোকালয়ে এবং বনভূমিতে অধিবাস ও বিচরণ করে। দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণের অন্বেষণ

জন্ত শ্রীরামচন্দ্রের লোকালয়ে ও কাননে পরিভ্রমণ। ভগবান রামচন্দ্র সংসারকানন বিচরণ করিয়া পৃথিবী পর্য্যটনানন্তর মুনিজনসেবিত পঞ্চবটীতে অবস্থান করেন। পঞ্চবটীতে অবস্থান—যোগিগণের নিয়ত যোগাভ্যাস স্থলে পরমাত্মার নিত্যাধিষ্ঠান, ইহা শাস্ত্রসম্মত।

"নিম্বমামলকং বিল্বং ন্যগ্রোধঞ্চায় পিপ্পলং।
জ্ঞেয়ং পঞ্চবটং দেবি যোগিনাং যোগসিদ্ধিদং॥

যামলবচনম্।

এতাদৃশ স্থলে পরমাত্মার নিত্যাধিবাস। জ্ঞানার্থী যোগী দেশে দেশে, লোকালয়ে, অধিবাস বা পরিভ্রমণ দ্বারা আয়ুক্ষয় না করিয়া এই পরমপবিত্র স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়া তত্ত্ব জ্ঞানানুসন্ধান করেন। ভগবান রামচন্দ্র এই তত্ত্বের প্রকটনাভিপ্রায়ে সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে পঞ্চবটীতে অধিবাস করেন।

রাবণের কপট সন্ন্যাসিবেশে সীতাহরণঃ—পরমাত্মার সহিত কিঞ্চিৎ বিচ্ছিন্নভাবে যোগস্থান-স্থিত হইলেও তত্ত্ববিরোধী দৈত্য, দানব, অসুর ও রাক্ষস স্বরূপ বিঘ্নচয় জ্ঞানকে অপহরণ করে, তাহার প্রমাণস্বরূপে পরমাত্মা মূর্ত্তি রামচন্দ্রের কিঞ্চিৎ বিরহে জ্ঞানস্বরূপা পরমাবিদ্যা সীতাকে কপট সন্ন্যাসিরূপে রাক্ষসাধিপ রাবণ যোগস্থান পঞ্চবটী হইতেও অপহরণ করেন। তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্তির অভিলাষী না হইয়া কেবলমাত্র নরনারীগণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের অভিপ্রায়ে বিষয়কর্ম্মানুষ্ঠানরত ভিক্ষুকস্বরূপে যে বিচরণ করে সে কপট সন্ন্যাসী। রাবণের সন্ন্যাসিবেশে সীতাহরণ উপাখ্যানের এই তত্ত্বোপদেশ।

নিকসারাক্ষসী সূর্য্যারিকা খণ্ডে অধিবাস করিতেন, তাঁহার প্রার্থনায় বিশ্বশ্রবা ঋষি তাহাকে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ নামে দুই পুত্র ও সূর্পনখা নামে এক কন্যা প্রদান করেন এবং মুনিবর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিভীষণনামে পরমধার্ম্মিক ঋষিতুল্য আর একপুত্র প্রদান করেন। সূর্য্যারিকার একখণ্ডে মুনিদিগের আশ্রম, অপরখণ্ডে "কানিবল" তাহাতে মাল্যবান প্রভৃতি রাক্ষসের অধিবাস। নিকষা সেই কানিবল খণ্ড হইতে আসিয়া মুনিদেশস্থিত বিশ্বশ্রবার নিকট পুত্র প্রার্থিতা হইয়াছিলেন, ইহাই পৌরাণিক ইতিহাস। ঋষি কোন স্থলে বিশ্বশ্রবা কোন স্থলে বিশ্রবস বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। পরমার্থঘটিত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইলে ঋষিপদে পরমাত্মা নারায়ণ। সকল শ্রবণ হইতে যাহার শ্রবণ বিশিষ্টরূপ তাঁহারই নাম বিশ্রবা, অথবা বিশ্বলীলা শ্রবণহেতু পরমাত্মাকে বিশ্রবস বলা হয়। কিম্বা যিনি শ্রোতব্য, তিনিই বিশ্রবা, এ অর্থে আত্মাই শ্রোতব্য। সূর্য্যারিক পদে সূর্য্য যেখানে তীব্রতা প্রয়োগ করেন, এমত দেশ অথবা যেখানে সূর্য্যাগ্নি বিদ্যুতের বিকাশ নাই, তাহারই নাম সূর্য্যারিক অর্থাৎ তদ্বিষ্ণুর পরমপদ যথা—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন বা বিদ্যুতঃ কুতোঽয়মগ্নিরিতি শ্রুতিঃ।"

সেই পরমাত্মা সৃষ্টিলীলা বিস্তার করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার ইঙ্গিতে সৃষ্টিকারিণী মায়া তাঁহার নিকট পুত্র প্রার্থনা করেন। তাহাতেই মায়াসম্ভব মহামোহ, মহাতম প্রভৃতির উৎপত্তি

হয়, এস্থলে মায়া শব্দে নিকষা। সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে—কষ্ বিলোড়নে বিলোমনে চেতি; কিঞ্চ নিকষিত নিকষা।" কষ্ ধাতুতে বিলোড়ন ক্রিয়া, কখন বা বিলোমন ক্রিয়াও বুঝায়। নি+কষ্ ধাতু কর্ত্তৃবাচ্যে অট প্রত্যয় করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে "নিকষা" এই পদ সিদ্ধ হয়। সুতরাং এস্থলে নিকষা শব্দে জগদাকর্ষণী মায়া। বিশ্বশ্রবা পদে পরমাত্মা নারায়ণ, সেই দুরন্ত মায়াকে মহামোহ ও মহাতম নামে দুই পুত্র, আর কলহকারিণী নিকৃতি নামে এক কন্যা প্রদান করেন। ঐ কন্যার নাম সূর্পনখা আর মহামোহের নাম রাবণ ও মহাতমের নাম কুম্ভকর্ণ খ্যাত হয়। অযাচিত পুত্র—বিবেক, এখানে তাহার নাম বিভীষণ। অধ্যাত্মপক্ষে লঙ্কাদ্বীপ শব্দে দেহীর দেহকে বুঝাইবে, লঙ্কা-স্বরূপে দেহ বর্ণনার তাৎপর্য্য লইতে হইবে। যেমন সুবর্ণময় লঙ্কাদ্বীপ লবণসমুদ্রমধ্যে ভাসমান, সেইরূপ শোভনবর্ণবিশিষ্ট জীবের দেহও সংসারসমুদ্রমধ্যে দ্বীপবৎ ভাসমান হইয়াছে। লঙ্কাদ্বীপকে অধিকার করিয়া রাবণ কুম্ভকর্ণাদি বাস করিয়াছিল। সেইরূপ জীবের দেহকে অধিকার করিয়া মহামোহ, মহাতম ও নিকৃতি এবং বিবেক অবস্থিতি করেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য, দম্ভ, দ্বেষ, হিংসা ও পৈশুন্য, মহামোহের এই দশ প্রধানাঙ্গ। সুতরাং, অঙ্গ সকলের মধ্যে মুখের প্রধানতাপ্রযুক্ত রাবণকে দশানন বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। বিহিতাবিহিতরূপে প্রত্যেক মুখে দুই দুই হস্ত কল্পনা দ্বারা বিংশতি হস্ত বর্ণনা হইয়াছে। অর্থাৎ কাম, ক্রোধাদি রিপুসকল বিহিতাবিহিতরূপে দ্বিবিধ কর্ম্ম করে। বিহিতপূর্ব্বক কামাদি ক্রিয়া স্বদারোপভোগ এবং অবিহিতপূর্ব্বক পরদারোপভোগাদি উভয় কর্ম্মই মহামোহের অনুষ্ঠেয় হয়। যেখানে মহামোহের অধিষ্ঠান, সেখানে কোনক্রমেই ভদ্রতা নাই, সেই হেতু রাবণ অহিতাচারী। মহামোহের প্রভাব এবং শক্তি অতিশয় প্রবল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুর্ব্বুদ্ধি।

(ক্ষুদ্র গল্প)

"কি সংবাদ পেলে ঠাকুরপো ?"

"সংবাদ শুভ।"

"পাশ করেছ ?"

"যাই মার কাছে সংবাদ দিই গে।" এই বলিয়া নগেন্দ্রনন্দিনী বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। শ্বাশুড়ী তখন আহ্নিক করিতেছিলেন। ছেলের পাশের সংবাদ শুনিয়া তাঁহার মুখে আনন্দের রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি প্রফুল্ল মনে মালা জপিতে লাগিলেন।

'ঠাকুরপো! মা জেদ করছেন, এই জ্যৈষ্ঠ মাসেই তোমায় বিয়ে করতে হবে। লোক ত আর চিরদিনের তরে সংসারে আসে না,—তিনি বুড়ো হ'য়েছেন, কখন আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন।"

"কি বলছো বউদি! ও সব অলক্ষণে কথা আমার ভাল লাগে না। এই সবে মার বয়স পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন হয়েছে—এরই মাঝে তাঁর মৃত্যু চিন্তা করছ? - আর বিয়ের কথা! ও ভাবনাটা তোমরা কর্‌তে যাও কেন? যাক্ পাঁচসাত বছর, কিছু লেখাপড়া শিখি, বয়স হোক।

"তোমার ঐ একই কথা ঠাকুরপো! "লেখাপড়া শিখি, বয়স হোক।" - কেন? তুমি কি লেখাপড়া কিছু কম শিখেছ? বয়সই কি কম হ'য়েছে?—ঐ ত ওদিন পাড়ার পুরুত ঠাকুর পাঁজি ঠিকুজী দেখে মাকে বললেন "ওগো তারক তোমার সতের বছরে পা দিয়েছে।"— আর লেখাপড়া! তাও ত তোমার কম হয়নি; ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেছ, প্রথম শ্রেণীতে। ইস্কুলেও তুমি প্রথম ছাত্র ছিলে; তোমার সঙ্গে পরীক্ষা দিয়ে ওবাড়ীর হারাণ ত এই বৈশাখ মাসেই বিয়ে করেছে।"

"অন্যের কথা ছেড়ে দাও বউদি।—আমার মন বল্‌ছেনা যে আমি এত অল্প বয়সে বিয়ে করি। পুস্তকে পড়েছি, আমাদের দেশের ব্রাহ্মণগণ কেহই ত্রিশ বছরের আগে বড় একটা সংসারে প্রবেশ করেন নি। তাঁদের জীবনী ও তাঁদের চরিত্র আলোচনা কর্‌লে আমাদিগকে চুপ্ করে থাক্‌তে হয়; নিজের কিছুই গর্ব্ব করবার থাকে না— আমরা এত নির্জীব হয়ে পড়েছি।"

(২)

তার পর চারি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। তারকবন্ধু বি,এ পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ক্লাস অনার্স্ পাইয়াছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের সে এখন প্রথম ছাত্র। সংসারের জন্য তাহাকে চিন্তা

করিতে হয় না,—বড়দাদাও বাড়ীতে আছেন। কিন্তু এই চারি বৎসরে সংসারের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তারকের সেই স্নেহের বউদিদি—গৃহের আনন্দ নগেন্দ্রনন্দিনী আর নাই। দুইটী শিশুসন্তান রাখিয়া অকালে তিনি লীলা সংবরণ করিয়াছেন।

কলেজের ছুটী হইলে তারক অনেকবারই বাড়ী আসিয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বের মত আনন্দ, পূর্ব্বের মত ভালবাসা সে আর কখনও উপভোগ করিতে পারে নাই। সেই আশার কথা—ভবিষ্যৎ জীবনের কথা—বিবাহের কথা—এখন আর তাহাকে কেহ শোনায় না। কিসের যেন একটা অভাব সে হৃদয়ে অনুভব করিয়া আসিতেছিল। বাড়ীতে দাদা আছেন, তিনিও আর তেমনটী নাই। নগেন্দ্রনন্দিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আন্তরিক আনন্দও যেন মরিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়বার দ্বারপরিগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মনে তেমন সুখ নাই, বাহিরে তেমন স্ফূর্ত্তি নাই।

আশ্বিন মাসে তারক ৺পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছে। একদিন মহিমবাবু তাহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন, "তারক! একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য তোকে আজ এখানে ডেকেছি। নিজের ভালমন্দ এখন তুই নিজেই সকল বুঝিস। নন্দীপুর থেকে একটা সম্বন্ধ উপস্থিত—ডিংসাইবংশের সন্তান, আমাদের চলতি ঘর।"

'যাক দাদা, আরও কয়েকটা দিন। সুবিধা হ'লে দু'চারটা দেখে তার মাঝ থেকে একটা ঠিক করে নেবেন।'

আরও কতক্ষণ কথাবার্ত্তার পর উভয়ে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। মহিমবাবু কয়েক দিন পরে শুনিতে পাইলেন, তারক নিজে মেয়ে পছন্দ করিয়া তবে বিবাহ করিবে।

(৩)

"কিহে তারক! মস্ত একটা কবির মত বড় যে রোজই কি চিন্তা কর দেখতে পাই। মিলনের আগেই বুঝি বিরহ! মজা বটে!"

"ঠাট্টা রাখ বিপিন দা! তুমি জান, আজ কয়দিন শরীরটা আমার ভারি অসুস্থ।"

'তাত হ'বেই, দিব্য দু'বেলা মেসের ভাত মারছ, চলছ ফিরছ, তবু বলছ অসুস্থ! অসুস্থ হ'য়ে থাক ত চিকিৎসার ব্যবস্থা কর না? না হয় বল আমিই একটা মুষ্টিযোগের বিধান করি। চব্বিশ ঘণ্টায় সব সেরে যাবে।'

'বাস্তবিক বিপিন দা! আমার অসুখ করেছে,—বাহ্যিক নহে—শারীরিক নহে,—মানসিক কি একটা উৎকট চিন্তা সর্ব্বদা আমার কল্পনার সামনে তাণ্ডব নৃত্য করছে। সেই নৃত্য দেখে আমার মনে শান্তি আসছে না; কোথাও সোয়াস্তি পাচ্ছিনা। বুঝি শরীরটাও মনের সঙ্গে মাটি হয়ে যায়।'

'কথাটা কি একবার খুলে বল না।—দেখি কোনও প্রতিকার করতে পারি কি না।'

'বিপিন দা! অনেক দিন একসঙ্গে পড়ে তোমার মাঝে আমি যে মনুষ্যত্ব দেখতে পেয়েছি তা অন্যের মাঝে বিরল, তাই তোমাকে কখনও অবিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। তোমাকেও

যদি অবিশ্বাস করি বিপিন দা—তবে বুঝি দুনিয়ায় বিশ্বাস করবার লোক আর একটীও খুঁজে পাব না। দিন দিন কৃশ হ'য়ে যাচ্ছি—শুধু পরকে অবিশ্বাস ক'রে।—দাদা আমায় একদিন অতি আদরে ডেকে বলছিলেন বিয়ে করতে—নন্দীপুর গ্রামে। সেই কথা আমি তখন হেলায় উড়িয়ে দিয়েছি। ভেবে ছিলুম, দশটা দেখে একটা পছন্দ করে নেব।—কিন্তু কৈ, এর মধ্যে ত একটী মেয়েও সুন্দর ঠেক্‌ল না। অনেক মেয়ে দেখেছি—অনেক মেয়ের ফটো এসেছে—কিন্তু কেউ ত সেই নন্দীপুরের মেয়ের মত নয়! কি সুন্দর তার চোখ—কিবা গায়ের লাবণী। সেই পাড়াগাঁয়ের প্রাকৃতিক সরলতার মাঝ থেকে যেন একটা স্বর্গীয় শ্রী ভেসে উঠ্‌ছিল! আমি তাকে অগ্রাহ্য করলেম।—স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম, বি,-এ, পাশ করেছি—অনার্স বি, এ;—এম্, এ পড়ছি। হাজার লোক এসে হাজার মেয়ের সম্বন্ধ উপস্থিত করবে, আমি তারই মাঝ থেকে স্বর্গের অপ্সরার মত—উপন্যাসের নায়িকার মত—চিত্রাঙ্কিত ছবির মত—একটা নিখুঁত মেয়ে বেছে নিয়ে বিয়ে করব। কিন্তু কৈ?—এখন দেখছি একটীও আমার মনের সঙ্গে মিলছে না।'

'তারক! তোমাকে আমি বুদ্ধিমান্ ও চিন্তাশীল বলেই জান্‌তাম। কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখছি তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। কয়দিন তুমি বলেছ, আমি বাপ্ দাদার নাম রাখ্‌ব, পূর্ব্বপুরুষের মত আচার ব্যবহার করতে শিক্ষা করবো। কিন্তু একি! তোমার কথায় যে আজ তোমাকে আজকালকার হাল্‌কা ফুল বাবুদের চেয়েও বেশী বিলাসী ব'লে বোধ হচ্ছে। তুমি বল্‌ছো তুমি নিজের চখে দেখে মেয়ে বিয়ে করবে; কিন্তু তোমার বাপ্ দাদা ত তা করেন নি? তাঁরা সমান ঘরের মেয়ে পেলেই নিরাপত্তিতে বিয়ে করেছেন। খুড়া জ্যেঠার কথা, পূজনীয়দের কথা তাঁহারা অমান্য করেন নি। নিজ চক্ষে দেখে কেহও মেয়ে বিয়ে করেন নি। সেই স্ত্রী—সেই গৃহিণী কি তাঁদের মনোমত হয় নাই? সেই মার ঘরে জন্মেই ত তুমি আজ এম,এ পাশ করতে চলেছ। কৈ তুমিত মূর্খ হওনি?—জান্‌বে তারক! অন্তরের সৌন্দর্য্যের নিকট বহিঃসৌন্দর্য্য সর্ব্বত্রই পরাভব স্বীকার করে। দশটা দেখে একটা বাছতে গেলে তোমার নয়ন মন সব ঝল্‌সে যাবে। জামা কাপড়ের দোকানে গিয়ে শত শত জামার মাঝ থেকে একখানা রঙ্গিন জামা বাছতে যাও, ভাল জিনিষ কিছু কমই দেখিবে।

আর একটী কথা ভাবাও উচিত যৌবনের অদম্য রিপুর তাড়নায় অনেক সময়ে যুবক মুগ্ধ হইয়া প্রকৃত কার্য্য করিতে পারে না। বহিঃসৌন্দর্য্য পর্য্যন্ত চক্ষের দোষে বিপরীত হইয়া যায়।"

[৪]

দেখিতে দেখিতে তারকের এম্, এ, পরীক্ষার সময় নিকবর্ত্তী হইয়া আসিল। বড়দিনের ছুটিতে বাড়ী গিয়া এই যাত্রায়ও সে কয়েকটা মেয়ে দেখিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কি আপদ! গ্রামের মেয়েগুলি একটীও তারকের চক্ষে সুন্দর ঠেকিল না। সহরে সে কত সুন্দর সুন্দর

মেয়ে দেখে, কত রঙ্গে কত ফ্যাসানে স্কুলকলেজের মেয়েগুলি তাহার চক্ষের উপর দিয়া বিদ্যুতের মত চলিয়া যায়। সে তখন হা করিয়া চাহিয়া থাকে।—মনে মনে ভাবে, "কল্‌কাতার লোকগুলি কি বে আক্কেল! ফাষ্ট'ক্লাস বি, এ পাশ করেছি, কেউ এসে আমায় জিজ্ঞাস করলেনা "হ্যা গা তোমার বাড়ী কোথা? কি পড়ছ? কে কে আছে? বিয়ে করেছ ত?" ইত্যাদি। সে স্থির করিল যেরূপেই হউক সে সহরের মেয়ে বিবাহ করিবে। পারে ত একটা ডিপুটীর মেয়ে, নয় একটা প্রোফেসরের—নিদেন একটা এম্, এ পাশ করা মাষ্টারের। মধ্যে মধ্যে সে দাদার ও অন্যান্য আত্মীয়ের—যাহারা সময় সময় তাহার জন্য দুই একটী সম্বন্ধের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাদের পছন্দকে ও প্রকৃতিকে নিন্দা করিত।

এক দিন সে বৈকাল বেলায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। সহসা তাহার দৃষ্টি সম্মুখস্থ একটী ছোট একতলার উপর নিপতিত হইল। সে দেখিল চৌদ্দ কি পনর বৎসরের একটী মেয়ে বেড়াইতে বেড়াইতে একখানা পুস্তক পড়িতেছে, আর মধ্যে মধ্যে বাহিরের জনতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। রূপ দেখিয়া তারকের চক্ষু ঝল্‌সিয়া গেল, হৃদয় নাচিয়া উঠিল। সেই দিন আর তাহার ভ্রমণ করা হইল না। বাসায় ফিরিয়া গেল। তিন দিন—চারি দিন সেই রাস্তা ধরিয়া সে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, প্রতিদিন ঠিক সেই মূর্ত্তি! মূর্ত্তি কোনও দিন পুস্তক লইয়া, কোনও দিন এস্‌রাজ লইয়া, কোনও দিন বা কালী কলম লইয়া উপবিষ্টা। মাথায় বাঁকা টেরী, হাতে কয়েক গাছি মিহি চুড়ী, পরিধানে কালো সাড়ী তাতে লাল লেস্ লাগানো, তার নীচে আবার লাল রংএর পাতলা সেমিজ। তারকের চিত্ত আর স্থির নাই, রমণীর অপূর্ব্ব রূপলহরী তাহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া তুলিল। সে এখন সেই সুন্দরীর পরিচয় জানিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। একদিন সে সেই বাড়ীর একটা চাকরকে বাজারে যাইবার কালে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে, বাবুর নাম ভুবন ব্যানার্জ্জি এবং সেই সুন্দরী তাঁহারই মেয়ে।

'মা! তোমাকে একটা কথা বল্‌ব। কল্‌কাতায় একটী মেয়ে আছে।'

'কল্‌কাতায় মেয়ে?

'হ্যাঁ, মা কল্‌কাতায় মেয়ে। সুকিয়া ষ্ট্রীটে আমাদেরই মেসের নিকট। তাহারা বাঁড়ুয্যে বংশ, শাণ্ডিল্য গোত্র—আমাদের সঙ্গে কাজ চল্‌তে পারে।'

'বলিস্ কি তারক! কল্‌কাতায় সম্বন্ধ করব? নিজের দেশ ছেড়ে—সমাজ ছেড়ে—কোন্ এক অজানা অশোনা দেশে—সেই কল্‌কাতায় তোর বিয়ে দেব? অতি কষ্টে তোকে লেখা পড়া শিখিয়েছি তারক! তোর জন্যে তোর দাদা মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছে।—আমরা আশা করে রেখেছি—যা হ'ক্ দেশের মধ্যে একটা বড় ঘরে সম্বন্ধ স্থাপন করব, তোর পূর্ব্বপুরুষের নাম বজায় থাক্‌বে, গাঙ্গুলীর ঘর অটুট থাকবে। তুই কিনা এখন বলিস সহরের মেয়ের কথা? হায়! আজ যদি কর্ত্তা থাক্‌তেন!—তোকে পাঁচ বছরের

দেখে না দেখেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। অতি আদরের ছেলে, তুই, সকলের ছোট; বুকের রক্ত দিয়ে তোকে মানুষ করেছি; এখন তুই আমাদের কথা শুন্‌বিনি ?"

"শুন্‌ব বইকি মা তোমাদের কথা, চিরদিন শুনে আস্‌ছি, আজও শুন্‌ব। কিন্তু ঐ একটী কথা আমার রাখ্‌তে হবে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করার পর অনেক সম্বন্ধের প্রস্তাব হ'য়েছে, অনেক মেয়ে দেখেছি, কিন্তু তেমনটী কোথাও দেখিনি মা।"

(৫)

মনোনীত কন্যার সহিত বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তারক এখন শ্বশুরের বাসায় থাকিয়া কলিকাতায় একটা কাজের চেষ্টা করিতে লাগিল। যথাসময়ে এম্‌,এ পরীক্ষার ফল বাহির হইল, তারকের নাম অতি নীচে। ঘৃণায় লজ্জায় তারক বাড়ীতে টেলিগ্রাম করিল না। মহিমবাবু ডাকঘরে গিয়া কাগজ খুলিয়া দেখেন—

ইংরেজী

তৃতীয় শ্রেণী

গঙ্গোপাধ্যায়—তারক, প্রেসিডেন্সি।

একটা এণ্ট্রান্স স্কুলের মাষ্টারীর পোষ্টে উমেদারী করিতে করিতে তারকের কয়েক দিন কাটিয়া গেল। অবশেষে ৪৫৲ টাকা বেতনে তাহার এক মাষ্টারী জুটিল। শ্বশুর পোষ্টাফিসের একটা কেরাণীগিরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, কাজেই মেয়ে জামাই উভয়ের শ্বশুরের বাসায় থাকা ভাল দেখায় না, এই বিবেচনা করিয়া তারক একখানা আলাদা বাড়ী ভাড়া করিল।

গ্রীষ্মের ছুটীতে তারক সপরিবারে বাড়ী আসিয়াছে। সঙ্গে একটা হারমনিয়ম, একটা এস্‌রাজ ও এক বোঝা বই। মা মনে করিলেন তাঁহার ছেলে বুঝি এখন গাইতে বাজাইতে শিখিয়াছে। কিন্তু ও হরি! দু'দিন যাইতে না যাইতেই যে ঐ সকল যন্ত্রে নূতন বধূ সুর ভাঁজিতে লাগিল। পাড়ার লোক বিস্মিত! পরিবারের লোক স্তব্ধ। নয়া বৌ সংসারের কোন কাজে হাত দেয় না, সর্ব্বদা পুস্তক নিয়া ও বাদ্যযন্ত্র নিয়া বসিয়া থাকে। বড়বৌটা শ্বশুরবাড়ী আসার পর হইতে এপর্য্যন্ত একাকিনী সংসারের সমস্ত কাজ করিয়া আসিতেছে—দুইটী শিশুসন্তান রক্ষা করিতেছে। সে ভাবিয়াছিল যে দেবরের বিবাহ হইয়া গেলে তাহার নিজের কাজের ভার কতকটা লাঘব করিতে পারিবে। কিন্তু হায়! ফলে

ঘটিল বিপরীত! এখন যেন তাহার উপর কাজের বোঝা আরও বাড়িয়া পড়িল। শিক্ষিতা না হইলেও সে কিন্তু ইহাতে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিল না।

শ্বাশুড়ী—বধূর ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। সহরের মেয়ের চরিত্রে তিনি যে কল্পনার চিত্র গড়িয়া রাখিয়াছিলেন, এখন প্রতিক্ষণে সেই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার বিরক্তি জন্মিয়া গেল। তারক তাঁহার বড় স্নেহের বড় আদরের সন্তান; তাহার স্ত্রীর ছোটলোকের মত ব্যবহারে একদিন তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়া গেল। তিনি রাগের মাথায় কয়েকটা কটুকথা ছেলেকে শুনাইয়া দিলেন।

অনেক উৎপাত সহ্য করিয়া তারক আষাঢ় মাসে কলিকাতা চলিয়া আসিয়াছে। একদিন বিপিনবাবু আসিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিলেন। বিপিনবাবু এখন রিপণ কলেজে ইংরাজীর প্রোফেসর। দুই বন্ধুতে অনেকক্ষণ আলাপ হইল। তিনি জানিতে পারিলেন তারক যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাতে তাহার মাসিক ব্যয়ই সঙ্কুলন হয় না; বাড়ীতে সাহায্য করা ত দূরের কথা। বাসাতে একটা ঠাকুর ও একটা দাসী আছে। বাসার ভাড়াও কম নহে। অতিরিক্ত একটা টিউশনী করিলেও তাহার হাতে কিছুই থাকে না। বিপিনবাবু তাহাকে Historyতে আবার আর একটা পরীক্ষা দিতে বলিলেন। অন্ততঃ সেকেণ্ড ক্লাস পাশ করিতে পারিলেও একটা প্রোফেসারী পাওয়া যাইতে পারে। তারক বলিল—না বিপিনদা! আর আমার পড়া-শোনা হচ্ছেনা। বি, এ ক্লাসে History যা পড়েছি, এখন আর তা মনে আসবে না। বন্ধুর কথা না শুনে, স্বর্গীয়া দেবী বৌদিদির কথায় তাচ্ছিল্ল করে—পূজনীয়ের কথায় প্রতিবাদ করে এখন আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছি। পূর্ব্বের মেধা ও পূর্ব্বের স্মৃতি এখন কিছুই নাই। বৌটার চরিত্র দিন দিন আমায় সন্দিহান করে তুলেছে। আমার মধ্যে এখন আর আমি নেই।

বিপিনবাবু সব কথা শুনিলেন। শুনিলেন যে বধূর মাতৃকুল—মাতামহকুল অতি নিকৃষ্ট। পিতার চরিত্রও তত ভাল নহে। পোষ্টাফিসে কাজ করেন, যে চল্লিশটী টাকা মাহিয়ানা পান, তাহার কিয়দংশ অসৎপথে চলিয়া যায়। এমন সুন্দর রূপ, এমন স্বর্গীয়কান্তি, ইহাতে যে কখনও কলঙ্ক থাকিতে পারে, তাহা তারক আগে কখনও ভাবে নাই। মোহের বশে সে সর্ব্বনাশের শৃঙ্খল স্বহস্তে নিজের পায় পরিয়াছে, এখন আর তার সেই শৃঙ্খল ছাড়িয়া দূরে যাইবার উপায় নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্যপুরাণতীর্থ।

ভক্তিতত্ত্ব।

যদ্ভক্তিলেশতো মুক্তিঃ করস্থা সর্ব্বদেহিনাং

ত্বং বন্দে পরমানন্দমসমং পুরুষোত্তমং ॥

শাস্ত্রই আমাদের সকল বিষয়ে প্রমাণ, শাস্ত্রই আমাদের চক্ষু। আমাদের যখনই যে মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তখনই তিনি শাস্ত্রবহির্ভূত কোন উপদেশই দেন নাই, স্বকপোলকল্পিত মতের অবতারণা করেন নাই। তা যদি হইত, এতদিন আমাদের সম্প্রদায়ের চিহ্নমাত্রও থাকিত না। আমিও এই প্রবন্ধে সেই শাসক-শাস্ত্রের অনভিমত কোন কথাই বলিতেছিনা।

ভগবান স্বমুখে বলিয়াছেন "তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণংতে" হে অর্জ্জুন! শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ জানিবে। ইহার অনুসরণে মহাত্ম' শর্ম্মালিখিত শাসন দেখা যায় যে,—

রাগদ্বেষাগ্নিদগ্ধানাং মগ্নানাং বিষয়াম্ভসি।

চিকিৎসা সর্ব্বশাস্ত্রাণি ব্যাধীনামিব ভেষজং ॥

রাগদ্বেষাদিসম্পর্কে দগ্ধহৃদয় দূষিতচেতা বিষয়সলিলে নিমজ্জমান জীবসকলের পক্ষে ব্যাধির ঔষধের মত শাস্ত্র সমুদয়ই চিকিৎসা, শাস্ত্রানুসরণ ব্যতীত তাহাদের শান্তি নাই।

তবে এ বিষয় শ্রীভগবানই আবার শ্রীমুখে এই সূক্ষ্ম কথা বলিতেছেন—

মদ্ভক্তিবিমুখানাং হি শাস্ত্রমাত্রেষু মুহ্যতাং।

ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ স্যাত্তেষাং জন্মশতৈরপি ॥

আমার ভক্তিবিমুখ হইয়া কেবল শাস্ত্রের অনুশাসন মত শত শত জন্ম চলিলেও জ্ঞান বা মুক্তি হয় না। শাস্ত্র বলিতে আমরা বেদকেই শাসক বলিয়া শীর্ষস্থানীয় শাস্ত্ররূপে পাই। বেদবিরুদ্ধ শাসন আমাদের অনুভব বিরুদ্ধ। সৃষ্টির সময় হইতে বেদই আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত ধর্ম্মের মূল হইয়া আমাদিগকে চালিত করিয়া আসিতেছেন, সেই জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার বেদেই ঘোষিত হইয়াছে ঃ—

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।

তংহ বেদমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষু র্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥

যিনি পিতামহ ব্রহ্মারও সৃষ্টিকর্ত্তা—বেদসংঘের প্রকাশক, আমি মোক্ষাভিলাষে সেই জ্ঞানগম্য ভগবানের শরণ লইতেছি। এই বাক্যে ভক্তিতে মুমুক্ষুরও অধিকার প্রতিপন্ন হইতেছে এবং ঈশ্বরভক্তিই যে সেই মুক্তির সাধক তাহা বলা হইয়াছে ঐরূপ তৈত্তিরীয় সংহিতায়—

ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং।

উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥

পরিপক্ক কাঁকুড় ফল যেমন অনায়াসে বোঁটা হইতে খসিয়া পড়ে—তেমনি সংসার হইতে মুক্তির ইচ্ছুক হইয়া তত্ত্বলাভকাল পর্য্যন্ত- ভগবান্ ত্রিনয়নের পূজা করি।

এই বেদবাক্যদ্বয়ে উপাসনার কথা বলা হইয়াছে এবং ভগবদ্ভক্তি যে মুক্তির কারণ তাহাও দেখান আছে। দর্শনশাস্ত্রেও পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ ও নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ বলিয়া তাঁহাকেই উপাসনা করিবার কথা বলিয়াছেন এবং দর্শনশাস্ত্রকারেরা একটী লৌকিক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বুঝাইয়াছেন যে, মহারাজ যেমন প্রজাদের সুখ দুঃখ বিধানকারী, তেমনি সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী পরমেশ্বরই জীবগণের একমাত্র ঐহিক পারত্রিক ফলদাতা এবং বন্ধন ও মুক্তির প্রভু আছেন, আরও বলিয়াছেন—পিতা যেমন সকল সন্তানের পক্ষে সমান স্নেহবান্ হইলেও ভক্তিমান্ পুত্রের প্রতি স্বতই সমধিক অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তেমনি নিত্যদয়াময় জগৎপিতাও সর্ব্বভূতে সমান অনুকম্পাপ্রবণ থাকিয়াও ভক্তিমান্‌কে বিশেষরূপে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। এখানে যদি কাহারও আপত্তি উঠে কণাদ, গৌতম, বাদরায়ণি প্রভৃতি দর্শনকার মনীষিগণ নিজ নিজ শাস্ত্রে কই ভগবানের উপাসনার কথা তো বলেন নাই? কেবল তাঁহাকে জানিবার তথ্যনিরূপণই করিয়াছেন। তবে দর্শনমতে তাঁহাকে উপাস্য বলিয়া কিরূপে পাই? ইহার উত্তরে ভক্তিসূত্রের ভাষ্যকার ভবদেবভট্ট এই কথাটী বলিয়াছেন—যেমন শাকসব্‌জীর দোকানে হীরক পণ্যরূপে রাখে না, তেমনি কর্ম্মাদিপ্রসারক গ্রন্থে ভক্তির প্রকাশ্য উপদেশ দেন নাই, কেবল অধিকারিভেদে কর্ম্মাদিতে শ্রদ্ধা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। আর মননাদি উপদেশ দিয়া সূক্ষ্মভাবে ভক্তির সূত্রও বলিয়াছেন। কারণ কর্ম্মে অশ্রদ্ধা আসিলে ভক্তিতেও বিরাগ হইবে ভাবিয়া অগ্রে জ্ঞানসাধনের ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থান দেখাইয়া গিয়াছেন।

আরও বলি বেদের জ্ঞানকাণ্ডই ভক্তিকাণ্ড, যেহেতু তাহার প্রথমসূত্র "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা", ইহার অনুকূলে ভগবদ্বাক্য দেখা যায়—

ব্রহ্মভূতঃ প্রশান্তাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥

ভক্তিদ্বারা মানুষের আত্মলাভ হয়, সুতরাং অভ্যাসদ্বারা ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত করা আবশ্যক। ভক্তি অর্জ্জন করিতে হইলে বিদ্যা বা বয়স কিছুরই আবশ্যকতা নাই, এ বিষয় ভক্ত-মুখনিঃসৃত একটী সুমধুর কবিতা আছে যে—

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিম্ নাম রূপমধিকং কিং তৎ সুদাম্নো ধনং।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেঃ কিং নাম তৎ পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ॥

ব্যাধের এমন কি সদাচার ছিল? ধ্রুবেরই বা কি বয়স হইয়াছিল? গজরাজের বিদ্যাই বা কোথায়? কুব্জার কি অপরূপ রূপ ছিল? সুদামের কত ধনই বা ছিল? বিদুরের বংশটা কি এত ভাল? রাজা উগ্রসেনের কি কি পৌরুষ ছিল? তথাপি ভগবান্ যে ইহাদিগকে কৃপা

করিলেন, ইহাতে বুঝা যায় যে ভক্তিপ্রিয় মাধব ভক্তিতেই সন্তুষ্ট হন, ভক্তের গুণের অপেক্ষা রাখেন না।

বরং বেদান্তাদি শাস্ত্রসম্মত ব্রহ্মবিদ্যা অর্জ্জন করিবার পক্ষে সাধনচতুষ্টয় সম্পন্নতার অপেক্ষা আছে, কিন্তু ভক্তি অর্জ্জন করিতে হইলে জাতি, গুণ, ধন, বিদ্যা কিছুরই প্রয়োজন নাই। মনুষ্যজীবনের চরমলক্ষ্য ভগবদ্ভক্তিতে সকলেরই অধিকার। তাঁহাকে যেই ডাকিবার মত ডাকিবে, তিনি তাঁহার প্রতিই কৃপা করিয়া থাকেন।

এক্ষণে জানিতে হইবে কাহার নাম সেই ভক্তি। ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ভজনা—অর্থাৎ উপাসনা বুঝায়, ভগবানকে বড় বলিয়া বুঝিয়া প্রথমে যে ক্রিয়া তাহারই নাম উপাসনা (ফল ও সাধনভেদে দুইপ্রকার ভক্তি)। উপাসনাকেই শাস্ত্রে সাধনভক্তি বলিয়াছেন। এই উপাসনা কতকগুলি অবয়বে পরিপুষ্টা। সেগুলিকে পণ্ডিতেরা গৌণী অর্থাৎ গুণভূত অঙ্গভক্তি অপ্রধানা ভক্তি বলিয়াছেন, সে বিষয় পরে কিছু বলা যাইবে। উপস্থিত সূত্রকার মহর্ষি শাণ্ডিল্য ভক্তিপদের যৌগিকার্থ অনুসরণ না করিয়া যে স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"।

ভগবানের প্রতি অসীম অনুরাগই শ্রেষ্ঠ ভক্তি, অর্থাৎ পরমেশ্বরবিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তি-বিশেষ, কিনা অন্তঃকরণকে ভগবদাকারতাপ্রাপণ, ইহারই নাম পরাভক্তি, ইহাকেই ফলভক্তি-বলে। পূর্ব্বোক্ত অর্চ্চনবন্দনাদিরূপা গৌণীভক্তিকে ইহারই সহায্যকারিণী বলিয়া সাধন-ভক্তি বলে।

নারদপঞ্চরাত্রে ভক্তির স্বরূপনির্দ্দেশ আছে—

ত্যক্ত্বাঽন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥

অন্যের প্রতি মমতা না রাখিয়া কেবল ভগবানে যে প্রীতিসম্বলিত মমতা, তাহাই আদর্শ ভক্ত, ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, ও নারদ মহাশয় ভক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভগবান্ যে ভক্তিমাত্রে লভ্য তৎসপক্ষে শ্রুতি—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈব আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥

এই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকে বেদপাঠে পাওয়া যায়না, মেধায় মিলেনা, অগাধ শাস্ত্রবারিধি-মন্থনেও তিনি দুর্লভ; কেবল তিনি যাহাকে কৃপা করেন, সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে পায়, তাহা-রই নিকট তিনি স্বরূপপ্রকাশ করিয়া থাকেন।

ভগবান্ স্বমুখে বলিয়াছেন—

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া॥

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন !
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥

হে ধনঞ্জয় ! সেই পরমাত্মাকে একমাত্র ভক্তি দ্বারাই মিলাইতে পারা যায়। আরও বলি, আমায় পাইতে হইলে ভাবোপহত বেদপাঠ, দান, তপস্যা বা যাগাদিকার্য্যও কোন উপযোগী হয় না, কেবল ভক্তিবলেই আমাকে জানা এবং স্ব স্বরূপে অবস্থান করা ঘটিয়া থাকে।

বর্ত্তমানে সংসারের পেষণে আমরা এতই মোহিত হইয়াছি যে, তাঁহাকে ডাকিবার অবসর পাই না, আমরা প্রকৃষ্ট জীব হইয়াও সকল বুঝিতে পারিয়াও তাঁহাকে ডাকিবার অবসর করি না, এবং তাঁহাকে ডাকিবার জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা কই আনিতে পারিতেছি ? আমরা বুঝিয়াও বুঝিনা, শুনিয়াও শুনিনা। এই জন্য শিহ্লন কবি শান্তিশতকে বলিয়াছেন—

অজানন্ দাহার্ত্তিং বিশতি:শলভো দীপদহনং
ন মীনোঽপি জ্ঞাত্বা বৃতবড়িশমশ্নাতি পিশিতং।
বিজানন্তোঽপ্যেতান্ বয়মিহ বিপজ্জালজটিলান্
ন মুঞ্চামঃ কামানহহ গহনো মোহমহিমা ॥

পতঙ্গ পোড়ার জ্বালা জানেনা তাই প্রদীপের আগুনে ঝাঁপ দেয়, মৎস্য জানিতে না পারিয়াই বড়্শিযুক্ত মাংসখণ্ড খায়, তাহারা অজ্ঞ জীব, কিন্তু আমরা এত উচ্চ অধিকার পাইয়াছি, অনবরত বিপদের উপর বিপদে পড়িতেছি, দুরন্ত সংসারের পেষণে আমাদের পরিণাম দুস্তর হইতেছে, এ সমুদায় বুঝিয়াও ভোগবাসনা ছাড়িতেছি না, হায় ! মোহের কি অপার মহিমা !

কিন্তু ইহার উত্তরে আমার বিবেচনা হয় (আমি তাদৃশ কর্ম্মী নহি, হইবার আশা রাখি মাত্র) সংসারে থাকিয়া ইহার ঘাতপ্রতিঘাতে অনুক্ষণ বিতাড়িত হইতে থাকিলে আশ্রয়ের অনুসন্ধান আসে, তখন সহজেই এই বিশ্বমাঝে বিশ্বরূপের অনন্তলীলাবিগ্রহ অনুভব করিতে পারি, ব্যাকুলতায় তাঁহাতে প্রাণের টান সহজেই আসিতে পারে বটে, কিন্তু মন চাই— মনই আমাদের সর্ব্বস্ব ; মন যদি আপনাকে ঠিক রাখিল, তবে আর কিসের ভাবনা ? এই জন্যই বলে ————

মন এব সমর্থং স্যান্মনসো দৃঢ়নিগ্রহে।

মনকে সংযত করিতে মন ব্যতীত আর কাহারও সামর্থ্য নাই। সংসারে থাকিয়া সংসারী হইয়াও যে তাঁহাকে পাওয়া যায়, সে বিষয় রাজর্ষি জনক, মহারাজ যযাতি প্রভৃতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সর্ব্বদা যেন তাঁহাকে ডাকিতে পারি, তাঁহার পাদপদ্ম হইতে মন যেন মুহূর্ত্তের জন্য বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়, পাপের জন্য অনুশোচনা আসে, আপনাকে অন্যের দৃষ্টান্তে যেন ভাল করিতে চেষ্টা পাই। সকলের মূলেই মনকে স্থির করা আবশ্যক, তাহা হইলে দুঃখত্রয়ে চিত্ত উদ্বিগ্ন হইবে না, স্বকর্ম্মনিরত থাকিয়া অমৃতাস্বাদন করিতে পারি ; একরূপ যোগী হইতে পারিলেই,

ভক্তি শিখিতে পারিব। নিজেকে ভাল করিবার যেমনি ভাবনা আসিবে, অমনি ঈর্ষা, দ্বেষ, মদ প্রভৃতি দূর হইবে, তখন কর্ত্তব্যপরায়ণ নিষ্কাম কর্ম্মীর সেই কর্ম্মপ্রভাবেই চিত্তের বিশুদ্ধতা আসিবে.ও দর্পণের মত নির্ম্মল অন্তঃকরণে তাঁহার ছায়া দেখিতে পাইব, তখন যদি তাঁহাকে ডাকি অবশ্য সে ডাকে নিজেই আত্মহারা হইব, এইতো শাস্ত্রকথা এইতো সজ্জনের বাক্য।

নিষ্কাম কর্ম্মের অনুশীলন জীবের দুর্ব্বাসনা দুরদৃষ্ট দূর করিয়া দেয়, অধ্যাত্মবিদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ও মহাত্মা রাজর্ষি জনক নিষ্কামকর্ম্মের উপদেশ দিয়া তাহারই অনুসরণ করিয়া সিদ্ধি পাইয়াছেন।

নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে হইলে প্রথমে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করা চাই, দ্বিতীয় কর্ম্ম করিবার কালে অহংতা, কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ চাই,:তৃতীয় ভগবানে অনুক্ষণ প্রীতি রাখা চাই, ইহাই গীতার সার মর্ম্ম।

এবিষয় আচার্য্যেরা নিষ্কাম লঘু লঘু কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন মুখে যে একটী দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন যে—

যেমন কাষ্ঠরাশিদ্বারা প্রজ্জলিত অনল যে অন্ধকারকে ন্য করিতে পারে না, সামান্য দীপ-শিখা তাহা দূর করিয়া দেয়, অথবা যেমন রাশি রাশি কড়ি পাইলেও যে দারিদ্র্য দূর হয় না, তাহা সামান্য একখণ্ড হীরকে বিদূরিত হয়, তেমনি ভাবোপহত সকাম ভূরি ভূরি যাগদানাদি দ্বারা যে অন্তঃকরণের মালিন্য দূর হয় না, তাহা ভাবশুদ্ধি সহকারে সগুণ ব্রহ্মোপাসনাতে নিষ্কাম স্মরণ বন্দনাদি কার্য্যদ্বারা সহজেই বিদূরিত হইয়া থাকে। ইহার উদাহরণ নাচিকেতের তত্ত্বোপদেষ্টা যম নিজে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করিতেন, ইহা শাস্ত্রে পাওয়া যায়; এবং তাহাতে ভক্তি আসিয়া থাকে। ভক্ত যে জ্ঞানী, যোগী ও কর্ম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সালোক্যাদি মুক্তি অপেক্ষা পরাভক্তি যে শ্রেষ্ঠা:তাহাতো বলাই আছে—

অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হি চিৎ স্ম ন ভক্তিযোগং ॥

ইহার অর্থ—মহারাজ! ভগবান্ মুকুন্দকে ভজনা করিলে অর্থাৎ তাঁহার অর্চ্চনাদি গৌণী ভক্তি ব্যবহার করিলে সালোক্যাদি মুক্তিও তিনি দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে কখন লয়াত্মক পরাভক্তি দেন না। অর্থাৎ ঐ ভক্তিযোগ সহজে প্রাপ্য নহে, অনেক সাধনায় মিলান যায়।

ভক্তির সহায়রূপে যেসকল কর্ম্ম করিবার কথা আছে, তাহা নিজের ইচ্ছাপ্রসূত হইলে চলিবে না, শাস্ত্রবিধানমতে কর্ম্ম করিতে হইবে, তৎস্বপক্ষে ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাংগতিং॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ।

পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধে হিন্দুসমাজের কর্ত্তব্য।

পৃথিবীতে হিন্দু, মুসলমান, খৃশ্চান প্রভৃতি নানাধর্ম্মাবলম্বী জাতি আছে, প্রত্যেক জাতিরও বিশিষ্টতা আছে, সেই বিশিষ্টতাটিকে ফুটাইয়া তুলিতে পারিলে সেই জাতির উন্নতিলাভ হয়; আবার সেই বিশিষ্টতার অবনতিতে সেই জাতির অবনতি ঘটে।

ইউরোপের অন্তর্গত ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণ দেশ মেষরাশির অন্তর্গত। মেষরাশি অগ্নিরাশি, এবং মঙ্গলগ্রহ সেই রাশির অধিপতি। মঙ্গলগ্রহ শাস্ত্রানুসারে বিধাতার সেনাপতি, সেই জন্য মঙ্গল-গ্রহের আশ্রিত ইংরাজ ও জার্ম্মাণজাতি যুদ্ধনীতিকে আশ্রয় করিয়া জগতে অন্যান্য জাতির সহিত সংঘর্ষে আপনাদিগের উন্নতিসাধনে বাধ্য হইয়াছে। মেষ ক্রূররাশি,সেই জন্য ঐ দুইজাতির মধ্যে ক্রুরতার পরিচয় পাই। মেষ ওজ, বিষম ও চররাশি; সেই জন্য তাহারা ওজ এবং বিষমগুণ-সম্পন্ন ও সর্ব্বদাই চঞ্চল।

কিন্তু, ভারতের রাশি মকর, বিধাতার পুণ্যভূমি এবং নারায়ণের চরণাশ্রিত; মকর ভূমি-রাশি, এবং সৌম্য, সম ও স্থির রাশি, এজন্য ভারতবাসী সম, সৌম্য ও স্থিরগুণসম্পন্ন। শনিগ্রহ মকরের অধিপতি, শনি একজন কঠোর তপস্বী। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে তিনি সর্ব্বদাই কঠিন তপ-স্যায় দেহ মনঃ সমর্পণ করিয়া দিবারাত্রি অতিবাহিত করিতেন, ব্রহ্মচর্য্যপালনে কোনও রমণীর, এমন কি স্বীয় পত্নীর প্রতি চাহিয়া দেখিবার সময় পর্য্যন্ত তাঁহার ঘটিত না। সেজন্য তাঁহার সাধ্বী পত্নী মনের দুঃখে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "তুমি পতি আমার আরাধ্য দেবতা। তোমার পদপ্রান্তে যদি আমার মতি থাকে, তোমার প্রতি যদি আমার ভক্তি থাকে, আমি বলিতেছি, তাহার বলে তুমি আজ হইতে কাহারও মুখ দর্শন করিতে পাইবে না, তুমি যাহার মুখের প্রতি চাহিবে তাহার মুখ অন্তর্হিত হইবে।" ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ যাহাই থাকুক, ইহাতে ভারতের রাশি মকরের অধিপতি শনির ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যার কথা বিশেষ ভাবে বুঝা যাই-তেছে। আরও বুঝা যাইতেছে যে ভারতের জাতীয়তা ও ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মাচরণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই জন্যই আমাদের হিন্দুজাতির শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মাচরণ দ্বারা নিম্নস্থ অন্যান্য শ্রেণীর সকল হিন্দুকে ধর্ম্মাচরণ শিক্ষাদানের রীতি এদেশে এতকাল চলিয়া আসিতেছে। হিন্দুজাতির প্রত্যেক ব্যক্তি ইহ সংসারে আবির্ভূত হইবার বহুপূর্ব্বে, এমন কি তাহার মাতা পিতা দাম্পত্য-বন্ধনে আবদ্ধ হইবার কালে, অথবা এরূপও বলা চলে যে, আত্মার অমরত্ব প্রথম প্রমাণের যুগে তাহার প্রথমবংশের ধারাপ্রবাহকাল হইতে, কত যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া তাহার ধর্ম্মাচরণের আরম্ভ। ধর্ম্মের এমন অচ্ছেদ্য বন্ধন জগতের আর কোন জাতিতেই পরিলক্ষিত হয় না।

তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে যেমন মকরের অধিপতি শনি, তদ্রূপ কুম্ভরাশিরও অধিপতি শনি। আর এই উভয় রাশিরও অধীন বহুদেশ থাকিতে পারে, তাহাদের কথা কি? সত্য সে কথা, মকরের অধীন ভারতবর্ষ, পাঞ্জাব, গ্রীসের অন্তর্গত থ্রেস্, মাসিডোনিয়া, মোরিয়া প্রভৃতি এবং কুম্ভরাশির অন্তর্গত আরব প্রভৃতি, সে সকলের প্রত্যেকটীর আলোচনা করিতে চেষ্টা করিলে স্থানাভাব ঘটিবে, এবং আমরাও আলোচ্য বিষয় হইতে দূরে যাইয়া পড়িব। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে ঐ সকল দেশের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন ঐ সকল দেশবাসীরা ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিয়া, জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার দ্বারা জগতে এককালে বরেণ্য হইয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে যে যে দেশ স্ব স্ব বিশিষ্টতাদি হারাইয়াছে, তাহাদেরই অধঃপতন ঘটিয়াছে।

যাহা হউক আমাদের আলোচ্য বিষয় ভারতের সহিত সংসৃষ্ট; সেই জন্য অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া ভারতের সম্বন্ধেই বলিব। ভারতবাসীর অস্থি মজ্জায়—মর্ম্মে মর্ম্মে ধর্ম্মকর্ম্ম প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মের স্রোত বা কর্ম্মপ্রবাহিনী দুই দশ পুরুষের শিথিলতায় দুর্ব্বল হইতে পারে, কিন্তু বিলয় প্রাপ্ত হইতে পারে না। মহর্ষি মনু, যে আজ কত শত বা কত সহস্র বর্ষের কথা, ভারতে আবির্ভূত হইয়া ভারতবাসীর জীবনের কর্ম্মপ্রবাহিনীকে ধর্ম্মের পরিখার মধ্য দিয়া সুপরিচালিত করিবার জন্য যে শাস্ত্র—শাসন ব্যবস্থা পরিচালন করিয়া গিয়াছেন, যদি আবার তাঁহার এই ভারতে আর একবার পদার্পণ কল্পনা করা যায়, তবে তিনি এখানে তাঁহার সাধের হিন্দুর জীবনস্রোত দেখিয়া কিছুমাত্র বিস্মিত হইবেন না, কিছুই তেমন নূতন দেখিবেন না। বরং দেখিবেন যে যুগ যুগান্তর পূর্ব্বে তাঁহারই অনুজ্ঞায় পরিচালিত ধর্ম্মের পরিখায় প্রবাহিত সেই একই কর্ম্মস্রোত এখনও হিন্দুর জীবনপ্রবাহে মিশিয়া তেমনই চলিয়াছে, তবে প্রবাহের বেগের শিথিলতা ঘটিয়াছে মাত্র।

কিন্তু, যেখানেই প্রবাহের শিথিলতা, সেখানেই জলজ লতাগুল্মের উৎপত্তির নিশ্চয়তা ঘটে। ফলে শিথিল জাতীয় জীবনে জাতীয় দেহ দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত হয়। আজ সেই দুরারোগ্য রোগ হিন্দু সমাজের সম্মুখে বিকট বদন ব্যাদান করিয়া ভ্রূকুটি ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান।

আজ সেই রাক্ষসী-প্রকৃতিসম্পন্ন পতনশীল রোগের করালগ্রাস হইতে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কয়েকজন তেজস্বী ব্রাহ্মণ-সন্তান দণ্ডায়মান; তাহার ফলে বঙ্গে ব্রাহ্মণসভার উদ্ভব।

সেই ব্রাহ্মণসভা বুঝিয়াছেন যে হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিতে হইলে তাহার জাতীয় বিশিষ্টতাকে রক্ষা করিতে হইবে, সেজন্য হিন্দুসমাজের জীবনস্রোতটিকে আবার যুগযুগান্তরের পরিখার মধ্য দিয়া পূর্ব্বের বেগে প্রবাহিত করা প্রয়োজন। সে প্রয়োজন-সাধন সংকল্পে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সংরক্ষণ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য "ব্রাহ্মণ সমাজ" দেশে প্রকৃত বেদ বেদাঙ্গ সমন্বিত ব্রাহ্মণ সন্তানের যাহাতে উদ্ভব হয়, বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের বিদ্যালয় স্থাপন

পূর্ব্বক যথারীতি কর্ত্তব্য সাধন করিতেছেন। তার পর ব্রাহ্মণসভা বুঝিলেন যে হিন্দুর জীবন-স্রোতকে পূর্ব্ব পরিখায় প্রকৃতভাবে পরিচালিত করিতে হইলে ব্রাহ্মণের দৈনিক জীবনের কর্ম্মসূত্রের সহিত যাহার অতি নিকট সম্বন্ধ, সেই পঞ্জিকার সংস্কার প্রয়োজন। সে জন্য নানা আয়োজন হইতেছে, আমরা নিশ্চিতরূপে বুঝিয়াছি যখন এতদিনের পর রোগের প্রকৃত কারণ অবধারণ করা গিয়াছে, তখন সমাজদেহ সুস্থ হইতে, এবং অতীতের ঋষিগণসমর্থিত অনাদি কর্ম্মস্রোত ভারতে পূর্ব্বের বেগে প্রচলিত হইতে আর অধিক বিলম্ব ঘটিবে না।

বিলম্ব ঘটিবে না সত্য, কিন্তু প্রতিকারকল্পে কি কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সে সকল তথ্য আমরা অবগত নহি, তবে যে সকল কর্ম্মবীর প্রতিকারকল্পে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম শুনিয়া আমরা বুঝিতেছি যে তাঁহাদিগের সাধনা অবিলম্বে সিদ্ধ হইবে, আরও অনুসন্ধানে অবগত হইলাম যে ব্রাহ্মণসভা দ্বার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তথায় বেদ, ব্যাকরণ, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি রীতিমত শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে, কিন্তু পঞ্জিকাসংস্কারের নিতান্ত সহযোগী জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এপর্য্যন্ত হয় নাই। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীনস্থান ভট্টপল্লীর সহিত দেশপূজ্য ব্রাহ্মণসভা বিশেষভাবে সংস্পৃষ্ট, তবে যে কেন এ সম্বন্ধে সভ্যগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই বলিতে পারি না।

তার পর কথা এই যে জ্যোতিষ-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে—অন্ততঃ যে জ্যোতিষবিদ্যা দ্বারা পঞ্জিকাসংস্কার সম্ভবপর হয়, ব্রাহ্মণের ধর্ম্মরক্ষার উপায় হয়, তাহার জন্য এদেশে জাতীয় মান-মন্দির—প্রতিষ্ঠিত হওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, বিনা মান-মন্দিরে কেবল প্রাচীন ঋষিগণের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বিতণ্ডার দ্বারা, অথবা অপর পক্ষের কথামত নাবিক পঞ্জিকার অঙ্ক উঠাইয়া পঞ্জিকাসংস্কার কোন মতেই সম্ভবপর নহে। যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের মনীষীদিগের সমাজে স্থানলাভ করিতে হইলে, যাঁহারা একদা জগৎবাসীর শিক্ষাগুরু ছিলেন তাঁহাদিগের সন্তানগণকে আবার যুগোপযোগী সাধনা অবলম্বন করিতে হইবে; আলস্যের ক্রোড়ে শায়িত থাকিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের কথা উদ্ধৃত করিয়া, অথচ তাঁহাদের মত কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর না হইলে চলিবে না।

কিন্তু মান-মন্দির প্রতিষ্ঠার অন্তরায় স্বল্প নহে। প্রথম কথা ব্রাহ্মণ-সমাজের অর্থাভাব। ব্রাহ্মণ সমাজ যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এপর্য্যন্ত পরিচালিত হইতেছেন, তাহার জন্য আমরা দেশের বরেণ্য গৌরীপুরের রাজর্ষি শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোরের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। অন্যান্য সাহায্য-দাতৃগণের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ সন্দেহ নাই, কিন্তু, দুঃখের সহিত সবিনয়ে আমরা নিবেদন করিতেছি যে, ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রয়োজনীয়তা যেরূপে পুণ্যশ্লোক রাজর্ষি ব্রজেন্দ্র-কিশোরের মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছে, সেরূপে — বঙ্গের ব্রাহ্মণ ভূস্বামীদিগের সকলেরই হৃদয় তত দূর স্পর্শ করিয়াছে, একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। তাহারও কারণ বোধ হয় যে ব্রাহ্মণ-সমাজ হইতে ব্রাহ্মণভূপতিগণের সকলের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণের উপযুক্ত চেষ্টা আজও হয় নাই।

আমরা পঞ্জিকা সংস্কার সম্বন্ধে যাহা প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছি তাহাই বরেণ্য ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে প্রকাশ করিলাম, কর্ত্তব্য নির্ণয় এখন তাঁহাদের বিবেচনাধীন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র সান্যাল চৌধুরী।

কৌলিন্য ও কন্যাদায়।

যুগভেদে সমাজে এক একটা দায় আত্মপ্রকাশ করে। আজকাল আমাদের সমাজে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থসমাজে—কন্যাদায় প্রবল হইয়া পড়িয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এ দায় একেবারেই ছিল না,—আর আজকাল এই দায় সকল দায়কে অতিক্রান্ত করিয়া বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেহে একটা বেদনা বড় হইলে যেমন অন্য ছোট ছোট সমস্ত বেদনা বড় একটা আমলে আইসে না,—এখন কন্যাদায়টা প্রবল হওয়াতে অন্য সব দায় অগ্রাহ্য হইয়া পড়িয়াছে। এখন অশক্তপক্ষে পিতৃমাতৃদায় তিলকাঞ্চনে শেষ করা যায়,—কন্যাদায়ে শক্তাশক্তের বিচার নাই, সেখানে দায়মুক্ত হইতে হইলে দানসাগর ও বৃষোৎসর্গের ব্যাপার করিতেই হইবে। এদিকে দারিদ্র্য কিন্তু সূর্পনখা রাক্ষসীর মত বিরাট বদন বিস্তৃত করিয়া ভদ্রসমাজকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে, তাহার উপর এই কন্যাদায় প্রবল হওয়াতে সর্ব্বনাশ শঙ্কা পলে পলে বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই দায় হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সমাজ আর্ত্তনাদ করিতেছে। কিন্তু এ আর্ত্তনাদ মুমূর্ষুর মৃদু অথচ মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ,—তেজীয়ানের গগনভেদী উচ্চনাদ নহে। যে সমাজদেহ হইতে এই আর্ত্তনাদ বাহির হইতেছে, সেই সমাজ-দেহে যে বিশেষ সংজ্ঞা আছে তাহা নহে,—তাহা অসাড় বেদনার অনুভূতিশূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে, আর সময় সময় বিকারের প্রলাপে কখন হাসিতেছে, কখনও ঝাঁকিতেছে,—কখনও বা ঘুমাইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় স্নেহলতা নাম্নী একটি কিশোরী কন্যা—পিতামাতাকে কন্যাদায় হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য নাটুকেপণা করিয়া আত্মহত্যা করে। তাহার পরই কলিকাতা সহরে এবং বঙ্গের অন্যান্য স্থানে এই আন্দোলনের প্রতিকার কল্পে যেন একটা আন্দোলন উপস্থিত হয়। সে আন্দোলনেও নাটুকে ভাবটা খুব জমাট বাঁধিয়াছিল। অনেক আসরে ও রঙ্গমঞ্চে বক্তারা, সমাজের হিত চিন্তায় যত না হউক, আপন আপন যশ বিস্তারের লালসায়, থিয়েটারী বীরের মত বেশ রংদার করিয়া বড় বড় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা বেশ জমিয়াছিল, হাততালিও পড়িয়াছিল,—কিন্তু কাজ কিছুই হয় নাই। কারণ সে আন্দোলনে কাজ কাহারই কাম্য ছিল না। যদি সমাজের ভাবনা ভাবিবার অধিক

লোক থাকিত, তাহা হইলে আমাদের সমাজের এই দারুণ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইত না,—সামাজিক কোন ব্যাধি উপস্থিত হইলেই তাহার উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করা হইত।

এই কন্যাদায় একটা সামাজিক-ব্যাধি, ব্যাধি মাত্রেরই ধর্ম্ম এই যে উহা যত অধিক দিন স্থায়ী হয়, ততই উহাতে নূতন নূতন জটিলতার আবির্ভাব হয়। সমাজদেহে বহুদিন পূর্ব্বে এই ব্যাধির সঞ্চার হইয়াছে। কন্যাদায় উহার একটা আধুনিক উপসর্গ মাত্র।

রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার স্বরূপ ও নিদান নির্ণয় করিতে হয়। কি রোগ হইয়াছে, এবং কি কারণে সেই রোগের আবির্ভাব হইয়াছে,—তাহা অবধারণ না করিতে পারিলে ঔষধ নির্ব্বাচন বিড়ম্বনা মাত্র। নতুবা সান্নিপাতে যদি আমবাতের ঔষধ দেওয়া হয়, তাহা হইলে রোগী যে আয়ুঃ থাকিতেও মরে, তাহা সকলেই জানেন। স্নেহলতার মরণের পর যে সমস্ত সভা হইয়াছিল, তাহার প্রায় সকল সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে কন্যাদায়ের এই কয়টি কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল ;—

(১) বরকর্ত্তাদের উৎকট অর্থ লালসা।

(২) কন্যার আধিক্য।

(৩) বল্লালী কৌলীন্য।

উহার প্রতিকারের এই কয়টি পন্থা নিগদিত হইয়াছিল।

(১) বরকর্ত্তার অর্থলোভ সংযত করিতে হইবে।

(২) যৌবনান্ত পর্য্যন্ত, এবং আবশ্যক হইলে জীবনান্ত পর্য্যন্ত কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিতে হইবে।

(৩) বল্লালী কৌলীন্য উঠাইতে হইবে।

কেহ কেহ দ্বিতীয় দফার প্রতিকার কল্পে বলিয়াছিলেন,—বহু বিবাহ প্রচলিত করা হউক, সভাক্ষেত্রে বক্তৃতাকালে কোন কোন অসম সাহসিক বক্তা ইঙ্গিতে আভাসে এই কথা বলিয়া ছিলেন,—বৈঠকী মজলিসে কেহ কেহ মুক্তকণ্ঠে এই ব্যবস্থার সমর্থন করিয়াছিলেন।

এখন বিচার্য্য এই রোগনির্ণয় ও ঔষধনির্ব্বাচন ঠিক হইয়াছে কিনা? যদি ঠিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার অনুবর্ত্তনই এই দায় মুক্তির একমাত্র উপায়॥

(১) বরকর্ত্তাদের উৎকট অর্থ লালসাই এই সামাজিক ব্যাধির কারণ, একথা এক হিসাবে সত্য হইতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে জিজ্ঞাস্য এই যে অর্থলালসা নাই কাহার? বরকর্ত্তাদের অর্থলালসা অবশ্য এত অধিক নহে যে তাঁহারা সেই লালসার বশীভূত হইয়া ঘোর গর্হিত কর্ম্ম করিতেছেন। বরকর্ত্তারা ত আমাদেরই সমাজের লোক। আজ যিনি কন্যাকর্ত্তা, কাল তিনিই বরকর্ত্তা হইয়া থাকেন। তবে বরকর্ত্তা হইলে তাঁহার সেই লালসা শতশিখা বিস্তৃত করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে কেন? যেখানে অবাধে লালসা চরিতার্থ করিবার সম্ভাবনা থাকে, সেই খানে লালসা বৃদ্ধি পায়, বরকর্ত্তারা জানেন যে ছেলের বিবাহে তাঁহারা টাকা পাইবেন, তাই তাঁহারা টাকার দাবী করেন, যদি তাঁহাদের সে লালসা চরিতার্থ করিবার

সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা সে লালসা কখনই করিতেন না। পূর্ব্বে শ্রোত্রিয় ও শ্রোত্রিয়ান্ত বংশজের কন্যাকর্ত্তারা অর্থের লালসা করিতেন, এখন তাঁহারা তাহা করেন না। তাঁহারা এখন লালসার দমন করিয়া ত্যাগী পুরুষ হইয়াছেন, একথা বলিতে পারি না। তাঁহাদের লালসা তৃপ্তির সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাঁহারা সংযমী হইয়াছেন।

আধুনিক বরকর্ত্তারা যদি তাঁহাদের লালসা চরিতার্থ করিবার অবসর ও ক্ষেত্র না পান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া সংযত হইতে হইবে। পাইলে এবং পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে এই অর্থপ্রাধান্যের দিনে লোক অর্থ লইবে ও চাহিবে। উহাতে নিষেধ করা বাতুলতা মাত্র। সুতরাং বরকর্ত্তাদিগের প্রতি এই সংযমের সাধু উপদেশ উষরে উপ্ত বীজবৎ সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইবার ষোলআনা সম্ভাবনা।

(২) কন্যার আধিক্যই কন্যাদায়ের দ্বিতীয় কারণ। অর্থাৎ বার্ত্তাশাস্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে কন্যার প্রয়োজন (demand) অপেক্ষা যোগান (Supply) অধিক। এই নিদান নির্ণয় অভ্রান্ত কি না তাহার সন্ধান করা কর্ত্তব্য, আদমসুমারীর হিসাবে দেখা যায় যে বাঙ্গালা দেশে অর্থাৎ পূর্ব্ব এবং পশ্চিম বঙ্গে ব্রাহ্মণের ঘরে ৬ লক্ষ ৪৪ হাজার নর এবং ৫লক্ষ ৬৪ হাজার নারী আছে, অর্থাৎ এদেশে ব্রাহ্মণী অপেক্ষা ব্রাহ্মণ সংখ্যা ৮০ হাজার অধিক। অনেক বিদেশী ব্রাহ্মণ ব্যবসায় উপলক্ষে ও চাকুরী হিসাবে (যথা কনেষ্টবল, দ্বারোয়ান, উড়ে বামুন প্রভৃতি) বঙ্গে প্রবাস করে। তাহাদিগকে হিসাব হইতে বাদ দিতে হইবে। কারণ তাহারা বাঙ্গালার বিবাহের বাজারে বর সাজে না ; দ্বিতীয়তঃ রোগগ্রস্ত, দুর্ণীতিগ্রস্ত, বৈরাগ্যগ্রস্ত ও নিতান্ত দারিদ্র্য প্রভৃতি বিপদ্‌গ্রস্ত বহু যুবক বিবাহ করে না। কিন্তু কন্যার বিবাহ দিতেই হয়। সুতরাং বিবাহের বাজারে ব্রাহ্মণের ঘরে বর অপেক্ষা কনের সংখ্যা অধিক বলিয়াই বোধ হয়।

কন্যার সংখ্যা অধিক হইবার আরও একটা কারণ আছে। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণের ঘরে বিবাহার্থিনী কন্যার বয়স নয় হইতে চৌদ্দ বৎসর হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে বরের বয়স আজকাল ১৯ হইতে ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত হইয়া থাকে ; বরের বয়সের আধিক্য হেতু সংখ্যায় ন্যূনতা হইবেই হইবে। সত্য বটে মেয়ে অপেক্ষা ছেলে অধিক জন্মে, কিন্তু মেয়ে অপেক্ষা ছেলে মরেও অধিক। এ তথ্য সর্ব্ব দেশের পক্ষেই সত্য। এখন কথা হইতেছে, যদি ৯ হইতে ১৪ বৎসরের বালক ও বালিকার সংখ্যা সমানও হয়, তাহা হইলেও সেই ৯ হইতে ১৪ বৎসরের বালকরা যখন ১৯ হইতে ২৪ বৎসরে উন্নীত হয়, তখন তাহাদের মধ্যে অনেক মরিয়া যায়। কাজেই বয়োধিক বরের তুলনায় অল্পবয়স্কা কন্যার সংখ্যা অধিক হইবেই হইবে। আজ কাল অনেকে ছেলের বয়স বেশী করিয়া তাহার বিবাহ দিতে চাহেন। ব্রাহ্মণের মধ্যে ১৮ বৎসরে প্রায় কেহ ছেলের বিবাহ দেন না। বরের বয়স যত অধিক হইবে, ততই তাহারা সংখ্যায় হ্রাস পাইবে। কিন্তু চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে কন্যার বিবাহ সাধ্যপক্ষে সকলেই শেষ করিতে চাহেন ; যাহাদের ঐ বয়সে বর না জুটে, তাহারাই আইবড়

থাকে। কাজেই মোটের উপর বরের সংখ্যা ক'নে অপেক্ষা অনেক কম হইয়া থাকে।

কিন্তু মোটের উপর হিসাব করা বৃথা। ব্রাহ্মণের ভিতর নানা ভাগ ও নানা থাক আছে। প্রথম রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক প্রভৃতি বিভাগ বর্ত্তমান। তাহার পর রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-সমাজে নানা থাক বা পঠি আছে। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে নৈকষ্য কুলীন, ভঙ্গ কুলীন, বংশজ ও শ্রোত্রিয় এই চারিভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে কুলীন ও ভঙ্গগণ ৩৬ মেলে বিভক্ত। বারেন্দ্র সমাজে ও ব্রাহ্মণগণ মুখ্যতঃ কুলীন, কাপ ও শ্রোত্রিয় এই তিন ভাগে বিভক্ত। তাহার উপর কুলীন ও কাপগণ আটটি পঠিতে বিভক্ত। আবার এক একটি পঠিতে তিন চারিটি থাক বা মত বর্ত্তমান। কাজেই আপনাদের মধ্যে শাখাবিভাগে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-মহাশয়দিগের অপেক্ষা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মহোদয়গণ হীন নহেন। এই শাখা প্রশাখাবিভাগে বঙ্গীয়ব্রাহ্মণ সমাজে যে বার রজপুতের তের হাঁড়ির ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে অসুবিধা যথেষ্ট হইয়াছে, সুবিধা কিছুই হয় নাই। ইহাতে পাত্রনির্ব্বাচনের ঘোর অসুবিধা জন্মিয়াছে। কিন্তু এই বিভাগ কোন দিকে কোন সুবিধারই সৃষ্টি করে নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সকল শাখা প্রশাখা অনুসারে আদমসুমারীর হিসাব গণিত হয় না। কাজেই প্রত্যেক বিভাগে, উপবিভাগে, শাখায় এবং প্রশাখায় কন্যাপুত্রের অনুপাত কিরূপ, তাহা বুঝা যায় না। অগত্যা অনুমানের উপর অনেকটা নির্ভর করিয়া বলিতে হয় কোন কোন থাকে বা শাখায় কন্যা অধিক,—কোথাও পুত্র অধিক। যে বিভাগে কন্যার আধিক্য, সেই বিভাগেই হাহাকার।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রোগ-দুর্নীতি দারিদ্র্যবৈরাগ্যগ্রস্ত যুবকরা এখনকার কালে অনেকে বিবাহ করে না। ইহাদের সহিত কেহ কন্যার বিবাহ দিতেও চাহেন না। পূর্ব্বে কিন্তু কুলীনের মধ্যে এই সকল দোষ বিবাহের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইত না। কারণ পূর্ব্বে কুলীনপাত্রগণ বিবাহ স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগের কুলরক্ষা করিলেই কুলীন কন্যাকর্ত্তারা চরিতার্থ হইতেন। সে রোগগ্রস্ত, দুর্নীতিপরায়ণ বা অতিদরিদ্র কি না, তাহা দেখা তাঁহারা আবশ্যক মনে করিতেন না। কারণ কুলরক্ষাই তখনকার কর্ত্তাদের কাম্য ছিল, কন্যার স্বতন্ত্র সংসারধর্ম্ম তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না। কন্যা পিতৃগৃহে বা মাতুল-গৃহেই মানুষ হইত।

এখন সেদিন গিয়াছে। এখন একান্নবর্ত্তী সংসার ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। বিবাহ সম্বন্ধে লোকের রুচির এবং ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। জীবন-সংগ্রাম বৃদ্ধি পাইতেছে, ভগিনী, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী প্রভৃতি প্রতিপালনে লোকের সামর্থ্য নাই, রুচিও নাই। লোক-সমাজে সংযম শিথিল হইয়া পড়িতেছে। পাপবুদ্ধি প্রশ্রয় পাইতেছে। কাজেই লোক রোগ-দুর্নীতিদারিদ্র্যপীড়িত লোকদিগকে কন্যাদান করিতে চাহে না। শিক্ষিত দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন যুবকরাও আর এককালীন একাধিক কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহেন না। এখনও দুই চারিজন বহুবিবাহ করিতেছে,—কিন্তু ইহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতেছে। পূর্ব্বে এক একজন কুলীনের ছেলে বিশ পঁচিশটা বিবাহ করিতেন। কিছুদিন পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের

তাড়পাশা গ্রামের জনৈক কুলীনব্রাহ্মণ এককালীন দেড়শত কন্যার পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নীর দল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যখন পদ্মায় স্নান করিতে যাইতেছিল, তখন পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বহুলোক তাহা দেখিতে আসিয়াছিল। পূর্ব্বে প্রায় অধিকাংশ কুলীন, বিশেষতঃ ভঙ্গ কুলীনরা, অত্যন্ত অধিক বিবাহ করিতেন। ফলে এক এক জন যদি গড়ে দশটি কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন ধরা যায়, তাহা হইলে তখন মেয়ের বাজারে বেজায় টান ধরিত। কাজেই তখন বংশজ, শ্রোত্রিয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণের বিবাহ করা কঠিন হইয়াছিল। শ্রোত্রিয়, বংশজ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ বিবাহের জন্য কন্যা পাইতেন না। হাজার বার শত টাকা পণ দিয়া তখন অনেক ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিতে হইত। যাহারা গরিব তাহাদের অনেকের বিবাহ হইত না। বিবাহের অভাবে অনেক শ্রোত্রিয়, বংশজ এবং তিন পুরুষিয়ার অধিক ভঙ্গকুলীনের বংশ লোপ পাইয়াছে। যে সময় এই বহু বিবাহ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সময় হইতে এই সামাজিক ব্যাধির উদ্ভব হইয়াছে। যত দিন বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল, ততদিন শ্রোত্রিয় বংশজের বিবাহ কিরূপ হইত, তাহার আলোচনা করিব না। সমাজের সেই ব্যাধিই এখন কন্যাদায়রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বহু বিবাহ উঠিয়াগিয়াছে, কিন্তু ব্যাধির মূল কারণ বিনষ্ট হয় নাই। সেই জন্যই ঐ দোষ ঘটিতেছে। আমি সঙ্ক্ষেপে এই স্থলে সেই মূল কারণের আলোচনা করিব।

এই ব্যাধির মূল কারণ শাস্ত্রবাক্যে অবহেলা—আর্ষ অনুশাসনের উল্লঙ্ঘন। আমার বিশ্বাস, মানুষ যত বড় পণ্ডিত ও প্রতিভাশালী হউন না কেন, তিনি যদি শাস্ত্রনির্দ্দেশ লঙ্ঘন করিয়া কোন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা হইলে সেই ব্যবস্থা হিন্দু সমাজের পক্ষে পরিণামে অহিতকরই হইবে। সমস্ত শাস্ত্র একবাক্যে বলিয়াছেন যে বিদ্বান ও চরিত্রবান্ পাত্রকেই কন্যা দান করিবে। বৌধায়ন স্মৃতি হইতে মহানির্ব্বাণতন্ত্র পর্য্যন্ত সমস্ত শাস্ত্রই এই অনুশাসন করিয়া গিয়াছেন। বল্লাল সেন যখন কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া ছিলেন,—তখনও তিনি শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই ঐ ব্যবস্থার প্রণয়ন করেন। ব্রাহ্মণ-বংশে যদি ব্রাত্যত্ব বা পাতিত্য না ঘটে, তাহা হইলে সেই বংশই প্রশস্ত বংশ। সেইরূপ ব্রাহ্মণ-বংশে গুণবান স্বধর্ম্মনিষ্ঠ যুবককে কন্যা দান করাই শাস্ত্রের আদেশ। যত দিন সেই আর্ষ ব্যবস্থা প্রতিপালিত হইয়াছিল, ততদিন কোন গোল ঘটে নাই। কিন্তু যখন লোক ত্রিকালদর্শী ঋষিদিগের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়া অন্যরূপ ব্যবস্থা করিল, যখন হইতে যথার্থ শ্রুতিশীল বিজ্ঞ প্রার্থী বরকে কন্যা না দিয়া মূর্খ, পাষণ্ড, অধর্ম্মাচারী, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ব্যক্তিদিগকে কন্যাদান করা শ্লাঘনীয় মনে করিতে আরম্ভ করিল, তখন হইতেই সমাজে এই ব্যাধির বীজ সঞ্চারিত হইতে আরব্ধ হইয়াছে। পৃথিবীর যখন যেখানে যে সমাজে নির্গুণ গুণীর অপেক্ষা অধিক সম্মান পাইয়া থাকে, সেই সমাজেই নানা দোষ নানা ভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

পাঠক জানেন—রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সমাজে কুলীন বর শ্রোত্রিয়ের কন্যা বিবাহ করিতে

পারেন, কিন্তু কুলীন শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান করিতে পারেন না। শ্রোত্রিয়গণ সামাজিক সম্মানের লোভে নিজের থাকের শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, শীলসম্পন্ন, জ্ঞানী, অকৃতদার কন্যাপ্রার্থী পাত্রকে উপেক্ষা করিয়া যখন কুলীন নামধেয় কৌলীন্যাভিমানী, বিদ্যাবিনয়বিহীন দুঃশীল পাত্রকে কন্যা দিতে লাগিলেন, তখনই সমাজদেহে এই ব্যাধির সঞ্চার হইয়াছে, কারণ নৈকষ্য কুলীনদিগের মধ্যে শ্রোত্রিয়ের অনেক কন্যা আসিতেছে, কিন্তু কুলীনের কন্যা শ্রোত্রিয়ের ঘরে যায় না। সুতরাং কুলীন সমাজে বর অপেক্ষা কন্যা অত্যন্ত অধিক হয়। মনে করুন রাঢ়ীয় ফুলিয়া মেলের নৈকষ্য কুলীনদিগের মধ্যে বিবাহযোগ্য একশত পাত্র ও একশত পাঁচটী পাত্রী আছে। যদি কেবল উহাদের পরস্পর বিবাহ হইত, তাহা হইলে ঐ মেলে বিশেষ পাত্রাভাব হইত না; কারণ পুরুষদের দারান্তরগ্রহণে কন্থার স্বল্পাধিক্য কাটিয়া যাইত। কিন্তু শ্রোত্রিয় কন্যার আগমনেই বিশেষ গোল ঘটে। মনে করুন ঐ একশত পাত্রের মধ্যে বিশজন পাত্র শ্রোত্রিয়ের কন্যা বিবাহ করিল। অবশিষ্ট থাকিল ৮০টি পাত্র, আর ১০৫টি কন্যা, তন্মধ্যে আবার পাঁচটি পাত্র কুলভঙ্গ করিয়া অর্থলোভে বংশজের কন্যা বিবাহ করিল। ব্যাধিগ্রস্ত, বৈরাগ্যগ্রস্ত প্রভৃতি কারণে ১০জন বিবাহ করিল না। সুতরাং পাত্র সংখ্যা হইল ৬৫টি আর স্বঘরের কন্যা ১০৫টি। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ ৬৫টি পাত্র যদি বহু বিবাহ না করে, তাহা হইলে আর কুলীনের কুলমান থাকে না। কাজেই কুলীনের কুলরক্ষার্থ সমাজের পক্ষে কুলীনের পক্ষে বহু বিবাহের প্রবর্ত্তন প্রয়োজন হয়। বৌধায়ন বলিয়াছেন--

শ্রুতশীলিনে বিজ্ঞায় ব্রহ্মচারিণেঽর্থিনে দেয়া।

"অধীতবেদ, শীলবান, বিজ্ঞ অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্য প্রার্থী পাত্রকে কন্যা দিবে।" যখন এই শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করিয়া সমাজ অযোগ্য পাত্রে কন্যা দান করা গৌরবজনক মনে করিল তখন হইতেই সমাজদেহে এই বিষম ব্যাধিবিষ প্রবেশ করিল।

বল্লালসেন যখন কুলীনের নবগুণ লক্ষণ প্রকাশ করেন,—তখনও সমাজে বহু বিবাহ প্রবর্ত্তিত হয় নাই। লক্ষ্মণসেন যখন প্রতিগ্রাহীদলকে জাতিতে ঠেলিলেন,—এবং যখন ছয়জন কুলীন সন্তান প্রতিগ্রাহী দলের কন্যা বিবাহ করার জন্য কুল হারাইয়া অরি হইলেন,— যখন নবগুণের মধ্যে 'নিষ্ঠাশান্তিস্তপোদানম্' স্থানে 'নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানম্' লিখিত হইল,— তখনই সমাজদেহে এই ব্যাধির বীজ উপ্ত হইল। লোক সর্ব্বগুণত্যাগ করিয়া আবৃত্তিকেই কৌলীন্য লক্ষণের মধ্যে বড় করিয়া তুলিল। প্রথমে ঐ বিষয়ে সকলে বিশেষ অবহিত হন নাই। শেষে পূর্ব্ববঙ্গে দণৌজা-মাধবের সভায় কৌলীন্য ব্যবস্থার পুনঃসংস্কার হয়। তাহাতে আদানপ্রদানের বন্ধনটি অধিকতর দৃঢ় করা হয়। তাহার পর মুসলমান রাজত্বকালে কিছুদিন বিশেষ কিছুই হয় নাই।

ক্রমে দশপুরুষ গত হইল। ব্রাহ্মণসমাজে আদানপ্রদানে অনেক দোষ ঘটিল। ফলে আবৃত্তি বা আদানপ্রদানটি তখন কুলীনগণ-কর্ত্তৃক মান্য হইত না। এই সময় রাঢ়ীয়-শ্রেণীর দেবীবর বিশারদ নামক স্বনামধন্য ঘটক, তাঁহার মাসতুতো ভাই যোগেশ্বর পণ্ডিতের

উপর ক্রোধবশতঃ তাঁহাকে "শায়েস্তা" করিবার জন্য কুলীনদিগের দোষ উদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হন। তখন হীনকুলে আদানপ্রদান সমান কুলনাশক ছিল। দেবীবর দেখাইলেন কোনও কুলীনেরই কুল নাই। আদানপ্রদানে সবাই নিষ্কুল। তাই তিনি কুলীনরক্ষার্থ এক এক দোষ অনুসারে এক এক মেলের সৃষ্টি করেন। তিনি বলিলেন—'দোষো যত্র কুলং তত্র' "দোষ যার কুল তার। যোগেশ্বর দেবীবরের আনুগত্য স্বীকার করিয়া "তদা যোগেশ্বরেঽকুলম্" এই বাক্যের মধ্যে একটা লুপ্ত অকার প্রবিষ্ট করাইয়া নিজের কুল বাঁচাইলেন।

দেবীবর আচার, বিনয় প্রভৃতি আটটি শাস্ত্রসম্মত ব্রাহ্মণ্যগুণ ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আবৃত্তিকেই কৌলীন্যের লক্ষণ স্থির করিলেন এবং মেলবন্ধন দ্বারা দোষগুলিকে স্বল্প স্থানে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু ছিল, কিন্তু উপায় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তিনি নিজের ইচ্ছামত কতকগুলি লোককে কুলীন এবং কতকগুলিকে নিষ্কুল করেন। গৌন কুলীনদিগকে তিনি শ্রোত্রিয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। শোভাকর চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক নিষ্ঠাবান্ কুলীন তাঁহার গুরু ছিলেন। দেবীবর নিতান্ত গায়ের জোরে তাঁহাকে নিষ্কুল করেন। সেই সময়ে কতকগুলি ধনাঢ্য পদস্থ কুলীন দেবীবরের অনুশাসন মানিতে চাহেন নাই,—অনেকে তাঁহার সভায় আসেন নাই। দেবীবর ঘটকের গ্রন্থ হইতে তাঁহাদিগের নাম বাদ দিলেন। ইঁহারা "দেবীবর ছাঁটা বংশজ" নামে অভিহিত হইলেন।

দেবীবর যে ব্যবস্থা করিয়া গেলেন, —তাহা অধিক দিন চলিল না। কাজেই অনেকের কুলভঙ্গ হইতে লাগিল। তখন কুলভঙ্গ হইলে লোক নিষ্কুল হইত। নিষ্কুলরা ঘটকদিগের কোন ধার ধারিতেন না। বহুলোক নিষ্কুল হইতে লাগিল দেখিয়া কুলাচার্য্যগণ প্রমাদ গণিলেন। অবশেষে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বড়িশার সাবর্ণচৌধুরীদিগের পূর্ব্বপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার মহাশয়ের আমলে ঘটকগণ সাব্যস্ত করিলেন যে রাঢ়ীয় কুলীনের কুলভঙ্গে একেবারে কুল যাইবে না, তাহাদের আট আনা রকম কুল থাকিবে। আবৃত্তি বিষয়ে তাহারা অর্দ্ধেক স্বাধীনতা পাইবে। আবৃত্তি অর্থে আদান ও প্রদান। কন্যা গ্রহণ আদান, কন্যাদান প্রদান। ভঙ্গ কুলীনেরা বংশজের ন্যায় যথাতথা হইতে কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন,—কিন্তু প্রদানে তাঁহাদিগকে পাঁচপুরুষ সাবধান থাকিতে হইবে। পাঁচপুরুষ পরে তাঁহাদিগকে বংশজ হইতে হইবে। এই সময়ে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে ভঙ্গ কুলীন নামক এক থাকের উৎপাত হয়। বারেন্দ্র-সমাজে, কায়স্থ-সমাজে বা অন্য কোন সমাজে ভঙ্গ কুলীন নাই। দেবীবরের "কুলধ্বংসে কুলং নাস্তি" এই নিয়ম সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাঢ়ীয়-ব্রাহ্মণ সমাজে পরিত্যক্ত হয়।

এদিকে ঐ সময় নানা দোষে তখন বহু কুলীনের কুল ভঙ্গ হইয়াছে। কুলীনের সংখ্যা অনেক কমিয়া যায়। যোগেশ্বরের সাত পুত্রের মধ্যে প্রথম পুত্র শঙ্কর ও পঞ্চম পুত্র জানকী-নাথ কুলীন থাকেন, অবশিষ্ট পাঁচজন নিষ্কুল হইয়াছেন,—কেহ দোষযুক্ত হইয়া যোগেযাগে

অন্ত মেনে গিয়াছেন। সকল বংশেই ঐরূপ হইয়াছে। ঘটকরা দেখিলেন আবৃত্তির কসাকসিতে কুল রাখা দায়। তখন দেবীবর যে "পঞ্চবিংশতি দোষাশ্চ নিশ্চিতাঃ কুলঘাতকাঃ" বলিয়াছিলেন,—তাহা তাঁহারা নিন্দিত এবং কুলের দোষকর মাত্র বলিয়া গণ্য করিলেন; কুলনাশকর বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না বলিয়া ফতোয়া দিলেন। অনেক বংশজকে শ্রোত্রিয় করিয়া ইহারা কয়েকজন নষ্ট কুলীনের কুলরক্ষা করিলেন।

কুলীনের সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পাইল দেখিয়া ঘটকরা কুলীন বৃদ্ধির জন্য বহু বিবাহ ব্যবস্থা দিলেন। সাব্যস্ত হইল কুমারী অবস্থায় কন্যা কুলত্যাগিনী হইলে পিতার কুল নষ্ট হইবে সত্য, কিন্তু বিবাহিতা নারী কুলত্যাগিনী হইলে কাহারও কুল যাইবে না। শাস্ত্রানুসারে পতি পত্নীর পাপের অংশীদার হইলেও কুলত্যাগিনী পত্নীর পতির কুল, উজ্জ্বল না হউক, অক্ষুণ্ণ থাকিবে এইই বিধান হইল।

পূর্ব্বেই সাব্যস্ত হয় যে যাহারা উচ্চ কুলীনে কন্যাদান করিবে, তাহাদের বংশ সমুজ্জ্বল হইবে। এই সময় সাব্যস্ত হয় যে স্বকৃতভঙ্গ কুলীনকে কন্যা দিলে পচা বংশজেরও কুলের জৌলুস বাড়িবে। কাজেই এই সময় স্বকৃতভঙ্গ ও তাহার পুত্রকে কন্যা দিবার জন্য বংশজ প্রভৃতি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এক একজন স্বকৃতভঙ্গ ও স্বকৃতভঙ্গের পুত্র একশত দেড়শত বিবাহ করিতে লাগিলেন। কাজেই উচ্চ স্তরের ভাঙ্গা কুলীনের ঘরে নিম্ন স্তরের ভাঙ্গা কুলীনের বংশজের এবং কিছু শ্রোত্রিয়ের কন্যা পড়িতে লাগিল। ভঙ্গ কুলীনদিগের মধ্যে বহুবিবাহের বন্যা নামিল। নৈকষ্য কুলীনের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে কতকটা বহুবিবাহ ছিল, এই সময় ভঙ্গ কুলীনের আদর্শে তাহাও বৃদ্ধি পাইল। ফলে নিম্নশ্রেণীর ভঙ্গ কুলীন, বংশজ ও শ্রোত্রিয়দিগের পুত্রের জন্য পাত্রী মেলা কঠিন হইল। বিবাহের অভাবে অনেক শ্রোত্রিয় এবং বংশজের বংশলোপ ঘটিতে লাগিল। ব্রাহ্মণসমাজের ঘোর সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

নবদ্বীপসমাজ-সম্মিলিত বঙ্গীয়ব্রাহ্মণসভাপরিগৃহীত ১৮৩৯ শকাব্দীয় উপাধি ও পূর্ব্বপরীক্ষার ফল, বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণের নাম ও বৃত্তির পরিমাণ।

ছাত্র	বৃত্তি	অধ্যাপক	চতুষ্পাঠী	বিষয়	বিভাগ
শ্রীদেবনারায়ণ ঠাকুর	১২৲	শ্রীউপাধ্যায় ঝা	বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয়	জ্যোতিষ উপাধি	১ম বিভাগ
শ্রীশক্তিনাথ ঝা	০	ঐ	ঐ	ঐ	২য় "
শ্রীবাসুদেব দ্বিবেদী	১০৲	শ্রীচন্দ্রিকাদত্ত মিশ্র	সাঙ্গবেদবিদ্যালয়, ব্রাহ্মণ-সভা	পুরাণ উপাধি	১ম "
শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত	১০৲	শ্রীনবীনচন্দ্র তর্করত্ন	মূলগ্রাম, ফরিদপুর	কাব্য উপাধি	১ম "
শ্রীপ্রয়াগ মিশ্র	০	শ্রীরঘুবীর ত্রিবেদী	বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয়	ঐ	২য় "
শ্রীসিদ্ধিনাথ মিশ্র	১০৲	শ্রীচন্দ্রিকাদত্ত মিশ্র	সাঙ্গবেদবিদ্যালয়, ব্রাহ্মণ-সভা	ব্যাকরণ উপাধি	১ম "
শ্রীজয়নারায়ণ মিশ্র	০	ঐ	ঐ	ঐ	২য় "
শ্রীরামবদন পাণ্ডে	০	শ্রীযোগী ঝা	বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয়	ঐ	২য় "
শ্রীরামেশ্বর ঝা	০	ঐ	ঐ	ঐ	২য় "
শ্রীঅনুপলাল শর্ম্মা	৫৲	ঐ	ঐ	সামবেদ পূর্ব্ব	২য় "
শ্রীশ্রীপতি ঝা	৭৲	শ্রীউপাধ্যায় ঝা	ঐ	জ্যোতিষ পূর্ব্ব	১ম "
শ্রীউমাকান্ত মিশ্র	৬৲	শ্রীদেবীচরণ ত্রিবেদী	বড়বাজার, চিনিপটী বেদবিদ্যালয়	ঐ	১ম "
শ্রীচিন্তামণি ঝা	০	ঐ	ঐ	ঐ	১ম "
শ্রীসদানন্দ ঝা	০	শ্রীউপাধ্যায় ঝা	বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয়	ঐ	২য় "
শ্রীবিশ্বনাথ মিশ্র	০	ঐ	ঐ	ঐ	২য় "
শ্রীপ্রমোদবনবিহারিশরণ ঝা	৬৲	শ্রীযোগী ঝা	ঐ	পুরাণ পূর্ব্ব	১ম "
শ্রীহরিপদ ভট্টাচর্য্য	০	শ্রীরমানাথ বিদ্যাভূষণ	গড়গ্রামটোল, মেদিনীপুর	ঐ	২য় "
শ্রীগদাধর ভট্টাচার্য্য	৬৲	শ্রীহরিপদ সামাধ্যায়ী	রঙ্কিণীটোল, মেদিনীপুর	কর্ম্মকাণ্ড পূর্ব্ব	১ম "
শ্রীগিরীশচন্দ্র উত্থাশনী	৬৲	শ্রীগোপালচন্দ্র বেদকাব্যতীর্থ—	অশ্বত্থতলা, মেদিনীপুর	ঐ	১ম "
শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র চক্রচর্ত্তী	০	ঐ	ঐ	ঐ	২য়

ছাত্র	বৃত্তি	অধ্যাপক	চতুষ্পাঠী	বিষয়	বিভাগ
শ্রীভূতনাথ ভট্টাচার্য্য	০	শ্রীগোপালচন্দ্র বেদকাব্যতীর্থ	অশ্বত্থতলা, মেদিনীপুর	কর্ম্মকাণ্ডপূর্ব্ব	২য় „
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ পাণ্ডা	৬৲	শ্রীভূতনাথ মিশ্র কাব্যতীর্থ	লাক্ষী, মেদিনীপুর	কাব্য পূর্ব্ব	১ম „
শ্রীরত্নেশ্বর পাণ্ডা	৫৲	ঐ	ঐ	ঐ	১ম „
শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ পাণ্ডা	০	ঐ	ঐ	ঐ	১ম „
শ্রীসিদ্ধিনাথ ওঝা	০	শ্রীচন্দ্রিকাদত্ত মিশ্র	সাঙ্গবেদবিদ্যালয়, ব্রাহ্মণসভা	ঐ	১ম „
শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা	০	শ্রীরঘুবীর ত্রিবেদী	বিশুদ্ধানন্দবিদ্যালয়	ঐ	১ম „
শ্রীব্রজলাল মিশ্র	০	শ্রীযোগী ঝা	ঐ	ঐ	২য় „
শ্রীমোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী	৮৲	শ্রীগোপালচন্দ্র বেদকাব্যতীর্থ	অশ্বত্থতলা, মেদিনীপুর	ব্যাকরণ পূর্ব্ব	১ম „
শ্রীগিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৭৲	ঐ	ঐ	ঐ	১ম „
শ্রীঅন্নদাচরণ উত্থাশনী	৫৲	ঐ	ঐ	ঐ	১ম „
শ্রীরজনীকান্ত পাণ্ডা	০	শ্রীভূতনাথ মিশ্র কাব্যতীর্থ	লাক্ষী মেদিনীপুর	ঐ	১ম „
শ্রীসুরেশ দ্বিবেদী	০	শ্রীচন্দ্রিকাদত্ত মিশ্র	সাঙ্গবেদবিদ্যালয়, ব্রাহ্মণসভা	ঐ	১ম „
শ্রীঅনন্তদেব উত্থাশনী	০	শ্রীগোপালচন্দ্র বেদকাব্যতীর্থ	অশ্বত্থতলা, মেদিনীপুর	ঐ	১ম „
শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	০	ঐ	ঐ	ঐ	১ম „
শ্রীগুপ্তেশ্বরনাথ মিশ্র	০	শ্রীরঘুবীর ত্রিবেদী	বিশুদ্ধানন্দবিদ্যালয়	ঐ	২য় „
শ্রীরাধারমণ চট্টোপাধ্যায়	০	শ্রীচন্দ্রিকাদত্ত মিশ্র	সাঙ্গবেদবিদ্যালয়, ব্রাহ্মণসভা	ঐ	২য় „
শ্রীরমাবিলাস ভট্টাচার্য্য	০	ঐ	ঐ	ঐ	২য় „
শ্রীঅঘোরচন্দ্র আচার্য্য	০	শ্রীভূতনাথ মিশ্র কাব্যতীর্থ	লাক্ষী, মেদিনীপুর	ঐ	২য় „
শ্রীভৃগুনাথ ত্রিপাঠী	০	ঐ	ঐ	ঐ	২য় „
শ্রীহরিসাধন ভট্টাচার্য্য	০	শ্রীচন্দ্রিকাদত্ত মিশ্র	সাঙ্গবেদবিদ্যালয়, ব্রাহ্মণসভা	ঐ	২য় „
শ্রীরঘুনাথ পাণ্ডা	০	শ্রীভূতনাথ মিশ্র কাব্যতীর্থ	লাক্ষী, মেদিনীপুর	ঐ	২য় „
শ্রীরামপ্রবেশ মিশ্র	০	শ্রীচন্দ্রিকাদত্ত মিশ্র	সাঙ্গবেদবিদ্যালয়, ব্রাহ্মণসভা	ঐ	২য় „
শ্রীনন্দলাল পাণ্ডেয়	০	শ্রীরঘুবীর ত্রিবেদী	বিশুদ্ধানন্দবিদ্যালয়	ঐ	২য় „

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা পরিগৃহীত ১৮৩৯ শকাব্দীয় উপাধি ও পূর্ব্ব পরীক্ষায় অধ্যাপক বৃত্তি।

উপাধি পরীক্ষায়—

১।	শ্রীযোগী ঝা	বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয়, কলিকাতা	১২৲
২।	শ্রীউপাধ্যায় ঝা	ঐ	১০৲
৩।	শ্রীরঘুবীর ত্রিবেদী	ঐ	৮৲
৪।	শ্রীচন্দ্রিকাদত্ত মিশ্র	সাঙ্গবেদবিদ্যালয়, ব্রাহ্মণ-সভা কলিকাতা	১০৲

পূর্ব্ব পরীক্ষায়—

১।	শ্রীগোপালচন্দ্র বেদকাব্যতীর্থ	অশ্বত্থতলা, মেদিনীপুর	১০৲
২।	শ্রীচান্দ্রিকাদত্ত মিশ্র	সাঙ্গবেদবিদ্যালয়, ব্রাহ্মণ-সভা কলিকাতা	১২৲
৩।	শ্রীভূতনাথ মিশ্র কাব্যতীর্থ	লাক্ষী, মেদিনীপুর	৮৲
৪।	শ্রীযোগী ঝাঁ	বিশুদ্ধানন্দবিদ্যালয়, কলিকাতা	৭৲
৫।	শ্রীরঘুবীর ত্রিবেদী	ঐ	৬৲
৬।	শ্রীদেবীচরণ ত্রিবেদী	বড়বাজার, চিনিপটী বেদবিদ্যালয়	৫৲

পরীক্ষক বৃত্তি।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ, সংস্কৃত কলেজ কলিকাতা		৩৲
„ লক্ষ্মণ শাস্ত্রী	ঐ	৫৲
শ্রীরাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ	ঐ	৩৲
শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন,	ভাটপাড়া	৪৲
শ্রীজগদ্দুর্ল্লভ স্মৃতিতীর্থ	ঐ	৮৲
শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ	ঐ	৩৲
শ্রীশরচ্চন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, পটোলডাঙ্গা কলিকাতা		৮৲
শ্রীরমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ, চাঁপাতলা কলিকাতা		৩৲
শ্রীকেদারনাথ, সাংখ্যতীর্থ, বঙ্গীয়ব্রাহ্মণ-সভা কলিকাতা		৩৲
শ্রীদুর্গাসুন্দর স্মৃতিরত্ন	ঐ	৩৲

সংবাদ।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার প্রচারক শ্রীযুক্ত তরঙ্গবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে নিম্নলিখিত শাখাসভাগুলি স্থাপিত হইয়াছে।

১। খান্দারপাড়া শাখা সভা—সভাপতি ৺ ব্রহ্মণ্যদেব, সহসভাপতি শ্রীযুক্ত বনমালী চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার, কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন ঘটক, হিসাব-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত রসিকলাল চক্রবর্ত্তী, ধর্ম্মব্যবস্থাপক শ্রীযুক্ত বনমালী তর্কতীর্থ।

২। দুলালী শাখা সভা—সভাপতি ৺ ব্রহ্মণ্যদেব, সহসভাপতি শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, হিসাব পরীক্ষক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ধর্ম্মব্যবস্থাপক শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ শিরোমণি।

৩। কামারগ্রাম শেখরসোতাশী শাখাসভা—সভাপতি ৺ ব্রহ্মণ্যদেব, সহসভাপতি শ্রীযুক্ত জয়গোপাল ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়, হিসাবপরীক্ষক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ধর্ম্মব্যবস্থাপক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র কাব্যতীর্থ ও শ্রীযুক্ত তারকনাথ কাব্যতীর্থ।

৪। হরিদাসপুর পিঙ্গলিয়াশাখাসভা—সভাপতি ৺ ব্রহ্মণ্যদেব, সহসভাপতি শ্রীযুক্ত ভবদেব ভট্টাচার্য্য বি, এ, সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রবলচন্দ্র ঘটক, হিসাব পরীক্ষক শ্রীযুক্ত ভবনাথ ভট্টাচার্য্য, ধর্ম্মব্যবস্থাপক শ্রীযুক্ত শশধর বিদ্যাভূষণ।

৫। টগরবন্দ তিতুরকান্দী—সভাপতি ৺ ব্রহ্মণ্যদেব, সহসভাপতি শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কাঞ্জিলাল, কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হিসাব পরীক্ষক শ্রীযুক্ত সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, ধর্ম্মব্যবস্থাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বেদান্তবিশারদ ও শ্রীযুক্ত যদুনাথ কাব্যতীর্থ।

টোল সংস্থাপন।

গত পৌষ মাসে মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচথুপী গ্রামে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর অধিকারী এম,এ, মহাশয়ের যত্নে একটী টোল সংস্থাপিত হইয়াছে, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ নিষ্ঠাবান্ অধ্যাপক দ্বারা এই টোল পরিচালিত। কৃষ্ণকিশোরবাবু উক্ত গ্রামে তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মৃতিরক্ষা জন্য একটী উচ্চ ইংরাজীবিদ্যালয় স্থাপন ও তাহার গৃহাদি পাকা করিয়া দিয়াছেন। আমরা আশা করি শীঘ্রই এই টোলবাড়ী এবারে পাকা করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও এই টোলের উন্নতির জন্য যত্ন করিতেছেন। কায়স্থ-সমাজের নেতা ধার্ম্মিকপ্রবর জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণানন্দ রায় ঘোষ মহাশয়ও এই বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন, এই সকল সৎকর্ম্ম প্রবর্ত্তনকারিগণ দীর্ঘজীবন লাভ করুন, ভগবানের নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করি।

ব্রাহ্মণ-সমাজের নিয়মাবলী।

১। বর্ষগণনা—১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্বিন হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত বৎসর পরিগণিত হইয়া থাকে। ১৩২৪ সালের বর্ত্তমান আশ্বিন হইতে ইহার ষষ্ঠ বর্ষ চলিতেছে।

২। মূল্য—ব্রাহ্মণ-সমাজের বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র দুই টাকা। ভিঃ পিঃ ডাকে লইতে হইলে দুই টাকা দুই আনা লাগিবে। স্বতন্ত্র ডাকমাশুল লাগিবে না। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। ব্রাহ্মণ-সমাজের মূল্য অগ্রিম দেয়। বৎসরের কোন ভগ্নাংশের জন্য গ্রাহক গৃহীত হয় না। বৎসরের যে মাসেই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আশ্বিন হইতেই তাঁহার বার্ষিক চাঁদার হিসাব চলিবে।

৩। পত্রপ্রাপ্তি—ব্রাহ্মণ-সমাজ বাঙ্গলা মাসের শেষ তারিখে প্রকাশিত হইয়া থাকে কোনও গ্রাহক পর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে ব্রাহ্মণ-সমাজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া সেই মাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। না জানাইলে পরে তাঁহাদের ক্ষতি পূরণ করা কঠিন হইবে।

৪। ঠিকানা পরিবর্ত্তন—গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া—তাঁহাদের নাম ধাম পোষ্ট-অফিস ইত্যাদি যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কিম্বা অন্য প্রয়োজনে চিঠিপত্র লিখিলে অনুগ্রহ করিয়া সর্ব্বদা নিজের গ্রাহক নম্বরটী লিখিয়া দিবেন।

৫। চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি—"ব্রাহ্মণ-সমাজে" কোনও প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইলে লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। আর সর্ব্বদাই কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। ব্রাহ্মণ-সমাজ-সম্পাদক প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইবার ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম। চিঠিপত্র বা প্রবন্ধ এসমস্তই সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদকের নামে ৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। টাকাকড়ি—৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ব্রাহ্মণসভার কার্য্যালয়ে ব্রাহ্মণসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

বিদেশীয় গ্রাহকগণকেও টাকার রসিদ দেওয়া হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ২য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনের হার মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ৩য় পৃষ্ঠা ও পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠার সম্মুখস্থ পৃষ্ঠা ৪৲ চারি টাকা হিসাবে লওয়া হয়। অন্য পেজ ৩৲ তিন টাকা—বার্ষিক স্বতন্ত্র।

২। তিন মাসের কম সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। তিন মাসের মধ্যে বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তিত হয় না।

৩। বিজ্ঞাপনের মূল্যের অর্দ্ধেক টাকা অগ্রিম জমা না দিলে ছাপা হয় না।

৪। দীর্ঘকালের নিমিত্ত বিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইলে কার্য্যালয়ে জানিতে পারা যায়।

ব্রাহ্মণসমাজ সম্পাদক
৬২ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা—৮২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ নবদ্বীপ সমাজ সম্মিলিত—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা হইতে ব্রাহ্মণসমাজ কর্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১২ নং সিমলাষ্ট্রীট্, জ্যোতিষ-প্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা মুদ্রিত।

REGISTERED No. C—675.

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

(মাসিক পত্র)

A Non-Political Hindu Religious & Social Magazine.

(প্রবন্ধলেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

ষষ্ঠ বর্ষ—একাদশ সংখ্যা।

শ্রাবণ।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ দুই টাকা।

প্রতি খণ্ড ।৹ আনা।

সন ১৩২৫ সাল।

শ্রাবণ সংখ্যার লেখকগণ।

সম্পাদকদ্বয়—
শ্রীযুক্ত কালীকুমার তর্কনিধি।

সূচীপত্র।

শুদ্ধিপত্র।

মুদ্রাকর-প্রমাদ।

শ্রাবণ সংখ্যা "ব্রাহ্মণ-সমাজ" শেষ বা ৬ষ্ঠ ফর্ম্মায় অনেক ভ্রম লক্ষিত হয়। প্রুফ্ সংশোধন করিয়া দিলেও প্রেশের অনবধানতায় তাহা সংশোধিত হইবার পূর্ব্বেই মুদ্রিত হয়। যেরূপ ভ্রমে অর্থবোধের ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা, মাত্র তাহারই শুদ্ধিপত্র এস্থলে সংযোজিত হইল :—

অশুদ্ধ		শুদ্ধ
জ্যেতির্গ্রন্থে	(৪৬৯ পৃঃ ১ম পংক্তি)	জ্যোতির্গ্রন্থে
অদিবিন্দু	(ঐ পৃঃ ৩য় পংক্তি)	আদিবিন্দু
জলাদি	(৪৭১ পৃঃ ৩য় প্যারা ৫ম পং)	জপাদি
উক্ত	(ঐ ৭ম পংক্তি)	উত্তর
দোন	(ঐ শেষ প্যারা ১ম পংক্তি)	কোন্

ব্রাঃ সঃ সঃ

ষষ্ঠ বর্ষ। { ১৮৩৯ শক, ১৩২৫ সাল, শ্রাবণ। } একাদশ সংখ্যা

ভ্রান্ত পথিক।

নেহারি দু'ধারে সংসার-কানন,
ভুল করিয়াছি মজিয়া,
ফেলেছি হারায়ে পথটী আপন,
তাই ঘুরে মরি খুঁজিয়া।
হিংস্রসমাকুল বন্ধুর পথ
বিদেশে আঁধার নিশিতে,
পায় পায় বাধা আঘাতে অবশ
চায়না চরণ চলিতে।
জীবনের লক্ষ্য ধ্রুব তারাটীও
ফেলেছে নয়ন হারায়ে,
ক্রমশঃ আঁধার ঘন ঘনতর
নিরাশা দিতেছে বাড়ায়ে।
শূন্য সব পথ পথিকবিহীন
চলিব কোন্‌টী ধরিয়া,
পুনঃ করি ভুল বিষম তরাসে
হৃদয় ব্যাকুল ভাবিয়া।

কোন্ দিকে ধাই, কেহ কোথা নাই,
শুধাইব আর কাহারে,
সে যে ছেড়ে গেছে সকলের আগে
যে ছিল আলোক আঁধারে।
অজানা পথে সে চিরপরিচিত
সহচর হ'য়ে চলিত,
নূতন পরাণে অতি পুরাতন
পূত প্রেমধারা ঢালিত।
বিপদ্ বন্ধু ওগো হৃষীকেশ,
পাবনাকি দেখা কখনে,
সংসার পথে ভ্রান্ত পথিক
মরিবে কি পুরে জীবনে?

শ্রীঅমৃতলাল ভট্টাচার্য্য।

সংস্কার ও সুখ।

ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের কাহিনী অবগত হওয়া আমাদের কাছে অতীত গল্পের মত, একেবারে ঠিক উপকথার রাজকন্যার মত শোনায়। জাতিস্মরের কথা বলিলেও ত আকাশ-কুসুমের কথা ভাবিয়া—পাগল বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিই; একবারও ভাবিয়া দেখি না—উহার ভিতরে কিছু সত্য আছে কিনা।

কেবল প্রত্যক্ষকে (চাক্ষুস) বিশ্বাসের প্রমাণস্বরূপ দাঁড় করাইয়া অন্য প্রমাণগুলিকে হৃদয়ের উর্ব্বর ক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াই আমরা উক্ত সিদ্ধান্তে যাইয়া উপনীত হই। চাক্ষুষ ব্যতীত অপর প্রত্যক্ষগুলির ও অনুমান এবং আগমের সত্তা উপলব্ধি করিলে আমাদের এ সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্ত, তাহা প্রণিধানবিষয়ীভূত হইয়া দাঁড়ায়।

তবে, আজ এবিষয় আমার আলোচ্য নয়। কেবলমাত্র সংস্কার ও সুখের সম্বন্ধে একটুকু আলোচনা করিবার অভিলাষ। তাহাও আমার পক্ষে বালকের চাঁদ ধরিবার আশার মত। আমার বাগ্‌বিভবও কম, অভিজ্ঞতাও অল্প। সাহসের মধ্যে আপনারা ভরসা দিতেছেন—সকলেই বলিতেছেন—আমার কিছু বলারই দরকার। আর এ কথাও খাঁটী সত্য যে—একটা ভাল জিনিষ দেখিলেই তাহার অনুকরণ-স্পৃহা হৃদয়ের মধ্যে বলবতী হয়—পাপের

নেশার মত পুণ্যের নেশাও উজ্জ্বল। সেই নেশার ভরেই 'ছাই-ভস্ম' যাহাই হউক দুই এক কথা বলা। কিম্বা আশা—

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং"

জীব পূর্ব্বজন্মে ও ইহজন্মে যাহা কিছু করিয়াছে ও করিতেছে—যে কোন জ্ঞান উৎপাদন করিয়াছে ও করিতেছে, যাহা কিছু অনুভব করিয়াছে ও করিতেছে, সে সমস্তই জীবের হৃদয়ের মধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে একটী রেখা টানিয়া দিয়া যায়। সে রেখাটী আবার বীজে অঙ্কুরশক্তির মত—বস্ত্রে রঞ্জন রেখার মত—অথবা পুষ্পে গন্ধসংক্রমণের মত চিত্তফলকে বরাবরই থাকিয়া যায়। আধার নষ্ট না হইলে তাহার আর বিনাশ নাই।

সেই যে রেখাটী অন্তঃকরণপ্রদেশে চিরজীবনের মত আপনার অস্তিত্বজ্ঞান ঢালিয়া দেয়—তাহাকে আমরা বাসনা বা সংস্কার বলিয়া অভিহিত করি। তন্মধ্যে যে সকল বাসনা জ্ঞানজ অর্থাৎ যাহা কেবল অনুভব দ্বারা সঞ্চিত হইয়াছে—সে সকল সংস্কারের স্মরণ ব্যতীত অন্য কোন পরিণাম বা বিপাক নাই। সেই সকল বাসনা হইতে কেবল স্মৃতিনামক বৃত্তিই জন্মগ্রহণ করে।

"সদৃশানুভবাদস্তু স্মৃতিঃ স্মরণং"

তৎসদৃশ কোন পদার্থ লক্ষিত হইলেই তৎবস্তুর স্মৃতি হয়; তাহাকেই স্মরণ বলা যায়। সেইজন্য যোগশাস্ত্রকার লিখিয়াছেন –

বস্তু একবার অনুভূত অর্থাৎ প্রমাণবৃত্তিতে আরূঢ় হইলে, তাহা আর যায় না—সংস্কাররূপে থাকিয়া যায়; সেই থাকাকে আমরা স্মৃতি নামে অভিহিত করি; অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা দেখা যায়—যাহা শোনা যায়—যাহা কিছু অনুভব করা যায়, চিত্তে তাহার সংস্কার আবদ্ধ হয়। উদ্বোধক উপস্থিত হইলেই সেই সকল স্মৃতি প্রবল হইয়া চিত্তক্ষেত্রে সেই সকল পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্বরূপ পুনরায় উদিত করিয়া দেয়। সংস্কারসমুৎপন্ন সেই সকল মনোবৃত্তির নাম স্মরণ।

আর যে সকল বাসনা কর্ম্মজ অর্থাৎ যে সকল সংস্কার কর্ম্ম বা কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা উৎপাদিত হইয়াছে, যে সকল কর্ম্ম-বাসনার বিপাক অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ফল জন্ম, মরণ, আয়ুর্ভোগ এবং তদনুগত সুখ, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি; শাস্ত্রকারগণ এই শ্রেণীর সূক্ষ্ম চিত্তধর্ম্মকে বা এই শ্রেণীর সংস্কারসমূহকে ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য—দুরদৃষ্ট শুভাদৃষ্ট নাম প্রদান করিয়া থাকেন। এই ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি চিত্তধর্ম্ম গুলি কোনও জীবের মানস প্রত্যক্ষ হয় না। সুখ, দুঃখ প্রভৃতি ধর্ম্ম যেমন প্রত্যেক জীবেরই প্রত্যক্ষানুভূত পদার্থ, ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সংস্কারগুলি কোনও কালে কাহারও সেরূপ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না।

আমরা সংযম বলিলে সাধারণতঃ যাহা বুঝি, প্রকৃত তাহা সংযম নহে; তবে সংযমের অনুকূল বটে; এইজন্য যোগশাস্ত্রকার সংযমের পরিভাষা করিয়াছেন —

"ত্রয়মেকত্র সংযমঃ।"

"একত্র একস্মিন আলম্বনে ত্রয়ং ধারণা-ধ্যান-সমাধিলক্ষণং ত্রিতয়ং প্রবর্ত্তমানং সংযম ইত্যুচ্যতে।"

কোন এক আলম্বনে উক্ত তিনপ্রকার মানসক্রিয়া, অর্থাৎ ধারণা-ধ্যান-সমাধি এই ত্রিবিধ মানসক্রিয়া, প্রয়োগ করার নাম সংযম।

অনন্তর বাসনা ও সংস্কারের উপর সংযম প্রয়োগ করিতে হয়। সংযম যখন গাঢ় হয়, তখন সহসা বিদ্যুদ্‌বিকাশের মত স্মৃতি-অনুভূত সংস্কারসকল প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রতীত হয়। এইরূপে আপনার চিত্তগত ধর্ম্মাধর্ম্মসকল সম্যক অধিকৃত অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার করিতে পারিলেই, সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনার মানস-পটে পূর্ব্বজন্মের সমস্ত ইতিবৃত্ত প্রতিফলিত হইবে।

আপনার হৃদয় মুকুরের মত স্বচ্ছ, তাহাতে বিষয়-কলঙ্ক পড়িতে না দিয়া ক্রমাগত হৃদয়স্থিত সংস্কারগুলির প্রতি যদি সংযম প্রয়োগ অর্থাৎ প্রথমে ধারণা * (সেই সেই বাসনা অর্থাৎ সংস্কারের উদ্দেশ্যে আপনার চিত্তধারণ) পরে তাহার ধ্যান † (সেই পদার্থে চিত্তবৃত্তির একতানতা) অনন্তর সমাধি ‡ (ধ্যেয় বস্তু মাত্র উদ্ভাসিত মানসএকাগ্রতা অর্থাৎ ধ্যানের পরিপাক দশা) করিতে হয়। করিলে সেই সকল সংস্কারের মূলকারণীভূত পূর্ব্বানুষ্ঠিত কার্য্যসকল স্মৃতিপথারূঢ় হইবে। স্মারক বস্তু উপস্থিত না থাকিলেও উক্ত প্রকার স্মৃতি সংযমের বলে উপস্থিত হইবে। তীব্র ভাবনার প্রভাবেই পূর্ব্বানুভূত কর্ম্মাদির প্রত্যেক সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইতে থাকে। সংস্কারসকল উদ্বুদ্ধ বা বিকাশ প্রাপ্ত হইলেই পূর্ব্বজন্মের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষের মত হইবে। পুরাণে এ সম্বন্ধে একটী ছোট গল্প আছে—

মহাযোগী জৈগীষব্য সংযমের দ্বারা আত্মনিষ্ঠ সংস্কার সাক্ষাৎ করিলে, তাঁহার দশকল্পের জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ হইয়াছিল। একদা আবন্ত্য নামক কোনও যোগী জৈগীষব্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবন্! আপনি দশকল্প পর্য্যন্ত বার বার সুরনরতির্য্যগ্‌যোনিতে উৎপন্ন হইয়াছেন; আমি এখন জানিতে অভিলাষ করি—আপনি কোন জন্মে কিরূপ সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছেন, কোন্ শরীরেই বা তদুভয়ের আধিক্য অনুভব করিয়াছেন?"

জৈগীষব্য কহিলেন—"আয়ুষ্মন্! আমি বার বার দেবতা, মনুষ্য, পশ্বাদি হইয়া যে কিছু সুখ অনুভব করিয়াছি—সমস্তই দুঃখ, তাহার একটীও সুখ নহে।"

"তবে কি প্রকৃতিবশিত্বও (ঈশ্বরের ক্ষমতা তুল্য ক্ষমতা) সুখ নহে? যাহার প্রভাবে লোকের ইচ্ছানুরূপ দিব্য ও অক্ষয় ভোগ সকল উপস্থিত হয়; তাহাও কি আপনার নিকট সুখ বলিয়া গণ্য নহে?"

---

* দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।

† তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।

‡ তদেবার্থমাত্র নির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।

এই বলিয়া আবন্থ উদ্‌গ্রীবভাবে জৈগীষব্যের পানে চাহিয়া রহিলেন। জৈগীষব্য উত্তর করিলেন—

প্রকৃতিবশ্যতা সুখ বটে—এবং লৌকিক আমরা যাহাকে সংস্কারবশে সুখ বলি, তাহাও সুখ বটে; কিন্তু দ্বিতীয়টী লৌকিক সুখ, আর প্রথমটী লোকসাধারণপরিচিত সুখ অর্থাৎ লৌকিক সুখ অপেক্ষা উত্তম বটে, তথাপি কৈবল্য অপেক্ষা উত্তম নহে। কৈবল্যের সহিত তুলনা করিলে—তাহাতে সুখের বিন্দুমাত্রও নাই—সকলই দুঃখ বলিয়াই বিবেচিত হয়, সুখ বলিয়া জ্ঞান হয় না। জীবের তৃষ্ণাসূত্র ছিন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্তই দুঃখ, কিন্তু তৃষ্ণাচ্ছেদ হইতে যে কৈবল্য লাভ হয়—বস্তুতঃ তাহাই অত্যুত্তম সুখ। তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুখ নাই। তাহাতেই বিষ্ণুপুরাণকার লিখিয়াছেন—

"যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখং
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥"

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ।

দিব্যদৃষ্টি।

ঘোর দুর্ভিক্ষ—মানুষের উদরে অন্ন নাই, পশুর উদরে তৃণ নাই। প্রকৃতি দগ্ধশরীরিণী, ধরিত্রী তৃণলতাহীনা—প্রায় নির্জ্জলা। একমাত্র উত্তপ্ত প্রচণ্ড বায়ুর গতি ব্যতীত অন্য বস্তুর অস্তিত্বই বুঝি নাই।

এমন ভীষণ অবস্থা—এমন শোচনীয় পরিণাম ইতিপূর্ব্বে এই গঙ্গাযমুনাসিন্ধুগোদাবরী-প্রক্ষালিতা—সমভাবে ষড়্‌ঋতু-অধ্যুষিতা সুজলা সুফলা ভারতভূমিতে আর কখনও হয় নাই। বিধাতার এই নির্ম্মম অভিশাপ না জানি কি কারণে সনাতনধর্ম্মস্রষ্টা ঋষিগণপরিচালিত, অমিতভুজবীর্য্যসংরক্ষিত অগণ্যবৈশ্যদলপুষ্ট ধনধান্যের একমাত্র লীলাক্ষেত্র ভারতে সমুপস্থিত হইয়াছে! এতাদৃশ ভীষণতা এরূপ অস্বাভাবিক ক্রিয়া পৌরাণিক যুগের আদিতে রাজা রন্তিদেবের রাজ্যে কেন ঘটিল? স্রষ্টা ব্যতীত তাহার দ্রষ্টা উহা বুঝিতে পারে না। দুর্ভিক্ষ বিকট মুখব্যাদান করিয়া বিশ্বমণ্ডল হইতে ভারতবর্ষকে যেন গ্রাস করিতে উপস্থিত হইয়াছে।

ক্ষুধার তাড়নায়—পিপাসার অদম্য যন্ত্রণায় মানুষে মানুষ—পশুতে পশু—উদ্ভিদেও উদ্ভিদ্ পর্য্যন্ত যেন আহার করিতেছে। স্বর্ণজ্যোতি-রুজ্জ্বলা পুণ্যভূমি যেন নরক-ভূমিতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। স্বর্গ-প্রাঙ্গণে সুরের পরিবর্ত্তে অসুরের তাণ্ডবনৃত্য চলিতেছে।

রাজা রন্তিদেব প্রজাসাধারণের অসহনীয় দুরবস্থায় তৃণতরুগুল্মহীন জলশূন্য প্রান্তরে একটী পল্লবশূন্য সপ্তচ্ছদ তরুতলে গতাবশিষ্ট দুই চারিজন সঙ্গীর সঙ্গে একটী ক্ষুৎ-পিপাসাক্লিষ্ট তপস্বীর নিকট বসিয়া জগন্মঙ্গল চিন্তায় ভূমিতে বক্ষ পাতিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন।

ভীষণ দুর্ভিক্ষের অবর্ণনীয় প্রতাপে তাঁহার পরিজনবর্গ শ্মশানের যাত্রী হইয়াছে। একমাত্র অভিজ্ঞা পতিপদ-পরায়ণা মহিষী সুনীতি তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া শ্রমক্লিষ্ট রাজার চরণ-বিগলিত ঘর্ম্মকণিকা পিপাসা-পীড়িত কণ্ঠে পান করিতেছেন। আর প্রবল পবনতাড়নে তাঁহার শীর্ষ-সংলগ্ন বিশৃঙ্খল কুন্তলরাজি উড়িয়া উড়িয়া রাজার রৌদ্রকরদীপ্ত অর্দ্ধচৈতন্যহীন দেহের ব্যজন-ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছে।

আজ আর ভারতসম্রাটের কোনরূপ সাম্রাজ্যের বিভব নাই; পরিবারগণের আর প্রজাকুলের উদর সেবায় একে একে সমস্তই অপসৃত হইয়াছে। এখন আর রাজা-রাণীর বিন্দুমাত্র খাদ্য বা পেয় নাই। এতাদৃশ উৎকট উপায়হীনতায় অসহনীয় অভাবের তাড়নায় অবক্তব্য অপ্রকাশ্য অবস্থায় দুই সপ্তাহ অতীত হইয়াছে।

দুর্ব্বল চলচ্ছক্তিহীন দুই চারিজন পার্শ্বচরের অতিকৃচ্ছে অত্যানুসন্ধানে সামান্যমাত্র ঘৃত, দুগ্ধ, যব আর জল সংগৃহীত হইয়াছে। পিপাসিতা ক্ষুধাতুরা রাজমহিষী তাহা লইয়া সামান্যরূপ আড়ম্বরশূন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিলেন, সম্রাটের সম্মুখে আনিয়া তাহা রক্ষা করিলেন। রাজা রন্তিদেব দীর্ঘ দিনের পর খাদ্য পেয় দেখিয়া অগ্রে তাহার কতকাংশ শুষ্ককণ্ঠ তপস্বীকে প্রদান করিলেন। তাহার পর উপস্থিত অনুচরগণকে সামান্য কিছু কিছু দান করিয়া অবগুণ্ঠনবতী ক্ষুৎপিপাসাতুরা রাণীকে কহিলেন, মহিষি! আমার ইহজগতের একমাত্র সুখদুঃখভাগিনী তুমি, ব্রীড়া পরিত্যাগ কর, এই খাদ্য পেয় গ্রহণ করিয়া স্থূলদেহটি রক্ষা কর, আমিও ক্ষুধাপিপাসা-ক্লিষ্ট বটে; কিন্তু তোমার জ্যোতির্হীন মুখ তাহাপেক্ষা হৃদয়ে সহস্রাংশ যাতনা দিতেছে। আমি পুরুষ—তুমি আমার অবলম্বিতা ও আশ্রিতা, তোমার পূর্ণ দায়িত্ব আমার স্কন্ধে। স্ত্রীকে ভরণপোষণ জন্যই পুরুষের নাম ভর্ত্তা। যে গৃহে বা যে পুরুষের আশ্রয়ে কামিনী অপমানিতা, অবহেলিতা, মনঃক্লিষ্টা ও পীড়িতা—সে গৃহ বা সে পুরুষ সর্ব্বাংশে অধঃপতিত। আমার না জানি কোন্ মহাপাপে আজ এই মহা হাহাকার উঠিয়াছে! আবার তোমার ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণ জন্য পাপে আমার পরকাল বিনষ্ট করিতে পারিনা। তুমি ইহা আহার কর।

আমি রাজা, আমারি মহাপাপে আমারি কৃতকার্য্যের দুষ্পরিণামে আজ সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট প্রজাকুল ক্ষুধাপিপাসার পীড়নে মৃতপ্রায়। আমি কোন্ প্রাণে এই খাদ্য মুখে তুলিব? আমার প্রজা—আমার পুত্রকন্যাস্থানীয়, হৃদয়ের শোণিতসম জনসাধারণ—অহো! কতশত শিশু বৃদ্ধ “জল জল - রুটি রুটি ভাত ভাত” বলিয়া হয় ত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে। হায়রে! আমি রাজপুরী ত্যাগ করিলাম, ভাবিলাম যদি কোন গতিকে কোন উপায়ে এই দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে পারি। দৈহিক শক্তি সামর্থ্যে,

না হয়—তপস্বী পরমার্থচিন্তাপরায়ণ ব্রাহ্মণ-প্রসাদ লাভে দেশ রক্ষা করিব—অথবা দেশমাতৃকার পদে প্রাণ উৎসর্গ করিব। ক্ষুধিতের মুখে পিপাসিতের কণ্ঠে দু'টি অন্ন—এক গণ্ডূষ জল তুলিয়া ধরিব, কিন্তু হায় রাণি! হায় আমার ধর্ম্মসঙ্গিনী সুনীতি! এ দুয়ের কোনটা যে পারিলাম না? হতভাগ্য রন্তিদেবের পাপ-অদৃষ্টে তাহা ঘটিল না। তবে আর কোন্ প্রাণে কোন্ মুখে অন্নজল গ্রহণ করিব?

আমার প্রজাকুল আজ ক্ষুধাপিপাসায় মৃত, গৃহবহিষ্কৃত, 'হা অন্ন হা জল' বলিয়া অনবরত মৃত্যু-পথের পথিক! কত প্রাণোপম শিশু আজ মাতৃবক্ষেই মৃত। শত শত পিতামাতা আজ প্রাণাধিক পুত্রের মাংস খাইয়া উন্মাদ। রাজ্যের পশুপক্ষী পর্য্যন্ত মরিয়া মরিয়া দেশস্থ বায়ু দুর্গন্ধময় করিয়া দিয়াছে। জলাভাবে জলচর জীব পর্য্যন্ত রৌদ্রে পুড়িয়া মরিতেছে! এরূপ শোচনীয় অবস্থায় আমি কোন্ মুখে কোন্ প্রাণে খাদ্য পেয় গ্রহণ করিব? তুমি খাদ্য খাও, পেয় পান কর। আর ওহে আমার বিপদের বন্ধুগণ! তোমরা জীবন রাখিতে পারিলে রাজ্যের মঙ্গল, পরিণামে এই সৃষ্টিও রক্ষা হইতে পারে।

রাজার এইরূপ মর্ম্মভেদী করুণ বাক্য শুনিয়া পার্শ্বস্থিত তপস্বী (ইতিপূর্ব্বে যিনি পিপাসায় মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন) কহিলেন—মহারাজ! তোমার বাক্য শুনিয়া আর ব্যবহার দেখিয়া আমার একটী করুণ ইতিহাস স্মরণ হইতেছে। শুনিয়া যাও, পরিণামে মহা শুভকর হইবে। তোমার ন্যায় পরদুঃখকাতর ধর্ম্মপ্রাণ নৃপতি এযুগে দ্বিতীয় নাই। পরের জন্য আর সত্যের জন্য তুমিই প্রাণ দিতে শিখিয়াছ। তুমিই প্রকৃত আর্য্য, খাঁটি হিন্দু। সনাতন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা তোমারি শুনিবার অধিকার—তাই এই উৎকট সময় তোমাকে একটী কাহিনী শুনাইব।

পূর্ব্বকালে উশীনরকুমার রাজা শিবি এক সময় গঙ্গাতীরে সিংহাসনে পাত্রমিত্রসহ উপবিষ্ট। এই সময় একটী কপোত উড়িয়া আসিয়া তাঁহার সিংহাসনতলে আশ্রয় লইল। পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী শ্যেনপক্ষী ছুটিয়া আসিয়া কহিল "মহারাজ! আমার বিধিনির্দ্দিষ্ট খাদ্য এই কপোত। ইহা পরিত্যাগ করুন—আমি আহার করি। রাজা কহিলেন—

"আশ্রিতং পরিপুষ্ণাতি গুণাগুণমচিন্তয়ন্"

এই কপোত আমার আশ্রিত। আমি ইহার দোষ গুণ বিচার করিব না, প্রাণ দিয়া রক্ষা করিব। কপোত যদিও তোমার বিধিবিহিত খাদ্য, তথাপি অদ্য তুমি অন্য খাদ্য প্রার্থনা কর, আমি তাহাই আনিয়া দিব। লুব্ধ শ্যেন কহিল, অন্য খাদ্য চাহি না, কপোতই আমার ঈপ্সিত এবং প্রিয়। তুমি রাজা, তোমার আদেশ পালন করা আমি প্রজা আমার ধর্ম্ম। এইজন্য কহিতেছি—এই কপোতকে ত্যাগ কর, না হয় তুলাদণ্ডে তুল করিয়া এই কপোতের ভারতুল্য মাংস তোমার রাজশরীর হইতে কাটিয়া দাও, তাহা হইলে আমি অপেক্ষাকৃত তৃপ্ত হইতে পারি।

সত্যপ্রিয় প্রতিজ্ঞাপালনতৎপর রাজা ঔশীনর 'তথাস্তু' বলিয়া তুলাদণ্ড আনিলেন।

একদিকে পায়রা, অপর দিকে নিজের জানুর মাংস কাটিয়া রাখিলেন। দৈবচক্রে রাজার কর্ত্তিত মাংস কপোতের তুল্য হইল না। আবার আরো মাংস দিলেন—তাহাতেও দুই দিক ঠিক হইল না, আবার দিলেন—একবার দুইবার করিয়া দিতে দিতে রাজার দেহের সমস্ত মাংস দেওয়া হইল, তথাপি কপোতের তুল্য হইল না। তখন ক্রুদ্ধ মন্ত্রী তুলাদণ্ড ফেলিয়া দিলেন।' কিন্তু মস্তক আর অস্থিমাত্র রাখিয়া শরীরের সমস্ত মাংস দিয়া যখন কপোতের তুল্য হইল না, তখনও রাজা শিবি অবশিষ্ট মাংস কাটিয়া দিতে মন্ত্রীকে আদেশ করিলেন, দৃঢ়তাপূর্ণ কঠোর রাজাজ্ঞা কার্য্যেও পরিণত হইল। কিন্তু দৈবকার্য্যের সুক্ষ্মক্রিয়া পূর্ণ হয় না দেখিয়া শ্যেন কহিল,—মহারাজ! এখনও শান্ত হউন—কপোতকে আমায় প্রদান করুন।" আপ-ার মূল্যবান্ জীবন রক্ষা করুন।

রাজা কহিলেন—

"রক্ষণাশ্রিতকার্য্যানাং মীমাংসানাঞ্চ শোধনাৎ।
নরেন্দ্রাস্ত্রিদিবং যান্তি প্রজাপালনতৎপরাঃ—
(মনু)

আশ্রিতের রক্ষা আর মীমাংসা শোধনে ;
রাজা স্বর্গলাভ করে প্রজার পালনে॥

আমি সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা, প্রজাকুলের রক্ষক, সামান্য বিষয়মীমাংসা করিতে না পারিলে আমাদ্বারা কঠিন কার্য্য রাজধর্ম্মপালন কিরূপে হইবে? সুতরাং, আমার প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, তথাপি আশ্রিত ত্যাগ করিবনা, ঋষিগণব্যবস্থিত সনাতন ধর্ম্মনীতি পরিত্যাগ করিয়া অনার্য্য হইবনা, জগতের নিকট অন্যায় আদর্শ সংস্থাপন করিবনা।

এই সময় শ্যেন ও কপোত সহসা রূপান্তরিত হইয়া অগ্নি আর ইন্দ্রমূর্ত্তিতে রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন "তুমি প্রকৃত রাজা। তুমিই প্রকৃত হৃদয়বান্ হিন্দু। আর্য্যধর্ম্মের সার-মর্ম্ম তুমিই প্রকৃত পালন করিবার অধিকারী। আমরা চলিলাম, তোমার ন্যায় ব্যক্তির জন্যই স্বর্গে আসন প্রতিষ্ঠিত আছে। মর্ত্তে মনুষ্যের হৃদয়ে তোমার ন্যায় ব্যক্তির নাম চিরস্মরণীয় হইবে।"

আখ্যায়িকা শেষ করিয়া তপস্বী বলিলেন, মহারাজ রন্তিদেব! তুমি আজ "দিব্য দৃষ্টি" লাভ করিবে। তোমার আদর্শ এই পুণ্যনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়াই এরূপ ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। ধরণী ফল-জলশূন্যা হইয়াছেন, অতিভীষণ দৃশ্যই দেখিতে হইতেছে। তপস্বীতে আর রাজাতে যখন এইরূপ আলোচনা চলিতেছিল, তখন পার্শ্বচরগণ কতকটা সুস্থ হইয়াছে। রাজারাণী কেবল প্রস্তুত খাদ্য লইয়া ভাবিতেছেন। এমন সময় একটী ক্ষুধাতুর কৃশ ব্রাহ্মণ সহসা তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া ভূপতিত হইল।

ধর্ম্মপ্রাণ রাজা রন্তিদেব অতিকষ্টে ব্রাহ্মণকে উঠাইয়া কহিলেন, ভূদেব! ক্ষুধার জ্বালায় দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়াছ, এই লও খাদ্য, আহার কর। রাণী তখন নিজের খাদ্যাংশ ব্রাহ্মণকে

দিলেন্।' নিকটস্থ তপস্বী কহিলেন—কি করিলেন মহারাজ! সপ্তাহ পর যে খাদ্য সংগৃহীত হইয়াছে, উহাতে আপনাদের দুই জনের উদর পূর্ণ হইবেনা, আপনি তাহারি অর্দ্ধ দান করিলেন ?

নম্রস্বরে রাজা কহিলেন—করুণানিদান তপস্বিবর! নিজের জীবন হইতে পরের জীবন রক্ষায় আনন্দ এবং মনুষ্যত্ব অধিক। আমি এত দিন যখন অনাহারে বাঁচিয়াছি, তখন আর দুই চারি দণ্ড অবশ্য বাঁচিব। তাহার পর একেবারে ক্ষুধা-পিপাসায় চির-নিবৃত্তির স্থানে গিয়া উপস্থিত হইব। আমার ন্যায় হতভাগ্য ব্যক্তির মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, এখন সে মৃত্যু আমার শত্রু নহে, জীবের অবস্থান্তরের একমাত্র বন্ধু। যে জীবন পরের জন্য নহে, সে জীবন বিধিপ্রেরিত নহে, মাত্র ভূতসংযোগের রাসয়িনিক ক্রিয়া।

এই সময়ে অদূরে মৃত্যুপথের যাত্রী দুইটী শিশু অতিকরুণ স্বরে কহিল—"মহাশয়, প্রাণ যায়, সপ্তাহ মাটি ব্যতীত খাদ্য আহার করি নাই।" অমনি দয়ায় গঠিতহৃদয় রন্তিদেবের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। বলিলেন—"এসো শিশুদ্বয়, এই খাদ্য লও।" পরদুঃখকাতরা রাজ্ঞী অমনি সেই অর্দ্ধাংশ খাদ্য শিশুদ্বয়কে দিয়া কহিলেন—"খা বাছা খা, আমার মাংস খাইলেও যদি তোদের ক্ষুধা মিটে, তাহা হইলে আমি তাহাতেও প্রস্তুত। আহা! একদিন আমারি মতন কোন নারী তোদিগকে বুকের রক্ত দিয়া প্রতিপালন করিয়াছে, আর আজ সেই তোরা আমি থাকিতে, তোদের মাতৃজাতি থাকিতে অনাহারে মরিবি, তাও কি হয়? খা, এই খাদ্য খা।" শিশুদ্বয় আহার করিল।

এই সময় একটী ব্যাধ অতি কাতরকণ্ঠে আসিয়া কহিল—"জল—একটু জল দাও, প্রাণ যায়। আজ তিন দিন জলের পরিবর্ত্তে আকন্দ পাতার রস খাইয়া অন্ধ হইয়াছি। মাথা ঘুরিতেছে, বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছে" বলিয়াই ব্যাধ মৃত্তিকার উপর শয়ন করিল। রাজা রন্তিদেব ব্যাধকে কোলে করিয়া বসিলেন। রাণী জীর্ণ বসনাঞ্চল দিয়া তাহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

রাজা নিকটে রক্ষিত অল্প জল ধীরে ধীরে ব্যাধের মুখে দিতে লাগিলেন। যে জলটুকু মাত্র তাঁহাদের জীবন রক্ষার শেষ অবলম্বন ছিল, তাহাও নিঃশেষিত হইল। ব্যাধ জলপান করিয়া কহিল—"তুমিই বিশ্বে প্রকৃত মানুষ, মনুষ্যত্ব তোমার করতলগত। প্রাণে প্রাণে যে সমতা, তাহা তুমিই বুঝিয়াছ।" কিছুক্ষণ পরে ক্ষুধাতৃষ্ণায় রাজা ও রাণী অবশ হইয়া মাটিতে পড়িয়া প্রায় চেতনাশূন্য হইলেন। তখন সহসা সেই স্থানে শূন্যে—মহাশূন্যের একাংশে স্থির বায়ুমণ্ডলে একটী দিব্যস্নিগ্ধশ্যামজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। উপস্থিত পার্শ্বচরগণ নীরব নিথর পলকহীন! তদবস্থ রাজারাণীর শরীর হইতেই যেন সেই জ্যোতিঃ বাহির হইয়া সমগ্র বিশ্ব পুলকিত করিয়া তুলিল; ক্ষণেক সময় কেহ কাহারো প্রতি চাহিতে পারিল না। সকলেই সেই স্বর্গীয় জ্যোতির স্নিগ্ধ কিরণের দিকে চাহিয়া তন্ময় হইয়া উঠিল।

এমন সময় তপস্বী কহিলেন—"মহারাজ রন্তিদেব! তোমার সম্মুখে চাহিয়া দেখ।" রাজারাণী অতি কষ্টে অবসন্ন মরণক্লিষ্ট দৃষ্টি উঠাইয়া দেখিলেন—শূন্যের সেই অনন্ত-জীবন্ত-জাগ্রৎ-স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ ক্রমে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তপস্বীর শরীরাংশে পীতাম্বর-পরিহিত চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কণ্ঠে বনমালা, পরিধানে পীতাম্বর, বক্ষে শ্রীবৎসলাঞ্ছন ভৃগুপদচিহ্ন, পৃষ্ঠে নব-নীরদ-নিন্দিত কেশজাল, চারি হস্তে—শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম, মুখে মধুর হাসিচ্ছটা,—কর্ণে হীরকজ্যোতিঃ কুণ্ডল, চরণে স্বুবর্ণনূপুর, বাহুতে রত্নকেয়ূর, শিরে শিখিপুচ্ছ কিরীট।

আর দৃষ্টি ফিরিল না, রাজা রন্তিদেব রাণী সুনীতি কি জানি কি জগন্মোহিনী শক্তিতে উঠিয়া করযোড়ে আনতমস্তকে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

শ্যামমূর্ত্তি নয়নইঙ্গিতে তাঁহাদিগকে বসিতে কহিয়া বলিলেন—"মহারাজ! জগতে তুমিই প্রকৃত মানুষ। মনুষ্যত্বে আর দেবত্বে যে পার্থক্য নাই, তাহা তুমিই আজ দেখাইলে। তুমি মনুষ্যত্বের বিকাশ করিয়াছ, সুতরাং তোমাতে আর দেবতায় প্রভেদ অতি অল্প। তোমার পুণ্যে—তোমার জীববাৎসল্যে, তোমার পরদুঃখমোচনেচ্ছায়, তোমার কর্ত্তব্যপরায়ণত আজ এই কর্ম্মফলদগ্ধ ভারতভূমি স্বর্গের উচ্চাংশ হইতেও উচ্চ। আজ হইতে তোমার এই জন্মভূমি কর্ম্মভূমিভারতে এরূপ দুর্ভিক্ষ আর হইবে না, এরূপ ভীষণ জলাভাব ঘটিবে না। সমগ্র প্রদেশে না হইলেও প্রদেশান্তর শস্যভারে অবনমিত হইবে, রাজশক্তি তাহা আনিয়া প্রজাসাধারণকে রক্ষা করিবে। আজ হইতে আমি তোমার প্রকৃত মনুষ্যত্বকে বিশ্বব্যাপী সৃষ্টিস্থিতিশক্তির সহিত তোমার ন্যায় পূতহৃদয় ব্যক্তিকে সিদ্ধির সহজ পথে রাখিলাম। যাও মহারাজ! সেই স্থানে, যে স্থানে ক্ষুধা নাই পিপাসা নাই, তুমি—আমি নাই। যে রাজ্যে সকলি এক, সমস্ত সাম্যময়, বৈষম্যের নাম গন্ধ ও যে স্থানে নাই, সমস্তই আনন্দঘন সত্তায় পূর্ণ।"

এই সময় রাজা রন্তিদেব কহিলেন "হে জগদাধার বিশ্বারাধ্য! হে আমার আমিত্ব! আমি অষ্টসিদ্ধি চাইনা, নির্ব্বাণপদও প্রার্থনা করিনা, আমি যেন জীবের দুঃখে কাতর হইয়া তাহাদের চক্ষের জল মুছাইতে পারি, তাহারা যেন সকলেই স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। আমার অন্য কিছু বাসনা নাই। হে বিশ্বজীবন! আমি—

চাইনা নির্ব্বাণ সিদ্ধি আর পরাগতি,
জীবদুঃখ-অবসানে থাকে যেন মতি।
তব পদে এই ভিক্ষা চাহি দয়াময়,
ধরাবাসী জীবসঙ্ঘ যেন সুখে রয়।
ক্ষুধাতৃষ্ণা দৈন্যক্লেশ শ্রমক্লম আর
বিষাদ শরীর তাপ যাক দূরান্তর।

মায়ামোহ আদি সব গিয়াছে চলিয়ে,
তোমার জীবের আজ তৃষ্ণা নিবারিয়ে ॥"

ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, অতি দুজ্জ্ঞের। কি ভাবে, কিসে, কোন্ কার্য্যে, কোন্ রূপে তাহা প্রকাশ পায়, ক্ষুদ্রমনাঃ মানব বাক্যমনের অগোচর এই জ্ঞানের অতীত বিরাট বিশাল অনন্তের এই ক্রিয়া কি করিয়া বুঝিবে ?

রাজা রন্তিদেব দেখিলেন—তাঁহার ধর্ম্মপত্নী মানবী নহেন, বৈকুণ্ঠবিহারিণী কমলা; পার্শ্বচরগণ সামান্য রাজকর্ম্মচারী নহে,—নিত্যবৃন্দাবনে পূতহৃদয় রাখাল; ক্ষুধাতুর ব্রাহ্মণ স্বয়ং ধর্ম্ম; শিশুদ্বয় অন্তর্মুখীন সৎ অসৎ প্রবৃত্তি; ব্যাধ অপরিহার্য্য ভ্রান্তি; আর দেখিলেন— তপস্বীকে স্বয়ং "শিবং শান্ত মদ্বৈতং সচ্চিদানন্দব্রহ্ম"।

মানুষ মনুষ্যত্বের অধিকারী হইলে যে দৃষ্টি তাহার লাভ হয়, তাহাকেই "দিব্যদৃষ্টি" কহে। নতুবা সৃষ্টির বাহিরে, কার্য্যের অন্তরালে—আত্ম দর্শনের অতিরিক্ততায় আর একটা অনৈসর্গিক দৃষ্টি নাই। জীবের জীবত্বের সহিত কার্য্যকারিণী শক্তির উন্মেষলাভের নাম "দিব্যদৃষ্টি"। বাহ্য চক্ষুর্দ্বয়ের ক্রিয়া ব্যতীত আভ্যন্তরিক দৃষ্টির নামই—"দিব্যদৃষ্টি"।

রাজা রন্তিদেবের অন্ত সেই দৃষ্টি লাভ হইল।

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ।

পারলৌকিক তত্ত্ব।

(১১)

(পুনর্জ্জন্ম)

জন্মান্তর আছে কি না, একথা লইয়া পূর্ব্বকালেও চার্ব্বাকের সহিত আর্য্য দার্শনিকগণের তুমুল সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। নাস্তিকগণ দেহ ব্যতীত অন্য কোনও আত্মা স্বীকার করেন না; তাঁহাদের মতে চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম, গুড়তণ্ডুলাদি একত্র মিলিত হইলে যেমন উহাতে মাদকতা শক্তি জন্মে, তদ্রূপ ক্ষিত্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের একত্র সম্মেলনে চৈতন্য নামক পদার্থ উৎপন্ন হয়; সুতরাং মৃত্যুর পর আর কিছুই থাকে না। পাপপুণ্যভোগ ইহলোকে, পরলোক তাঁহাদের মতে স্বীকৃত নহে, কারণ পরলোকে যাইবার কেহ তাঁহাদের মতে থাকে না।

সাংখ্যদর্শন তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন—"না হে, তোমাদের সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। দৃষ্টান্তের সহিত মিলিল না, কারণ গুড়তণ্ডুলাদিতে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবেও মাদকতা শক্তি আছে, সুতরাং, মিলনে একটা প্রবল শক্তি জন্মে। সহস্র বৎসর পরীক্ষা করিলেও ক্ষিতি, জল প্রভৃতিতে চৈতন্যের সূক্ষ্ম কণাও অনুভূত হইবে না। সুতরাং, চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম নহে, পৃথক্ পদার্থ।"

যাহাতে যাহা থাকে, তাহা হইতেই তাহার উৎপত্তি হয়। তিলে তৈল আছে, পেষণ করিলে তিল হইতে তৈল নিঃসৃত হয়; কিন্তু সহস্র বৎসর ভীষণ বেগে ঘর্ষণ করিলেও বালুকা হইতে বিন্দুমাত্র তৈলও নির্গত হইবে না। এই যে সর্ব্বলোকসিদ্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ, সেই প্রমাণ-বলে চার্ব্বাকের দেহচৈতন্যবাদ খণ্ডিত, সুতরাং চৈতন্য দেহধর্ম্ম নহে, উহা পৃথক্ জিনিষ।

নৈয়ায়িক বলেন, "শরীরস্য ন চৈতন্যং মৃতেষু ব্যভিচারতঃ" চৈতন্য শরীরের ধর্ম্ম নহে, কেননা মৃত্যুর পর শরীর আছে, তোমার সেই ভূতচতুষ্টয় আছে, কিন্তু তাহার ধর্ম্ম চৈতন্য নাই, ইহা ত হইতে পারে না? অগ্নি থাকিবে, আর তাহার দাহিকা শক্তি চলিয়া যাইবে, একথা অবিশ্বাস্য, অপ্রমাণ। সুতরাং, চৈতন্য দেহধর্ম্ম নহে, পৃথক্ পদার্থ।

দেহাত্মবাদসম্বন্ধে অন্যান্য যুক্তি জীবাত্মা প্রবন্ধে দিয়াছি, এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

বলিতে পার—না হয় মানিয়া লইলাম—দেহব্যতীত পৃথক্ আত্মা আছেন, জীবাত্মাও আছেন। মৃত্যুকালে আত্মা দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যান, স্বর্গ নরক ভোগ করেন; কিন্তু তিনি আবার পৃথিবীতলে জন্ম গ্রহণ করেন, একথা বিশ্বাস করি কেন?

পূর্ব্বকালে এইরূপ কোনও বাদী ছিলেন না, সুতরাং দার্শনিকগণ তাহার নিরাসে যত্নপর হন নাই। অধুনা এইরূপ এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা জন্মৈকবাদী।

এই মতে প্রত্যেক জন্মে নূতন নূতন আত্মা সৃষ্ট হয়, তাহা অনাদি না হইলেও অবিনশ্বর বটে। ইহলোকের কৃত পাপপুণ্যের ফলে এই সকল আত্মা অনন্ত নরকও অনন্ত স্বর্গ ভোগ করিয়া থাকেন। এই মতে জন্মান্তর নাই। আধুনিক খৃষ্টধর্ম্ম এই মতের পোষক।

উপরি উক্ত মতের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন না করিলে জন্মান্তরবাদে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতে পারে না, তজ্জন্য তাহার নিরাস করা আবশ্যক।

জন্মৈকবাদে আত্মার উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটী প্রণালী স্বীকৃত হইতে পারে; এক সৃষ্টি, অপর নির্য্যাসন। পরমেশ্বর প্রতি মুহূর্ত্তে অসংখ্য আত্মা সৃষ্টি করিতেছেন এবং তাহা আবার প্রাকৃতিক দেহের ভিতর সংস্থাপিত করিতেছেন। এই স্থলে জিজ্ঞাস্য যে ঈশ্বর কিরূপ উপাদান দিয়া আত্মার সৃষ্টি করিতেছেন? ভৌতিক উপাদান দ্বারা আত্মার সৃষ্টি অসম্ভব, অন্য কোনও উপাদানও আত্মার সৃষ্টির জন্য মিলিবেনা।

পরন্তু, যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার বিনাশও আছে। আত্মার উৎপত্তি থাকে ত বিনাশও থাকিবে; ভাব-পদার্থ মাত্রেরই এই নিয়ম। সুতরাং, অনন্ত স্বর্গও অনন্ত নরক ভোগ করিবে কে? আত্মা যে মরিয়া যাইবে?

স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে আত্মা নির্য্যাসিত হন, এ কথাও বলা যায় না ; কেননা তাহা হইলেও আত্মা এক প্রকার ভৌতিক পদার্থ হইয়া পড়েন। ভৌতিক পদার্থে যে চৈতন্য থাকিতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এই মতে আর একটী গুরুতর দোষ আছে। যেমন প্রতি মুহূর্ত্তে অসংখ্য আত্মা সৃষ্ট হইতেছে, এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই অসংখ্য আত্মা স্বর্গে ও নরকে প্রেরিত হইতেছে, এবং সেই সকল আত্মা অনন্তকাল স্বর্গে ও নরকে থাকিবে, আর কোথাও যাইবে না ; এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে পরমেশ্বরকে স্বর্গের ও নরকের আয়তন দিন দিন বৃদ্ধি করিতে হইতেছে, একথাও স্বীকার করিতে হইবে ; এবং এমন একদিন আসিবে, যেদিন স্বর্গ ও নরকের জন্য স্থান গ্রহণ করিতে করিতে জগতে আর তিলমাত্র স্থানও থাকিবে না, সমস্তই স্বর্গ ও নরকে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। তখন ঈশ্বর কোথায় নূতন আত্মা তৈয়ার করিবেন ? সেদিন সৃষ্টির কারখানা গুটাইয়া ঈশ্বরকে ঘরে উঠিতে হইবে। এই সকল মতের উপর সহস্র সহস্র দোষ আছে, বিস্তৃতিভয়ে তাহা পরিত্যাগ করিলাম। জড়বাদ ও অনেকবাদের অসারতা প্রতিপাদিত হইল, অধুনা জন্মান্তরবাদের কথা বলিব।

মানুষ মরিয়া আবার জন্মে কিনা, ইহার নির্ণয় করিতে হইলে অনুমান-প্রমাণের সাহায্যে বিচার করিতে হইবে। কারণ, যাহা দেখা যায় না, তাহার প্রতি প্রত্যক্ষ প্রমাণ সাধক নহে।

(১) জগতের সকল প্রাণীর একটা সাধারণ আকাঙ্ক্ষা আছে, "আমি যেন না মরি ও সুখে জীবিত থাকি" এই সার্ব্বভৌমিক আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া জন্মান্তরের অনুমান করা যায়। মরণের প্রতি লোকের এত দ্বেষ কেন ? মরণটা কি ? যাহার কখনও অনুভব হয়, তাহার প্রতিই লোকের অনুরাগ বা বিরাগ জন্মে। মরণ কেহ এদেহে অনুভব করেন নাই, তবে তাহার উপর এত দ্বেষ বা এত বিতৃষ্ণা কেন ? এক দেহে একবার ভিন্ন দুইবার মরণ হয় না, সুতরাং মরণবিদ্বেষ দেখিয়া বুঝিতে হইবে জীবাত্মা কখন্ মরিয়াছিল, মৃত্যুর ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল, তজ্জন্য এবারেও তাহার মৃত্যুর প্রতি অনিচ্ছা, প্রত্যুত প্রবল বিদ্বেষ।

মৃত্যু দ্বারা ঐহিক ভোগের অসুবিধা ঘটিবে বলিয়া বুদ্ধিমান্ না হয় মরিতে অনিচ্ছুক হইতে পারেন ; কিন্তু সদ্যঃপ্রসূত শিশু, যাহার কোনও জ্ঞান নাই, যে সংসার সুখে একান্ত অনভ্যস্ত ও অননুরক্ত, মারক বস্তু দর্শনে তাহারও যে ত্রাস হয় এই প্রশ্নের উত্তর কে দিবে ? স্পষ্টতঃই দেখিতে পাই—সদ্যোজাত শিশুকেও যদি তাহার জননী ক্রীড়াচ্ছলে ক্রোড়দেশ হইতে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করেন—তখন শিশুটী ব্যস্ত ও চমকিত হইয়া প্রসূতির বক্ষঃস্থল বিলম্বিত মাঙ্গল্যসূত্র প্রভৃতি যাহা পায় তাহাই সজোরে ধরিয়া—আত্মত্রাণের চেষ্টা করে। এ চেষ্টার বা এ মরণ-ভীতির কারণ কি ? এই জন্মই যদি তাহার প্রথম হয়, তবে এই সকল প্রশ্নের উত্তর কেহ খুঁজিয়া পাইবেন না ; সুতরাং স্বীকার করিতে হয়—শিশু অন্য দেহে মরণ-দুঃখ ও পতন-দুঃখ অনুভব করিয়াছে, আজ আবার সেইরূপ

উদ্‌বোধক উপস্থিত হওয়ায় পূর্ব্বানুভূতির সংস্কার হইতে অনুরূপ স্মৃতি জন্মিয়াছে, তন্নিমিত্তই তাহার এই অনিচ্ছা ও বিদ্বেষ।

(২) অচিরপ্রসূত বালকগণ নিষ্কারণ আপনা-আপনি যে হাসে ও কাঁদে, কখন ভয় পায়, কখন শোকের ভাব দেখায়, পূর্ব্বজন্ম স্বীকার না করিলে তাহার উপপত্তি হয় না। পূর্ব্ব-জন্মাভ্যস্ত বিষয়ের স্মৃতিবলেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

নাস্তিক বলেন—বালকের হাসি ও কান্না দেখিয়া পূর্ব্বজন্মের অনুমান করিতে গেলে, পদ্মেরও পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করিতে হইবে; কারণ, পদ্ম একবার প্রস্ফুটিত ও আবার মুকুলিত হয়। পদ্মের স্বাভাবিক প্রবোধ ও মুদ্রণের ন্যায় বালকেরও হর্ষ ও ক্রন্দন ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বজন্মের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই।

নাস্তিকের এই সিদ্ধান্ত ভুল; কারণ শীত লাগিলেই পদ্ম সঙ্কুচিত হয়, উষ্ণ পাইলেই বিকসিত হইয়া থাকে। বালকের হর্ষ ও ক্রন্দনে এমন কোনও নিয়ম নাই, সে শীতেও হাসে উষ্ণেও কাঁদে, আবার উষ্ণেও হাসে শীতেও কাঁদে। সুতরাং এই হর্ষক্রন্দনাদিতে পূর্ব্বাভ্যস্ত স্মৃতিই কারণ। এই পূর্ব্বাভ্যস্তের স্মৃতি দ্বারাই জন্মান্তর অনুমিত।

(৩) বালকের স্তন্য পানের প্রবৃত্তি দেখিয়াও জন্মান্তরের অনুমান করা যায়। অচির-প্রসূত বালক যে স্তন্য পানের জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া জননীর স্তন ধরিতে যায়, এই জন্মই কি বালককে প্রথম ইহলোকে এই শিক্ষা দিল? গোবৎস জন্মের অব্যবহিত পরেই কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার অভিলষিত কোন বস্তু খুঁজিতে খুঁজিতেই যেন জননীর পশ্চাদ্‌ভাগে স্তনসমীপে উপস্থিত হয়; এই গুপ্ত স্থান মধ্যে যে তাহার খাদ্য, তাহার জীবনধারণের একমাত্র সামগ্রী নিহিত রহিয়াছে, এই শিক্ষা, এই উপদেশ সেই সদ্যঃপ্রসূত বৎস কোথায় পাইল? পূর্ব্বজন্মীয় স্তন্যপানস্মৃতিই তাহার কারণ, জীবনাদৃষ্ট সেই স্মৃতির উদ্‌বোধক। তন্নিমিত্তই পূর্ব্বজন্মীয় অন্যান্য সংস্কার চাপা দিয়া প্রথমতঃ বাঁচিয়া থাকিবার একমাত্র কারণ স্তন্যপানের কৌশলটা স্মৃতিপটে আরূঢ় হয়, অমনি বৎস গাভীর পশ্চাদ্‌ভাগে সেই পূর্ব্বপরিচিত স্তন খুঁজিতে থাকে।

সুচতুর নাস্তিক ইহাতেও আপত্তি করিতে ছাড়েন নাই, তিনি বলেন—যেমন চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ গাভীর স্তনও বৎসকে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

চার্ব্বাকের এই যুক্তিরও ভিত্তি নাই। কেননা গাভীর স্তনের আকর্ষণেই যদি বৎস তাহার নিকটবর্ত্তী হয়, তবে পূর্ব্বাভিমুখিনী গাভী পশ্চিমাভিমুখী বৎসকে আকর্ষণ করিলে বৎসের পুচ্ছটাই স্তনের নিকটে যাইবে, মুখ যাইবে কেন? বিশেষতঃ চুম্বক লৌহকে কখন আকর্ষণ করে, কখন ছাড়িয়া দেয়, এমন হয় না; কিন্তু বৎস গাভীর নিকট ক্ষুধা লাগিলেই যায়, অন্য সময়ে যায় না; সুতরাং দৃষ্টান্তও মিলিলনা।

আর আকর্ষণ করিলেই বা কি হয়? স্তনচোষণের প্রবৃত্তি দেয় কে? ইহা ত জড়ের

আকর্ষণের কার্য্য নয়? সুতরাং নিরুপায় হইয়া অনিচ্ছা থাকিলেও স্বীকার করিতে হইবে পূর্ব্বজন্মের অভ্যাসেই বালকের স্তন্যপানে অভিলাষ হইয়া থাকে। জন্মান্তর না থাকিলে তাহা সম্ভব হয় না।

(৪) জগতের বিচিত্রতাও পূর্ব্বজন্মের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়া দেয়। একটী শিশুর আত্মা রাজপ্রাসাদে ও অপর আত্মা দরিদ্রের পর্ণকুটীরে জন্ম গ্রহণ করিয়া একজন বিপুল সুখ-ভাগীও অপর দুঃখী হইল; জন্মান্তর না থাকিলে, পূর্ব্বসঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্ম তাহার কারণ না হইলে এই বৈষম্যের মীমাংসা করিয়া দিবে কে? সুতরাং, মানিতে হইবে জন্মান্তর আছে, পূর্ব্ব-সঞ্চিত কর্ম্ম অনুসারে সুখ দুঃখ হইতেছে, নিষ্কারণ নহে।

(৫) বাহিরের বিচিত্রতা ছাড়িয়া দিয়া অন্তরের বিচিত্রতার অনুসন্ধান করিলেও দেখিতে পাইবে—একটী শিশু জন্মমাত্রেই শান্ত, শিষ্ট, প্রতিভাবান্, অপর অশান্ত, দুষ্টপ্রকৃতি ও নির্ব্বোধ; একজন হয় ত সামান্য ঋজুপাঠখানাও ভালরূপ বুঝেনা, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যায় সে বিশেষ কৃতী; সুতরাং ইহাদ্বারাও পূর্ব্বজন্ম অনুমিত হয়। জন্মান্তর স্বীকার না করিলে এই সকল প্রশ্নের উত্তর হয় না।

এস্থলে কেহ কেহ উত্তরাধিকারবাদ অর্থাৎ মাতা পিতার স্বভাবচরিত্র, বুদ্ধি ও মেধা লইয়া বালক ভূমণ্ডলে আসে, সুতরাং বিচিত্রতা ঘটে, সহোদরগণের মধ্যে স্বভাববৈচিত্র্য নিষেককালীন স্ত্রীপুরুষের সঙ্কল্পের বৈচিত্র্য ফলে ঘটিয়া থাকে, এইরূপ যুক্তি দেখাইতে পারেন; কিন্তু সূক্ষ্ম বিবেচনা করিতে গেলে এ সমস্ত কথাও টিকিবেনা।

এই যে সঙ্কল্পবৈচিত্র্য বলিতেছ, তাহারও কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে, এস্থলে জীবের অদৃষ্ট, অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্ম ব্যতীত আর কাহাকেও কারণ বলিতে পারিবে না। অদৃষ্ট স্বীকার করিলে মৃত্যুর পরও কিছু (জীবাত্মা) থাকে, যাহাতে অদৃষ্ট থাকিবে: এমন জিনিষ স্বীকার করিতে হয়, তাহাতেই পূর্ব্বজন্ম স্বীকৃত হইয়া গেল।

বিশেষতঃ যুগপন্নিষিক্ত এক গর্ভজাত যমজ সন্তানদ্বয়ের আকৃতি প্রকৃতি, বল, বুদ্ধি ও মেধা প্রভৃতির বিচিত্রতা দর্শন করিয়া কোন্ বুদ্ধিমান্ ঈদৃশ অসার তর্কে আস্থা স্থাপন করিবেন?

অতএব মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্ম আছে, অনাদি অজ্ঞান (অবিদ্যা) দূরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণপ্রবাহ অনুভব করিতে বাধ্য। এই পুনর্জ্জন্মের কথাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন!
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥

হে অর্জ্জুন! আমার ও তোমার বহুজন্ম অতীত হইয়াছে, আমি এ সকল জানিতেছি, কিন্তু তুমি পরন্তপ, অর্থাৎ বাহ্যশত্রুর নিরাসেই যত্নপর, তজ্জন্য এই সূক্ষ্মরাজ্যের ঘটনাবলী জানিতেছ না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, প্রয়োজনবশে স্বয়ং ভগবানকেও পুনর্জ্জন্ম ধারণ

করিতে হয়, অপরাপরেরও যে জন্মান্তর আছে, তাহাও তার-গম্ভীর স্বরে ভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগতে প্রচার করেন—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

(১২)

উপসংহার।

যাহা দেখা যায় না, তাহাতেই সংশয়, ভ্রমও মতভেদ। বলবৎ প্রমাণপ্রয়োগে ভ্রমাদি দূরীভূত না হইলে সে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। দেখা যায় না বলিয়াই যে নাই, তাহাও বলিতে পার না। অনেক বস্তু মোটেই দেখা যায় না, কেহই দেখে না, অথচ তাহার সত্তা স্বীকার করিতে বাধ্য। অগ্নির দাহিকা শক্তি দেখা যায় না, অগ্নি ধরাইলে জ্বলিয়া যায়, ইহা সকলেই দেখে; অতএব না দেখিলেও দাহিকা শক্তি স্বীকার করিতে হইবে।

দেখা না যাইবারও নানাপ্রকার হেতু আছে,—

অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্ মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ॥

সাঙ্খ্যকারিকা।

অতি দূরতা হেতু আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষী দৃষ্টিগোচর হয় না, অতি নৈকট্যপ্রযুক্ত লোচনস্থ অঞ্জন লক্ষিত হয় না, ইন্দ্রিয় অপটু হইলে দেখা বা শুনা যায় না, মন একদিকে ব্যাসক্ত থাকিলে অন্য দিকের জিনিষের উপলব্ধি হয় না, সূক্ষ্মতাহেতুক স্বর্গ, অদৃষ্ট ও দেবতা প্রভৃতি দেখা যায় না, মধ্যে দেওয়াল থাকায় অন্তঃপুরের রাজমহিলাদি দৃষ্টিগোচর হয় না, গোক্ষীর ও মহিষ-ক্ষীর একত্র করিলে তাহার পার্থক্য অনুভূত হয় না। এই সকল কারণে দেখিবার অসুবিধা হয় বলিয়া, তাহা ত নাই বলিতে পার না?

যাহা দেখা যাইবে না, তাহার সাধনজন্য অনুমান-প্রমাণ গ্রহণ করিব, এবং অনুমানেও যাহা স্থির করা যাইবে না, তাহা বুঝিতে আপ্তবাক্যের অনুসরণ করিব। সকল প্রকার প্রমাণেই যাহা স্থির হইবে না, তাহাই নাই বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবে।

কেবল দেখি না বলিয়া নাই বলিতে গেলে, আজ তুমি ঘর হইতে বাহির হইয়াছ, তোমার পরিবারবর্গ দেখিতেছ না, এখন তাহাদের অভাব স্থির করিয়া বস? তুমি নিজে নিজ চক্ষু দেখিতেছ না, সুতরাং নিজেকে অন্ধ স্থির করিয়া রাখ? এইরূপ কেহই করে না। সুতরাং, যাহা দেখা যায় না, তাহাও যদি অন্য প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হয়, তবে তাহার অসত্তা স্থির করিতে পার না।

এই যে যম,—যমালয় বা যমালয়যাত্রা এবং স্বর্গ ও নরকের কথা বলিয়াছি, তাহাও দেখিবার উপায় নাই, স্থূল চক্ষুর অন্তরালেই এই সূক্ষ্ম রাজ্যের সূক্ষ্মতম ঘটনাবলী সংঘটিত হইতেছে, সূক্ষ্মতাই তাহা না দেখিবার প্রতি কারণ; সুতরাং এই সকলের সাধনে একমাত্র অনুমানও আপ্তবাক্যই গ্রহণ করিতে হইবে। দেখিতে সাধ হয়—সূক্ষ্ম চক্ষুঃ আবিষ্কার কর, সেইরূপ চস্‌মা পরিয়া দৃষ্টি নিঃক্ষেপ কর; যদি তাহা না পার, তবে যিনি নিজে দেখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার কথা শুন, যিনি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন, তাঁহার লেখা পড়, আর সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহের মর্ম্ম গ্রহণ কর। ইহাই আপ্তবাক্য বা বিশ্বস্ত বচন, ইহার প্রকৃত নাম আগম।

ঋষিগণ সত্যবাদী, অপ্রতিহতচক্ষুঃ, তাঁহারা যোগবলে লোক লোকান্তরে, গ্রহে উপগ্রহে পরিভ্রমণ করিয়া করুণাবশে লোকহিতার্থে পৃথিবীরাজ্যে যে অলৌকিক সংবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িয়া তোমরা গ্রহ নক্ষত্রের সংস্থান শিখিয়াছ, সমুদ্রের জলের হ্রাস বৃদ্ধির কারণ অবগত হইয়াছ, মণি, মন্ত্রও ঔষধের অচিন্ত্য শক্তিতত্বে অভিজ্ঞ হইয়াছ। জীবের পারলৌকিক গতির, স্বর্গ নরকাদির ও যমলোকাদির ব্যবস্থা রীতি পদ্ধতি প্রভৃতিও তাঁহাদের লেখা পড়িয়া অবগত হও।

ঋষিগণ সত্যবাদী, সত্যের অনুরোধে তাঁহারা অসঙ্কোচে মাতৃব্যভিচারকথা বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না, নিজের গ্লানিপূর্ণ জন্মবিবরণ স্বলেখনীমুখে জগতে আকল্প ঘোষণা করিতে বিমুখ ছিলেন না। তাঁহাদের কথা যদি সত্য বলিয়া স্বীকার না কর, তবে তোমাদের দুর্ভাগ্য।

স্বর্গ, নরক, যম ও যমালয়াদি সম্বন্ধে ঋষিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এ প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের কথা হইতে রেখা মাত্রও বিচ্যুতি ঘটে নাই।

বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই যুক্তি খুঁজিয়া বেড়ান, যুক্তি পাইলেই সন্তুষ্ট হন ও বিশ্বাস করিতে চাহেন; তাঁহারা আমার মতে কৃপার পাত্র; কেননা, মানবের বুদ্ধি-শক্তি সসীম শাস্ত্রের অর্থ অসীম, সেই অসীম পদার্থে সসীমের প্রভুত্ব কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। আজ পর্য্যন্ত মানুষ শাস্ত্রের যেরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য তত্ত্বে যেরূপ যুক্তি দেখিয়াছে, জানিনা শাস্ত্রের সেই অনন্ত অর্থ-সমুদ্রের পক্ষে তাহা কতদূর, সম্ভবতঃ অতি তুচ্ছ। তথাপি যুক্তিলিপ্সুর প্রমোদার্থে দুই একটা যুক্তির কথা বলিতেছিঃ—

মনে কর আমাদের রাজার শাসনে পাপী নিগৃহীত ও সৎকর্ম্মশীল পুরস্কৃত হন। পাপের ফলভোগের জন্য অস্ত্রধারী রক্ষিগণে পরিবেষ্টিত নরপতিসংস্থাপিত কারাগার বর্ত্তমান আছে। পুণ্যের পুরস্কারের জন্যই পদোন্নতি আছে।

পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা দুঃখ নাই। পৃথিবীর রাজা হইলেও শোক তাপ ও জরা মৃত্যুর দুঃখ আছে, এবং কারাবাসিগণেরও সুখ সুবিধা মন্দ নহে। ভারতের কারাবাস অনেকের কষ্টকর গৃহবাস অপেক্ষাও ভাল।

যিনি পৃথিবীমণ্ডলে থাকিয়া অনবরত দান, যজ্ঞ, দেবপূজা, অতিথি-সৎকার, দুঃখীর দুঃখ-মোচন, শরণাগতপরিত্রাণ এবং দেশ ও সমাজের হিতসাধন করিতেছেন, যিনি পিতৃভক্ত, মাতৃভক্ত ও গুরুভক্ত, সেই মহাপুরুষের পুণ্যের অনুপাতে পুরস্কারস্থান পৃথিবীতে কোথায়? এইরূপ সৎকর্ম্মের পুরস্কারের স্থান পৃথিবীতে নাই। সুতরাং, তাঁহার জন্য একটা ভাল স্থান আবশ্যক। যেখানে দুঃখ নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, কেবল নিরবচ্ছিন্ন অবিমিশ্র সুখ, সেই স্থানের অধিবাসী হওয়াই তাঁহার প্রকৃত পুরস্কার। শতবর্ষজীবী দেহেও সেই পুণ্যভোগ অসম্ভব, সুতরাং বহুবর্ষজীবী দেহান্তরও মানিতে হইবে, সেই স্থানই স্বর্গ এবং সেই স্বর্গ-ভোগের শরীরই বহুবর্ষস্থায়ী ও ভাস্বর।

এই যেমন পৃথিবীর বাহিরে স্বর্গের প্রয়োজন, তেমনি গুরুতর পাপের শাসনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বহুকালব্যাপী দুঃখভোগের জন্য নরকেরও প্রয়োজন। এমন অনেক পাপ আছে, যাহা বর্ত্তমান রাজশাসনে অপরাধ মধ্যেই গণ্য নহে। যে সকল অগম্যাগমনে হিন্দু-শাস্ত্রমতে তুষানলের ব্যবস্থা, সম্মত করিয়া তাহা করিলে রাজশাসন তাহার প্রতিকূল হইবে না; সুতরাং ঈদৃশ পাপের শাসনের উপায় কি? অনবরত পরপীড়নকারী পরস্বাপহারী, পরদারগামী, অগ্নিদও গরদ প্রভৃতি পাপীর শাস্তি দিবার স্থান তোমাদের পৃথিবী মধ্যে কোথায়? আর তাহার প্রতীকার অবশ্যই আছে, অতএব পৃথিবীর বাহিরে ঘোরতর কষ্ট-দায়ক কোনও স্থান আছে, তাহাই নরক।

পৃথিবীর রাজার শাসনে যেমন ম্যাজিষ্ট্রেট্ দ্বারা ছোট ছোট অপরাধগুলির বিচার হয়, বড় অপরাধের বিচার জেলা জজেরা করিয়া থাকেন, হাইকোর্ট ও প্রিভিঃ কাউন্সিল তাহার আপীল শুনেন, কিন্তু তাহাতেও দেখিতে পাই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মহত্যা ও স্ত্রীহত্যাকারী হাইকোর্টের সূক্ষ্ম বিচারেও আইনের ফাঁকে বেকসুর খালাস হইয়া আসে; পক্ষান্তরে নিম্ন আদালতে গুরুপাপে লঘুদণ্ড হইলে, ঊর্দ্ধ আদালতে তাহার দণ্ড বৃদ্ধিও হয়।

এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে এই যে গুরুতর অপরাধী দণ্ডিত হইল না, মহাপাতকী ও অতিপাতকী নির্দ্দোষ হইল, তাহার অর্থ কি? ইহা ঈশ্বরের পক্ষপাত বা অবিচার নহে, তাহার অর্থ রাজদণ্ডে পাপ শাস্তি হইয়া যায়, সুতরাং পৃথিবীর বিচারের এই প্রাণদণ্ডও ঈদৃশ গুরুতর পাপের পক্ষে কিছুই নহে, অতএব এই আদালত এ অপরাধের বিচারের অনুপযুক্ত। ইহার সূক্ষ্ম বিচার ও অনুরূপ শাস্তি আবশ্যক।

তোমরা আপাততঃ দেখিলে পাপী মুক্ত হইল, অমনি "বর্ত্তমান কলিকালে ধর্ম্ম নাই, পাপীর উন্নতি, ধর্ম্মের অবনতি, সত্যের পরাজয়, অসত্যের জয়, ঈশ্বরের বিচার নাই" ইত্যাদি কত কথা বলিয়া নাস্তিকতা অনুমোদন করিলে; কিন্তু সেই বিচার আজ হইল না, হইবে "বড়দিনের ছুটিতে", তোমরা এখন দেখিলে না, দেখিবে পরে। সে বিচার যাঁহারা করিবেন, তাঁহাদের চক্ষে ধূলি দিতে কেহ পারিবে না। তাঁহাদের ভ্রমপ্রমাদ নাই। সে বিচারে

সাক্ষী সাবুদেরও অভাব হইবে না। যে সকল সাক্ষীর সংবাদ বাদী বা পৃথিবীর বিচারক অবগত নহেন, অবগত থাকিলেও শমন দিয়া তাঁহাদিগকে আদালতে উপস্থিত করিতে সমর্থ নহেন, তাঁহারা বিনা শমনে আদালতে উপস্থিত হইলেও তাঁহাদের ভাষা বুঝিতে না পারিয়া এই মূল্যবান্ সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কারণ প্রকৃত দুভাষী নাই। সেই সকল সাক্ষী, সেই চন্দ্র, সূর্য্য, অনিল, অনল তথায় অবিকল সাক্ষ্য দিবে। আর সেই রাজা, সেই বিচারক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা পূর্ব্বক অনুরূপ শাস্তি প্রদান করিবেন। সুতরাং যুক্তিমতেও দেখা যায় স্বর্গ, নরক এবং যমালয় প্রভৃতি না থাকিলে ঈশ্বরের রাজত্বের কার্য্য শৃঙ্খলামত সম্পাদিত হইবে না।

স্বর্গ ও নরকের ন্যায় যম ও যমালয়েরও প্রয়োজন। কেহ কেহ বলেন—পরলোকে পাপ-পুণ্যের একটা বিবেচনা আছে, সেই কার্য্য ঈশ্বর স্বয়ং সম্পাদন করেন, তজ্জন্য দক্ষিণ পর্ব্বতে যমকে বসাইয়া রাখেন নাই। এই সকল ভ্রান্ত ধারণার সহিত শাস্ত্রের কোনও রূপ সম্পর্ক নাই।

আমরা জিজ্ঞাসা করি—ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি স্বয়ং সকল কার্য্যই পারেন বটে, ইহা অস্বীকার করা যায় না, তবে তিনি পরলোকের বিচার পারেন, আর ইহলোকের বিচারে নিজে অশক্ত হইয়া জজ ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়াছেন, রাজা মহারাজ পাঠাইয়াছেন, এ কথাও কি সরল মনে বিশ্বাস করিতে হইবে?

যেমন ইহলোকে ঈশ্বরের শক্তিতে অলৌকিক শক্তিবিশিষ্ট হইয়া একটা মনুষ্য কোটি কোটি মনুষ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হন, তেমনি পরমেশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া পারলৌকিক সূক্ষ্ম বিচারে ধর্ম্মরাজ যম নিযুক্ত আছেন।

পৃথিবীর রাজশাসনে যেমন রাজা, মন্ত্রী, দূত, রক্ষী ও অন্যান্য শত শত কর্ম্মচারী আছে, সুরম্য বিচারালয়, রাজপ্রাসাদ, উদ্যান, দীর্ঘিকা, নগর, সভা ও সভাসদ্ প্রভৃতি আছে, পারলৌকিক বিচারেও তাহাই থাকিবে। কি স্থূল রাজ্যে কি সূক্ষ্ম রাজ্যে, তাঁহার সকল রাজ্যই এক নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হইতেছে। স্থূল রাজ্য দর্শনে সূক্ষ্মরাজ্যের অনুমান, বাহ্য পূজা দ্বারা আন্তর পূজার অনুভব, ভগবানের সৃষ্টির এক অপূর্ব্ব কৌশল। আমরা এই নীরস যুক্তির কঠোর মার্গে আর অধিক অগ্রসর হইয়া পাঠকগণের অপ্রীতি উৎপাদন করিব না। পরিশেষে উদয়নাচার্য্যের কথাটা শুনাইয়া দিয়া গ্রন্থের উপসংহার করিবঃ—

পরলোকেঽপি সন্দেহে কুর্য্যুঃ কর্ম্মাণি মানবাঃ।
নাস্তি চেন্নহি নো হানি রস্তি চেন্নাস্তিকো হতঃ॥

পরলোক আছে কিনা এইরূপ সন্দেহ হইলেও কার্য্য কর, না থাকে হানি নাই, নাস্তিক হইয়া কর্ম্ম না কর, আর পরলোক থাকে তখন উপায় কি?

আমি উদয়নাচার্য্যের পদানুসরণ করিয়া বলিতেছি পরলোকের কাজ কর। যম, যমালয়াদি না থাকে, স্বর্গ ও নরক কল্পনা হয়, ক্ষতি নাই। যদি থাকে, আর কর্ম্ম না কর, তবে

কি গতি হইবে? কর্ম্মহীন! তখন কোথায় দাঁড়াইবে? কাহার শরণ লইবে? তজ্জন্যই বলিতেছিঃ—

ত্রিকালদর্শী সর্ব্বলোকহিতৈষী দয়ালু ঋষিবৃন্দের শরণাপন্ন হও, শাস্ত্রে, বেদে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক পিতৃপিতামহের আচরিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান কর, লোকান্তরগত পিতা-মাতার উপকারের জন্য, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সমধিক যত্নপর হও, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে মঙ্গল হইবে।

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে॥

শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভায় পঞ্জিকাসংস্কারের উদ্যম।

পঞ্জিকাসংস্কারবিষয়ক প্রস্তাব বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভায় বহুদিন যাবৎ উত্থাপিত হইয়াছে এবং পঞ্জিকাসমিতি নামে ব্রাহ্মণসভার একটী শাখাসভা স্থাপিত হইয়া পঞ্জিকাসংস্কারের চেষ্টাও বহুদিন যাবৎ চলিতেছে। দৃষ্টির সহিত গণিতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পঞ্জিকাগণনা করা যে কর্ত্তব্য, তাহা পঞ্জিকাসমিতির গত ভাদ্রমাসের অধিবেশনে সুস্পষ্ট নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং আর্যসিদ্ধান্তের উপর বীজ ব্যবহার করতঃ নূতন কারণগ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া, সেই গ্রন্থের দ্বারা যে পঞ্জিকা গণনা করিতে হইবে, ইহাও একরূপ স্থিরতর হইয়া গিয়াছে। প্রচলিত পঞ্জিকাসমূহ ভ্রমপূর্ণ বলিয়া যখন ব্রাহ্মণ-সভা নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং সেই ভ্রম সংশোধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করিতেছেন, তখন খুব শীঘ্র বঙ্গে একখানা বিশুদ্ধ পঞ্জিকা প্রকাশিত হওয়া যে বাঞ্ছনীয়, তদ্বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মত দ্বৈধ নাই।

প্রচলিত পঞ্জিকাসমূহ শুদ্ধ বলিয়া যতদিন লোকের বিশ্বাস ছিল, ততদিন তন্মতানুসারে ধর্ম্মকার্য্য করা দোষাবহ হয় নাই; কিন্তু যে দিন ব্রাহ্মণ-সভা এই সকল পঞ্জিকাকে অশুদ্ধ বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, সেই দিন হইতে অশুদ্ধ পঞ্জিকা দ্বারা সন্দিগ্ধচিত্তে ধর্ম্মকার্য্য করিয়া লোকের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড পণ্ড হইতেছে। ব্রাহ্মণ-সভার কার্য্যের উপর যাহাদিগের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে, তাহারা বিশুদ্ধ পঞ্জিকা পাওয়ার আশায় ব্রাহ্মণ-সভার মুখপানে চাহিয়া আছে; কিন্তু ব্রাহ্মণ-সভা তাহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না, শুনিয়াও শুনিতেছেন না বলিয়াই

বোধ হয়। কারণ, গত ভাদ্রমাসের পর এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে পঞ্জিকাসংস্কারের জন্য পঞ্জিকাসমিতির কোন উদ্যোগের কথা আর সাধারণের কর্ণগোচর হয় নাই। পঞ্জিকা-সমিতির সদস্যশ্রেণীতে যাঁহাদিগের নাম আছে, তাঁহাদিগকে পঞ্জিকাসংস্কার কার্য্যে অপারগ বলা যাইতে পারেনা; তথাপি কেন যে পঞ্জিকাসংস্কার হইতেছেনা, তাহা চিন্তা করিলে ব্রাহ্মণ-সভার কার্য্যের প্রতি সকলের মনেই কিছু সন্দেহ উপস্থিত হয়।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষার জন্যই ব্রাহ্মণসভার প্রয়োজন এবং সেই হেতুতে দেশের হিন্দুমাত্রেই ব্রাহ্মণ সভাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে—তদনুযায়ী সম্মানও করিয়া থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মণসভা সমাজ-শাসনের সামান্য খুঁটিনাটিতে নিয়ত ব্যস্ত থাকিয়া যদি ধর্ম্মরক্ষাকর মহদনুষ্ঠানসমূহকে উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে অনতিবিলম্বেই ব্রাহ্মণ-সভার প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা জন্মিবে এবং সেই অশ্রদ্ধার ফলে ব্রাহ্মণ-সভাও যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবে, তৎপক্ষে বোধ হয় কোনও সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মণ-সভা পঞ্জিকা-সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া যদি প্রচলিত পঞ্জিকা-সমূহকে ভুল বলিয়া নির্দ্ধারিত না করিতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ-সভার নিকটে বিশুদ্ধ পঞ্জিকা কেহ চাহিত না। কিন্তু যাহা ভুল বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে, আর ব্রাহ্মণ-সভার কোন কোন গণ্যমান্য অগ্রণী ব্যক্তি যাহা ভুল বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া ইতিমধ্যেই অন্য পঞ্জিকা মতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, পঞ্জিকার অভাবে তাহা অবলম্বন করিয়াই কিছুদিন ধর্ম্মকার্য্য করিতে হইবে, এরূপ ব্যবস্থা ব্রাহ্মণসভা দিতে পারিবেন কি? অশুদ্ধ পঞ্জিকা দ্বারা জ্ঞানকৃতভাবে একদিনও যদি ধর্ম্মকার্য্য করা যায়, তবে তাহা পণ্ড হইবে—একথা ব্রাহ্মণসভা অবশ্যই স্বীকার করিবেন। আর কেহ যদি ঐরূপ আচরণের দ্বারা শ্রাদ্ধাদি লোপ করিয়া বসেন, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে তিনি প্রায়শ্চিত্তার্হও হইবেন।

পঞ্জিকা হিন্দু-ধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন। বিশুদ্ধরূপে পঞ্জিকা গণিত না হইলে স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থার যে কি দুর্গতি হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। এ বৎসর গুপ্তপ্রেস প্রভৃতি প্রচলিত পঞ্জিকা-সমূহে গত ১৮ই বৈশাখ শুক্রাস্ত লিখিত হইয়াছিল। অবশ্য, স্মার্ত্তপণ্ডিত মহোদয়গণ উক্ত অস্তের উপরেই নির্ভর করিয়া পঞ্জিকায় কালাকালের ব্যবস্থাও দিয়াছিলেন। কিন্তু জাজ্জ্বল্যমান শুক্রগ্রহ কাহারও অপরিচিত নহে—অন্ততঃ শুকতারা বলিলে উহাকে অনেকেই চিনেন। আমি ২০শে বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া ২৩শে পর্য্যন্ত পশ্চিমাকাশে শুক্র দেখিলাম এবং অন্যকেও দেখাইলাম। ব্রাহ্মণ-সভাতেও এ বিষয়ে পত্র লিখিলাম—বোধ হয় আমার সে পত্র এখনও আছে। এস্থলে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, এই যে অশুদ্ধ কালাকালের ব্যবস্থা দ্বারা (কালাকালে ৬ দিন অগ্রপশ্চাৎ সহজ বিষয় নহে) দেশের ধর্ম্ম নষ্ট হইল, ইহার জন্য দায়ী কে? পঞ্জিকাপ্রচারকগণ, স্মার্ত্তপণ্ডিতমহোদয়গণ এবং ধর্ম্ম-রক্ষক ব্রাহ্মণসভা এই তিনের দায়িত্বের মধ্যে ব্রাহ্মণ-সভার দায়িত্বই বোধ হয় গুরুতর হইবে। তবে এই ধর্ম্মনাশকর পঞ্জিকা-বিভ্রাটকে ব্রাহ্মণসভা যদি দায়িত্ব বলিয়া জ্ঞান না করেন,

তাহা হইলে, দেশে ব্রাহ্মণসভা থাকার কি প্রয়োজন, ইহা সাধারণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে ; আর পঞ্জিকাসংস্কারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া কেন অনধিকার চর্চ্চা করা হইল, তদ্বিষয়েও বোধ হয় ব্রাহ্মণ-সভার একটা উত্তর দিতে হইবে।

যিনি যাহাই বলুন, কিন্তু পঞ্জিকা সম্বন্ধে শীঘ্র একটা কিছু স্থির করিতে না পারিলে ব্রাহ্মণ-সভার এবং তৎসঙ্গে পঞ্জিকাসমিতির সদস্যগণের যে লজ্জার কারণ হইবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গত বৎসর পঞ্জিকাসমিতির কোন কোন কার্য্যের ভার—আমার উপর অর্পিত হইয়াছিল। আমি আমার যথাসাধ্য সে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিয়াছিলাম। পঞ্জিকাসংস্কার কষ্টসাধ্য বলিয়া যদি ব্রাহ্মণ-সভা এখন প্রারব্ধ কার্য্য হইতে পশ্চাৎপদ হইতে চান, তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমার দ্বারা অথবা আমার অনুরোধে অন্যের দ্বারা এই কার্য্যের যতটুকু হইতে পারে তদ্বিষয়ে আমি যত দূর পারি চেষ্টা করিব।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজকুমার বাবুর উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত ভূতপূর্ব্ব পূর্ব্ববঙ্গপঞ্জিকাসংস্কার-সমিতি হইতে দৃক্‌সিদ্ধ বঙ্গপঞ্জিকা আমার দ্বারা গণিত ও প্রকাশিত হওয়ায়, এবং সম্প্রতি আমি ব্রাহ্মণ সভার পঞ্জিকাসমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ায়, পূর্ব্ববঙ্গের সংস্কারবাদিগণের মধ্যে অনেকেই আমার নিকট বিশুদ্ধ পঞ্জিকা চান। আমি এপর্য্যন্ত তাঁহাদের সকলকেই ব্রাহ্মণ-সভার ভরসায় আশাপথ নিরীক্ষণে রাখিয়াছি। কিন্তু এরূপ শুষ্ক ভরসায় বেশি দিন লোকের ধৈর্য্য থাকে না, সুতরাং ব্রাহ্মণসভার দিকে কেহ কেহ এখন বিদ্রূপের কটাক্ষপাত করিতেছে।

আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, গৃহে প্রবেশ না করিলে গৃহের প্রকৃত সংস্কার হয় না। যদি ব্রাহ্মণসভা এরূপ মনে করিয়া থাকেন যে একটা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত বা করণগ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া এবং তন্মতানুসারে বিশুদ্ধ পঞ্জিকা গণনা করাইয়া তার পর অশুদ্ধ পঞ্জিকা পরিত্যাগ করতঃ বিশুদ্ধ পঞ্জিকা গ্রহণ করিবেন, তাহা হইলে পঞ্জিকাসংস্কার হওয়া একেবারে অসম্ভব। যে পঞ্জিকা প্রকৃতই ভুল বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে, সেই পঞ্জিকা যে তন্মুহূর্ত্তেই পরিত্যাজ্য তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। তবে যাহাদিগের অন্তরের টান পরম্পরাগত ভুল পঞ্জিকার দিকে—আর মুখে মুখে কেবল পঞ্জিকা সংস্কারের কথা বলিতেছেন, সেই কুটিল-পন্থী ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে আমাদিগের কিছুমাত্র বলিবার নাই ; কারণ, ব্রাহ্মণসভাতে সেরূপ কেহ আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। দেশে সূক্ষ্ম দৃক্‌সিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রন্থ না থাকিলেও করণ গ্রন্থের অভাব নাই। আমার নিকট দুই একখানা আছে এবং চেষ্টা করিলে আরও দুই একখানা সংগ্রহ করা যায়। এই সকল করণগ্রন্থের মধ্যে যেখানাই ব্রাহ্মণ সভার বিচারে বিশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়, আপাততঃ তাহা দ্বারাই পঞ্জিকা গণিত হইতে পারে।

হিন্দুর অধিকাংশ ক্রিয়াকাণ্ডই বিশুদ্ধ তিথির উপর নির্ভর করে। বোম্বাই নিখিল ভারত-জ্যোতির্ব্বিৎ সম্মেলনে বর্ত্তমান ও আদিবিন্দু বিষয়ে মতদ্বৈধ উপস্থিত হওয়ায়, নক্ষত্র, সংক্রান্তি ও মলমাসাদিতে কিঞ্চিৎ সন্দেহ থাকিলেও তিথি গণনা যথাসম্ভব সূক্ষ্ম ও নিঃসন্দেহ রূপেই করা যায়। কারণ, রবি চন্দ্রের অন্তরাংশ দ্বারা তিথি গণিত হয় ; আদিবিন্দুর সহিত তিথির

কিছুমাত্র সম্ভব নাই। বিশুদ্ধ তিথি দ্বারা ক্রিয়াকাণ্ড আচরিত হইলে, হিন্দুর পৌনেষোল আনা ধর্ম্মই রক্ষা হয়। তার পর একবার বিশুদ্ধ দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা গ্রহণ করিয়া তন্মতে ধর্ম্ম কার্য্যাদি করিতে থাকিলে, সকলের সমবেত চেষ্টায় আদিবিন্দু স্থির হইতেও বোধ হয় বেশি দিন লাগেনা।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, সংস্কারের কাজ কখনও কোন দেশে সর্ব্ববাদি-সম্মত হয় নাই, সুতরাং এদেশেও হইবে না। পঞ্জিকা-সংস্কারের বিরোধী ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-সভাতে বোধ হয় দুই চারিজন আছেন। আর পঞ্জিকা-সংস্কারের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা নির্ণয় জন্য বঙ্গের নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মণ-সভায় যে সকল মতামত সংগৃহীত হইয়াছে; তাহার চৌদ্দ আনাই সংস্কারের পক্ষে দেখা যায়। অধিকাংশের মতেই যখন পঞ্জিকা-সংস্কার বাঞ্ছনীয়, তখন তাহা কর্ত্তব্য কিনা, সে বিষয় ব্রাহ্মণসভা অবশ্য ভালরূপ বিচার করিয়া দেখিবেন। আবার দেশে এরূপ পণ্ডিতও যথেষ্ট আছেন, যাঁহারা জ্যোতিঃশাস্ত্রের কিছুমাত্র আলোচনা না করিয়াই পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধে সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সকল মন্তব্য আবার খবরের কাগজেও প্রকাশিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, কার্য্যক্ষেত্রে উক্ত পণ্ডিতগণের মন্তব্যের কোনও মূল্য নাই। কারণ, ইঁহারা যখন সংস্কারবাদীর হাতে পড়েন, তখন সংস্কারের কথাই বলেন, আবার সংস্কারবিরোধীর হাতে পড়িলে সংস্কারের বিরুদ্ধ কথাই বলেন। যাহা প্রত্যক্ষ সত্য, তাহা কখনও গোপন থাকিতে পারে না—আপন শক্তিতে প্রকাশিত হইয়া আপন পথে আপনি অগ্রসর হয়। ব্রাহ্মণসভা পঞ্জিকা-সংস্কার না করিলেও একদিন পঞ্জিকা-সংস্কার আপনিই হইবে; কিন্তু সে কথাটা ব্রাহ্মণসভা সময় থাকিতে একবার চিন্তা করিয়া দেখিলে ভাল হয়। বোম্বাই মহাসভার যে বিশদীকরণগুলি ভারতবর্ষের সমস্ত প্রধান জ্যোতির্ব্বিদের সম্মতিক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যে বঙ্গীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর উপেক্ষার বস্তু নয়, অন্ততঃ এইটুকু আমাদিগের বুঝা উচিত। কারণ, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বঙ্গদেশে জ্যোতির্ব্বিৎ একবারে নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। যাহা হউক, ব্রাহ্মণসভা একবার পঞ্জিকা-সংস্কার কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিয়া যদি এখন আবার অকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দেশের লোককে এই কথাটী জানাইয়া দিতে যেন কাল বিলম্ব না করেন; ইহা স্মরণ করাইয়া দিয়া 'ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ' বলিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিলাম।

শ্রীকুলচন্দ্র জ্যোতীরত্ন ভট্টাচার্য্য।

কন্যাদায়।

আজকাল কন্যাদায় ও কন্যার বিবাহোপলক্ষে ব্যয় সম্বন্ধে এত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতেছে যে তাহাতে বোধ হয় যাবতীয় প্রয়োজনীয় কথা লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু সকলের প্রকাশিত সমস্ত প্রবন্ধ ও বক্তৃতাদি অবগত হওয়া দুরূহ ব্যাপার। আমি যে সকল কথা লিখিব বলিয়া মনস্থ করিয়াছি, তাহা হয়ত বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা আমার বিদিত নহে; যদি সমাজের কিছুমাত্র উপকারে আসে সেই আশায় এই প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কন্যাদায় সম্বন্ধে এখন যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার কারণ অনেকে নির্দ্দেশ করেন—পাত্র পক্ষের অত্যধিক অর্থের চাপ এবং এই চাপের হেতু কথিত হয় যে পাত্র অপেক্ষা কন্যা অধিক ও এক একটী ছেলের পাঠ সমাপ্ত করিতে বহু অর্থ ব্যয়িত হয় ও কৌলীন্য প্রথা। এই তিনটীর প্রত্যেকটী আমরা যথাসাধ্য বিবেচনা করিয়া দেখিব। প্রথমেই বলা যাইতে পারে কৌলীন্য প্রথা আর এই ব্যয়াধিক্যের জন্য ততোধিক দায়ী নহে। কারণ আজকাল দেখা যায় কুলীন অকুলীননির্ব্বিশেষে পাত্রের অবস্থা, শিক্ষা ও গুণাগুণের উপর বিবাহের ব্যয়নির্ভর করিতেছে। তবে ইহার উপরে এক কথা বলা যাইতে পারে যে কৌলীন্যপ্রথা একবারে তিরোহিত হয় নাই। কুলীন, ভঙ্গজ বা বংশজ যদি সকলই পরস্পরের ঘরে কন্যা প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে বিবাহের ক্ষেত্র অর্থাৎ পাত্রসন্ধানের স্থান খুব বিস্তীর্ণ হইয়া যায়, তাহার ফলে অনেক স্থানে অল্প ব্যয়ে পাত্র পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মনে হয় না, কারণ যদিও কৌলীন্যপ্রথা একেবারেই তিরোহিত হয় নাই, তথাপি আজ কাল কৌলীন্যবন্ধন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক শিথিল হইয়াছে। এখন ফুলিয়া মেলের কন্যা খড়দহ বল্লভী ও সর্ব্বানন্দী মেলে যাইতেছে এবং ঐ সকল মেলের কন্যাও ফুলিয়া মেলে আসিতেছে। যিনি নিজে স্বকৃতভঙ্গ তিনিও সৎপাত্র পাইলে ভিন্ন মেলে দুই তিন পুরুষ নামিয়া কন্যা-দিতেছেন। তাহাতে বিবাহ ব্যয় কমিতেছে কি? আমরা দেখিতেছি বিবাহ ব্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে। পাত্রের বাজার চড়া হওয়ায় এই সুবিধা হইতে পারে, যেখানে সমর্থ কন্যা কর্ত্তা অযোগ্য পাত্রকে কন্যা সম্প্রদান করিতেন, সে স্থলে তিনি সুযোগ্য পাত্র পাইতে পারেন। ইহা অবশ্য কমলাভের কথা নহে। পয়সাও খরচ হইবে, অথচ মনোমত পাত্রও পাইব না, ইহা নিশ্চয়ই অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। কিন্তু ইহা দ্বারা বিবাহের ব্যয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লাভ দেখা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ কন্যাধিক্য। এই কারণই লোকের মুখে শুনা যায়। লোকে বলে মেয়ে যদি এত অধিক হয় যে একটী পাত্রের জন্য পাঁচটী কন্যা গিয়া উপস্থিত হয় এবং দর বাড়াবাড়ি করে, তবে টাকা তো নিশ্চয়ই বেশী লাগিবে। এখন দেখা যাক বাস্তবিকই কন্যা এত

অধিক কিনা, যাহাতে সমাজের এই প্রকার অবস্থা দাঁড়াইতে পারে। এ প্রশ্ন এত কঠিন ও জটিল, যে ইহার উত্তর দেওয়া অতিশয় দুরূহ। এই প্রশ্নের উত্তর করিতে গেলে আদম-সোমারীর সাহায্য লইতে হয় ও সমাজের আভ্যন্তরীণ অনেক বিষয় সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিতে হয়। সে সব আলোচনার স্থল ইহা নহে এবং তাহাতে বিশেষ লাভও নাই, কারণ আমি হয়ত যুক্তি তর্ক দ্বারা এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, পাঠকবর্গের সেই যুক্তি ও তর্ক হয়ত মনোমত হইল না, সুতরাং আমার সিদ্ধান্তও অগ্রাহ্য হইল। তজ্জন্য আমি যুক্তি তর্কের পথ ছাড়িয়া দিয়া সমাজে যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহাই অবলম্বন করিব। বাস্তবিক দেখা যাক্ —বিবাহের বাজারে পাত্র অধিক কি কন্যা অধিক। আমার বিবেচনায় কন্যা তত অধিক বলিয়া মনে হয় না। পাঠকবর্গ হয়ত উপহাস করিবেন। কিন্তু দেখা যাক্ কয়টি মেয়ে অবিবাহিতা থাকে এবং কয়টি পুরুষই বা অবিবাহিত।

আমার উত্তর—মেয়ে একটিও অবিবাহিতা থাকে না, বরং দরিদ্র, অশিক্ষিত, শ্রোত্রিয়,বংশজ ও কুলীনের ঘরে আজকাল পুরুষ অবিবাহিত থাকে। তাহা হইলে এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে আমাদের কন্যাপেক্ষা পাত্রের সংখ্যাই কি অধিক? পাত্র মানে যদি ইহাই ধরা যায় যে বিবাহোন্মুখী পুরুষ, তাহা হইলে আমার উত্তর পাত্রের সংখ্যাই অধিক। ইহা কি করিয়া হইতে পারে? তাহার কারণ পুরুষ অনেক সময়ে একাধিকবার বিবাহ করে, কিন্তু স্ত্রীলোকের একাধিক বিবাহ হয় না। সুতরাং স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা সমান সমান হইলে বা পুরুষের সংখ্যা কিঞ্চিৎ কম হইলেও,পাত্রের সংখ্যা কন্যার সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হওয়া অসম্ভব নহে। যদি কেহ বলেন যে এই উক্তির দ্বারা আমরা বহুবিবাহ সমর্থন করিতেছি, তাহাতে আমার এই বক্তব্য যে সে মত আমি আদৌ প্রকাশ করিতেছি না। অল্প বয়সে স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে বা স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে দারান্তর গ্রহণ করা এখনও সমাজে প্রচলিত আছে এবং তাহা কেহই এখনও দূষণীয় বলিয়া ঘোষণা করেন না। তজ্জন্য যদিও বহুবিবাহ উঠিয়া গিয়াছে এবং এককালীন একাধিক স্ত্রীরক্ষা আর প্রচলিত নাই, তথাপি পুরুষের একাধিক বিবাহ হওয়ায় ও স্ত্রীলোকের একাধিক বিবাহ না হওয়ায় বাজারে কন্যাপেক্ষা পাত্র অধিক, ইহাই আমার বিশ্বাস।

তবে যদি বলা যায় কুলীনের ঘরে বংশজ শ্রোত্রিয়গণও কন্যা সম্প্রদান করিতে আসেন, কিন্তু কুলীনগণ তথায় কন্যা সম্প্রদান করিতে যান না, অতএব কুলীনের ঘরে নিশ্চয়ই কন্যাধিক্য হইবে। এই কথার উত্তর সহসা দেওয়া যাইতে পারে না। ইহাতে কতক সত্য থাকিতেও পারে, কিন্তু ইহা বিবাহের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ নহে, কারণ শ্রোত্রিয় ও বংশজের কন্যা কুলীনে সম্প্রদান হইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সমস্ত শ্রোত্রিয় ও বংশজ-পাত্রে বিবাহিতা হয়। তাহা হইলে যদি শ্রোত্রিয় ও বংশজের মধ্যে অতিশয় পাত্রাধিক্য হইয়া থাকে, তবে আজকাল অবস্থাপন্ন শ্রোত্রিয় ও বংশজ-পাত্র কেন কুলীনপাত্রের

সুযান্ অর্থ লইয়া থাকেন? অতএব আমার উত্তর কন্যাধিক্য এই বিবাহব্যয়বৃদ্ধির হেতু নহে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় বলা আবশ্যক। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে শাস্ত্রের বাক্য লঙ্ঘন করিতেছি বলিয়াই আমাদের সমাজের এই দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে, অর্থাৎ আমাদের শাস্ত্রে কথিত আছে যে বিদ্বান্ চরিত্রবান্ পাত্র দেখিয়া কন্যা দান করিবে; তাহা মান্য করা হয় না বলিয়াই আজ সমাজের এই দুরবস্থা। তাঁহারা বলেন আমরা শাস্ত্রবাক্য অবহেলা করিয়া চরিত্রহীন ও মূর্খ কুলীনপাত্রগণের প্রতি ধাবমান হই বলিয়াই কুলীনগণের কন্যাধিক্য হয় এবং তজ্জন্যই এই দুর্দ্দশা।

বিদ্বান্ ও চরিত্রবান্ শ্রোত্রিয় ও বংশজ পাত্রে অবাধে কন্যা সম্প্রদান করিলে এই অবস্থা থাকিবে না। ইহার আলোচনা আমি এক প্রকার পূর্ব্বেই করিয়াছি, সুতরাং আর অধিক কিছু লেখা অনাবশ্যক। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে পূর্ব্বে সমাজের এ বিষয়ে যে দোষই থাকুক, কিন্তু আজকাল আর সে কলঙ্ক দেওয়া যাইতে পারে না। আজকাল কন্যাকর্ত্তারা কন্যার জন্য প্রকৃতই সৎপাত্র অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। প্রথম চেষ্টা করিয়া থাকেন যদি অবস্থাপন্ন বিদ্বান্ পাত্র পাওয়া যায়। যদি উভয়গুণসম্পন্ন পাত্র না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কন্যার পিতামাতা অনেক সময়ে অবস্থাপন্ন মূর্খ পাত্রাপেক্ষা দরিদ্র অথচ বিদ্বান্ ও চরিত্রবান্ পাত্র মনোনীত করেন। আমাদের সমাজে এই উন্নতিটুকু স্বীকার করিতেই হইবে। কন্যার পিতামাতা জানেন চরিত্রহীন স্বামীর হাতে পড়িয়া কন্যা কখনই সুখী হইবে না; বরং বিদ্বানের হাতে পড়িলে মেয়ে সুখে কাল কাটাইতে পারে। অতএব আমরা দেখিতেছি বিদ্বান্ ও চরিত্রবান্ পাত্রের দিকে লক্ষ্য করিলে আমাদের এই বিপদ দূরীভূত হইবে না। বিদ্বান্ ও চরিত্রবান্ পাত্র সকল ঘরেই পাওয়া যায় না; সুতরাং সকলই যদি বিদ্বান্ ও চরিত্রবান্ পাত্র ব্যতীত কন্যা সম্প্রদান করিবেন না পণ করেন, তাহা হইলে এক পাত্রের জন্য পাঁচ কন্যা উপস্থিত হইবে।

এইবার আমরা দেখিব যে শিক্ষার ব্যয় এই বিবাহব্যয়বৃদ্ধির জন্য কতটা দায়ী। যদি বলা যায় যে ছেলে পড়াইতে বহু অর্থ ব্যয় হয় বলিয়াই তাহার বিবাহে টাকা লওয়া হয়, তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে একটী ছেলে পড়াইতে যে ব্যয় হয়, তাহার সম্পূর্ণ বা কিয়দংশ পোষাইয়া লওয়া হয়। বাস্তবিক ইহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে আজ সমাজের এই দুর্দ্দিন আসিত না। কারণ আমি যে টাকা খরচ করিলাম, তাহা যদি ফেরৎ পাই, তাহা হইলে দুঃখ কিসের? আজ আমি বরকর্ত্তা, আবার কাল আমি কন্যাকর্ত্তা;— সুতরাং আজ আমি বরকর্ত্তা হইয়া যে টাকা পাইলাম, কাল আমি সেই টাকা কন্যাদায়ে ব্যয় করিব, তাহা হইলে আর দুঃখ কিসের?

এতদ্ব্যতীত ছেলে পড়াইতে টাকা খরচ হয় বলিয়াই আমরা কন্যার পিতার নিকট সেই টাকা আদায় করিয়া লই, ইহা মনে করিলেও সমাজের প্রতি অতিশয় ঘৃণার উদ্রেক হয়।

আমাদের এই শিক্ষার বিস্তারে কি পরিণামে এই বৃদ্ধি হইল যে আমার পুত্র যে ব্যয় করিয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত হইল, তাহা কন্যার পিতা ঋণ করিয়া বা বাড়ী বা বিষয় বিক্রয় করিয়া দিবেন, নতুবা বিবাহ হইবে না ? আজকাল অনেকেই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত। দেশের কিসে উপকার হইবে, তাহা অনেকেই চিন্তা করিয়া থাকেন। তাঁহারাও কিন্তু পুত্রের বিবাহের সময় কন্যাকর্ত্তার নিকট হইতে অর্থ লইয়া থাকেন। এখানে অর্থ মানে নগদ টাকা নহে ; অর্থ মানে মূল্যবান্ সামগ্রী, যাহার জন্য কন্যাকর্ত্তাকে অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে।

তাহা হইলে এই সকল উচ্চ শিক্ষিত ও উচ্চ হৃদয়সম্পন্ন লোক যখন পুত্রের বিবাহে অর্থ লইতেছেন, তখন ইহার ভিতর এমন একটা, কিছু কারণ আছে, তাহার জন্য লোকের সদুদ্দেশ্য থাকিলেও ইহার প্রতিরোধ করিতে পারেন না। এই কারণটি কি ? ইহা বিলাস। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা মনে হয়, তাহাই বিবৃত করিতেছি। আমাদের বিলাসস্পৃহা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে বিবাহে টাকা না লইলে আর উপায় নাই।

ভদ্রঘরের এক একটি স্ত্রীলোকের অঙ্গে বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কার সর্ব্বত্র বিরাজমান। তাহার মূল্য ন্যূনকল্পে এক হাজার হইতে দুই হাজার টাকা। তদুপরি বহুমূল্যের বস্ত্রাদি ও অনেকগুলি করিয়া চাই। তাহার উপর গায়হলুদের তত্ত্ব, বিবাহের প্রশেসন্, মহাসমারোহে বউভাত আছে। প্রশেসন্ অবশ্য সকল বিবাহে হয় না, তথাপি পাত্রের বন্ধুবর্গ ও বহুনিমন্ত্রিত ব্যক্তি লইয়া যাইতেই হইবে। এই যে সব লিখিত হইল ইহার কম আর কিছুতেই হয় না ; ইহার উপর প্রত্যেক পাত্রের চেন ঘড়ি অত্যাবশ্যক। অতএব পাঠকবর্গ হিসাব করিয়া দেখুন এই সমস্ত ব্যয় একুন করিলে দুই হাজার হইতে তিন হাজার টাকার কম হয় কি না। যদি পাত্রের পিতা কন্যাকর্ত্তার নিকট কিছুই না লয়েন, তাহা হইলেও তাঁহাকে পুত্রের বিবাহের সময় এই টাকা ব্যয় করিতে হয়। আজকাল যে জীবন-সংগ্রাম উপস্থিত এবং এক একটি ছেলের শিক্ষার জন্য যে টাকা ব্যয় হয়, তাহাতে পাত্রের পিতাকে এই টাকা ব্যয় করিতে বলিলে যতদিন "পুত্রদায়" বলিয়া কোন দায় উপস্থিত না হয়, ততদিন পুত্র অবিবাহিত থাকিবে। কাজেই পাত্রের পিতা চেষ্টা করেন যাহাতে তিনি কন্যাকর্ত্তার নিকট হইতে তাঁহার ব্যয়ের যোগাড় করিতে পারেন। ইহার নাম অর্থলিপ্সা নহে। ইহাকে জীবন-সংগ্রামে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি বলা যাইতে পারে। যদি কেহ কাহাকেও আক্রমণ করে, তখন আক্রান্ত ব্যক্তি যেমন স্বভাবতঃই আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, সেইরূপ পাত্রকর্ত্তা তাঁহার ভাবী ব্যয়ের সংস্থান করিতেছেন। বধূর গাত্রে প্রচুর অলঙ্কার না থাকিলে নিজের মর্য্যাদা-হানি ও লোকনিন্দা, এমন কি ঘরে গৃহিণী পর্য্যন্তও বিরূপা। গায়েহলুদের তত্ত্ব ভাল করিয়া না পাঠাইলে কন্যার গৃহে সকলেই বিবাহের পূর্ব্বেই দুঃখিত হইলেন। বিবাহের পর ভালরূপ পলান্ন ইত্যাদি দিয়া বউভাত না করিলে লোকের নিকট যশঃ হইবে না। তবে উপায়ই বা কি ? কয়জন ছেলের বিবাহ দিয়া খরচ খরচা বাদ কিছু লাভ করিতে পারেন ? কেহ কেহ অবশ্য পারেন ; কিন্তু তাঁহার সংখ্যা অতি অল্প। এদিকে পুত্রের

বিবাহ দিয়া অনেকে ঋণী হইয়া পড়েন। সুতরাং আমরা পুত্রের বিবাহ দিয়া যে কিছু লাভ করিতে পারি না, ইহা মোটামুটি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আজকাল লোকের সাংসারিক খরচ এত বেশী এবং ছেলেপিলের লেখাপড়ার খরচ এত বেশী হইয়া উঠিয়াছে যে অল্প লোকেই ব্যয়ের সংকুলান করিয়া কিছু সঞ্চয় করেন। ইহার উপর কন্যাদায় উপস্থিত হইলে ঋণ করিয়া বিবাহ দিতে হয়। আর যদি পুত্রের বিবাহ দিতে হয়, তাহা হইলে কিছুই থাকে না, কাজেই কষ্ট উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। মনে করুন একজন পুত্রের বিবাহ দিয়া তিন হাজার টাকা পাইলেন, তাহার মধ্যে তাঁহার খরচ খরচা বাদ খুব বেশী করিয়া ধরিলে পাঁচশত টাকা ঘরে উঠিল। তাহার পরই যদি তাঁহার কন্যার বিবাহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাকেও তিন হাজার টাকা দিতে হইবে ও নিজব্যয়ও কিছু আছে। সুতরাং কন্যার বিবাহে তিনি যে টাকা দিলেন তাহার সাহায্য কোথা হইতেও হইল না।

একেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা দুরূহ ব্যাপার, তাহার উপর এই এক এক ধাক্কা খাইয় লোকে ক্রমশঃ উৎসন্নের পথে যাইতেছে। অধিক মূল্যবান অলঙ্কারাদির ব্যবহার সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি তদুত্তরে কেহ কেহ দুই এক কথা বলিতে পারেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন স্ত্রীলোকের সম্পত্তি ঐ গহনা, বিবাহের সময় যাহা কিছু পায় তাহা হইতে বঞ্চিত করা আমাদের উচিত নয়। বাস্তবিকই কি ইহা সম্পত্তি? সম্পত্তি হইলে তাহা হইতে কিছু আয় হওয়া উচিত। গহনা হইতে কি কখনও কাহরও কিছু আয় হয়? সকলেই জানেন আয় হওয়া দূরে থাকুক হাজার টাকার গহনা বিক্রয় করিলে সাতশত টাকা হওয়া কঠিন; আর ঐ হাজার টাকা হয় ত কন্যার পিতা ঋণ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার জন্য মাসিক সুদ দিতে হইতেছে। পাঁচবৎসর পরে যদি ঐ গহনাগুলি বিক্রয় করা যায়, তাহা হইলে ঐ গহনা বিক্রয় করিলে ঐ সাতশত টাকা আসিবে। আর কন্যার পিতার ঋণ হয়ত তত দিনে সুদে আসলে দুই হাজার টাকায় পরিণত হইয়াছে। ইহাই কি সম্পত্তি? যাহাতে পিতৃকুল ও ভ্রাতৃকুল নিঃস্ব ও সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, তাহাই কি কন্যার সম্পত্তি? অসময়ে কন্যা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে?

কন্যাদায়ে লোকে এরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে যে সেই কন্যা সন্তানাদি লইয়া অসময়ে পিতৃগৃহে বা ভ্রাতৃগৃহে আসিলে আর স্থান পায় না। তাঁহাদের মনে হয় এই কন্যাই তাঁহাদের সে অবস্থার কারণ। অতিশয় স্নেহের সামগ্রী হইলেও কন্যা আর সে আদর পায় না। পূর্ব্বে সমাজের এচিন্তা আদৌ ছিল না। স্ত্রীলোক মাত্রেই জানিতেন অসময় হইলে তাঁহাদের পিতৃগৃহ বা ভ্রাতৃগৃহ সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে। এখন সে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন লোকে কন্যার বিবাহ দিবার সময় কেবল এই চিন্তা করেন যে বিবাহ দিয়া কন্যার জন্য যেন আর চিন্তা করিতে না হয়; এবং তাঁহারা সুশিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন পাত্র দেখিয়া কন্যা সম্প্রদান করেন। যদি কোন কারণে জামাতা উপায়ক্ষম না হন, তাহা হইলে সে কন্যার আর দুর্দ্দশার সীমা থাকেনা। পিতা মাতা যথাসাধ্য ব্যয় করিয়া বিবাহ দিয়াছেন, তাঁহাদের আর দোষ কি?

তাঁহারা মনে করেন মেয়ের ভাগ্যের দোষ। জামাতা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ইহা অপেক্ষা অধিক দুর্দ্দশার-কথা। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোক ও তাহাদের সন্তানাদির কথা ভাবিলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। অকালেই সেই সকল ছেলের পাঠ সমাপ্ত হয়, তাহারাও তাহাদের জননী গলগ্রহস্বরূপ একজনের গৃহে অবস্থান করে, তাহাদের ভবিষৎ সম্পূর্ণ অন্ধকার, তাহাদের সহায় একমাত্র ভগবান। সমাজের এ অবস্থা পূর্ব্বে ছিল না। স্ত্রীলোকে অসহায় হইয়া কখনও এরূপ অবস্থায় পতিতা হইত না, পিতৃগৃহে বা ভ্রাতৃগৃহে সন্তানাদি সহ সমান অধিকারে লালিত পালিত হইত। অতএব আমরা দেখিতেছি এই ভীষণ যৌতুকপ্রথা কন্যাগণের সম্পত্তি নহে, বরং পিতৃগৃহে অন্ন সংস্থান থাকা কন্যার উৎকৃষ্ট সম্পত্তি।

ক্রমশঃ

কর্ম্মফল ও পুনর্জ্জন্ম

আজকাল অনেকের কাছে শুনিতে এবং গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে— "কর্ম্মফল ও পুনর্জন্ম বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করিয়া হিন্দুধর্ম্মকে ছারখারে দিয়াছে"। এই সকল কথা যে ভ্রান্তিমূলক, তাহাই এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য। অনাদিকাল হইতে সনাতনধর্ম্মের সহিত এই দুইটী তত্ত্বের গাঢ় সম্বন্ধ। এই দুই তত্ত্বের উপর হিন্দু বা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। সূত্র বাদ দিলে যেমন বস্ত্র নামে কোন বস্তু থাকে না, তদ্রূপ কর্ম্মফল ও পুনর্জন্ম ছাড়িয়া দিলে হিন্দুধর্ম্মের আর কিছু থাকে না।

প্রথম কর্ম্মফলের কথা বলা যাইতেছে। কর্ম্মফল নামক পদার্থ যদি অলীক হয়, যদি ভালমন্দ কর্ম্মের কোনরূপ উৎকর্ষ অপকর্ষ না থাকে, তবে জগতের কোন নিয়ম বা শৃঙ্খলা থাকিতে পারে না; চোর আর সাধু, ভণ্ড আর ধার্ম্মিক সমান ফলভাগী হইবে, ইহা আর্য্যমত হইতে পারে না। শুকদেব আর বেণ, যুধিষ্ঠির আর দুঃশাসন, শঙ্করাচার্য্য আর কাপালিকের জন্য স্বর্গরাজ্যে একই আসন বিস্তৃত; ইহা বিবেক মানিতে চায় না। সুতরাং নিয়ম তারতম্য ও শৃঙ্খলার জন্য কর্ম্মফল মানিতে হয়। কর্ম্মানুসারে ফলের পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে।

কর্ম্মফল বুঝিতে হইলে প্রথম কর্ম্ম কি তাহা বুঝা আবশ্যক। কৃ ধাতু মন্ প্রত্যয় করিয়া কর্ম্মশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, যাহা করা যায় তাহা কর্ম্ম। মন প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয়কে করণ বলে। জীব মনের অধিনায়কতায় অপর ইন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়) দ্বারা যাহা করে, তাহাই কর্ম্ম। দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং বচন, আদান প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম। এই সকল কর্ম্মের ভাল মন্দ ফল আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

যথা কটু কথায় একজনের অপ্রিয় এবং মিষ্ট কথায় অপরের প্রিয় হইতেছি। কোন জিনিষ গ্রহণে সুখানুভব এবং অগ্নি প্রভৃতি গ্রহণে কষ্টানুভব করিতেছি, কেহ চৌর্য্যাপরাধে বন্ধন দশা প্রাপ্ত হইতেছে, কেহ সদনুষ্ঠানে পুরস্কৃত হইতেছে। ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে শস্য উৎপন্ন হয়, তদন্যথায় উৎপন্ন হয় না। অনিয়মে রোগ হয় এবং ঔষধ সেবনে নিরাময় হয়। আজ যে পৃথিবীর লোক বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে ইয়ুরোপের মহাসমরে অদৃষ্টপূর্ব্ব সমরনৈপুণ্য প্রত্যক্ষ করিতেছে, তাহাও কর্ম্মফল। এই সকল গেল দৃষ্ট জগতের দৃষ্ট কর্ম্মফল। এখন কথা হইতেছে যে এই সকল কর্ম্ম ও তাহার ফল অস্বীকার্য্য নয়; কিন্তু ইহকালে ভাল মন্দ কর্ম্ম করিয়া পরকালে যে তাহার ফলভোগ করিতে হয়, তৎ সম্বন্ধে প্রমাণ কি? ইহার উত্তর শাস্ত্রও অনুভব।

ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ অপ্রত্যক্ষ এবং দুর্জ্ঞেয় যে সকল তত্ত্ব যোগবলে হস্তামলকবৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই শাস্ত্রাকারে নিবদ্ধ। আপৌরুষেয় বেদবাক্য ও অন্যান্য শাস্ত্রবাক্য দ্বারাই স্বর্গ, নরক, পরকাল, প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, ঈশ্বর প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় পদার্থনিচয় প্রমাণিত। বুদ্ধি, প্রাণ ও মন আছে তাহা সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু এই সকল পদার্থ কেহ কখন প্রত্যক্ষ করেন নাই, তবে তাহা আছে ইহা বিশ্বাস করিব কি প্রকারে? ইহার উত্তর শাস্ত্র, আপ্তবাক্য ও অনুভব ভিন্ন আর কিছু কেহ বলিতে পারিবেন না। যিনি শাস্ত্র মানেন না, তাঁহাকে হিন্দু বলা যাইতে পারে না, এবং এই সকল বিষয় তাঁহার সহিত আলোচ্যও নহে। শাস্ত্রের প্রতি অচল বিশ্বাস না থাকিলে কর্ম্মফলে বিশ্বাস ও ভগবানে আসক্তি জন্মে না। শাস্ত্র বুঝিতে গেলেও জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার ন্যায় শাস্ত্রবিহিত প্রণালীতে বুঝিতে হইবে। স্বেচ্ছাচারিতায় শাস্ত্রমর্ম্ম উদ্‌ঘাটিত হয় না। দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, গুরুশুশ্রূষা, ও ব্রত নিয়ম দ্বারা যাহার চিত্ত নিতান্ত নির্ম্মল হইয়াছে, তাহার চিত্তেই বোধবিধু উদিত হয়। হণ্টার সাহেবের থবা জার্ম্মাণ বুথ সাহেবের বেদ ব্যাখ্যা কিছুতেই ভ্রমপ্রমাদশূন্য হইতে পারে না। াহারা নিজেই ভ্রমপ্রমাদশূন্য নহেন, তাঁহাদের চিত্ত আর্য্যমতে বিশুদ্ধ অথবা নির্ম্মল নহে। যিনি নিজে ভ্রান্ত, তাহার সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হইতে পারে না। আর্য্য ঋষিগণ স্বার্থগন্ধশূন্য ও নিতান্ত নির্ম্মলচিত্ত ছিলেন, তাঁহাদের চিত্তে বেদজ্ঞান উদিত হইত।

তাঁহারা জগতের উপকারের জন্য বেদের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি দ্বারা জনসমাজে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

এখন অনেকে অন্ধের যষ্টির ন্যায় "প্রক্ষিপ্ত" কথাটাকে কুতর্কের অবলম্বন করিয়াছেন। যে শাস্ত্রপ্রমাণ নিজমতের পরিপন্থী, তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান। অনন্ত শাস্ত্রের মধ্যে কোন কথাই প্রক্ষিপ্ত নাই, এমন কথা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারা যায় না। কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত তাহা শাস্ত্র দ্বারাই নির্ণীত হয়। যে অংশ বেদবিরুদ্ধ, তাহা অবিসংবাদিত প্রক্ষিপ্ত, এবং পুরাণাদির যে সকল মত অন্য শাস্ত্রবিরুদ্ধ, অথচ অন্য কোন শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়, তাহাও প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে। কিন্তু যাহা বেদানুকূল, যাহা মনু প্রভৃতি

স্মৃতি, মহাভারত ও পুরাণাদি দ্বারা ব্যবস্থাপিত, তাহা কিছুতেই প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না। এখন কর্ম্মফল সম্বন্ধে শাস্ত্রমত প্রদর্শন করা যাইতেছে—

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ" (গীতা)

যতক্ষণ পর্য্যন্ত মন হইতে সমস্ত কামনা নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করিতে না পারা যায়, ততক্ষণ কেহই কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। কারণ সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ সকল সকলকে অবশ করিয়া কার্য্য করাইয়া থাকে। ইহকালের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল যে পরকালে ভোগ করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে মহামুনি পতঞ্জলি যোগদর্শনে লিখিয়াছেন—

ক্লেশমূলকর্ম্মাশয়া দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ
সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ

কর্ম্মজনিত সংস্কার বা অদৃষ্ট আত্মাতে সঞ্চিত থাকে। জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর দেহ বিনষ্ট হইলেও আত্মার বিনাশ হয় না, এই জন্য কর্ম্মজনিত সংস্কার আত্মাতে সঞ্চিত থাকে, এবং সেই কর্ম্মের শুভাশুভ ফলানুযায়ী জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ প্রাপ্ত হইয়া জীব পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারবলে কর্ম্ম করিয়া থাকে। আমাদের চিত্ত ফটোগ্রাফ যন্ত্রের কাচখণ্ডের ন্যায়। ফটোগ্রাফ যন্ত্রের সাক্ষাতে যে কোন পদার্থ উপস্থিত করা যায়, কাচখণ্ডে তাহাই প্রতিবিম্বিত হয়। সেই কাচখণ্ড হইতে যতবার ইচ্ছা সেই পদার্থের প্রতিকৃতি গ্রহণ করা যায়। তদ্রূপ জীব যত কর্ম্ম করে, সমস্ত কর্ম্মের প্রতিবিম্ব (ছাপ) চিত্তে পড়ে। সেই প্রতিবিম্ব বা ছাপের নাম সংস্কার। জীব জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ কার্য্য করিয়া থাকে। ফটোগ্রাফ যন্ত্রের কাচখণ্ড ধুইয়া পরিষ্কার করিলে তাহাতে যেমন আর পূর্ব্ব পদার্থের প্রতিকৃতি উঠান থাকে না, তদ্রূপ জ্ঞানবারি দ্বারা চিত্ত বিধৌত হইলে পূর্ব্বকর্ম্ম বীজ (সংস্কার) নষ্ট হইয়া যায়, এবং তাহা আর অন্য কর্ম্মের জনক হইতে পারে না। যতক্ষণ জ্ঞান দ্বারা সংস্কার নষ্ট না হয়, ততক্ষণ কর্ম্মফলে জীব বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারবলে জন্মমাত্রেই আহারাদি কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। পূর্ব্বসংস্কার না থাকিলে মনুষ্যের বা পশুর শিশুকে স্কুলে পাঠাইয়া দুগ্ধাদি পান করা শিক্ষা দিতে হইত। অনাদিকালসঞ্চিত কর্ম্মসংস্কারই আমাদের ইহ কালের কর্ম্মের জনক হয়। এই কর্ম্মফলের পার্থক্যেই বিচিত্র সৃষ্টি হইয়াছে। ভগবান কপিল বলিয়াছেন "কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টিবৈচিত্র্যং" কর্ম্মের বিভিন্নতায় সৃষ্টির বৈষম্য হইয়াছে। সৃষ্টি একরূপ না হইয়া বিচিত্র (নানাবিধ) হইল কেন? ইহার উত্তর একমাত্র কর্ম্মফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রাণিজগতের বৈচিত্র্য অনুধ্যান করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়—কেহ রাজা, কেহ ভিখারী, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ ভোগী, কেহ রোগী, কেহ জন্মাবধি অশেষ সুখের ক্রোড়ে বর্দ্ধিত, কেহ বা অনশনক্লিষ্ট, ইহার মূল কি? সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন ভগবানের রাজ্যে এইরূপ বিভিন্নতা কেন? ইহার উত্তর কর্ম্মবৈচিত্র্য, অর্থাৎ কর্ম্মফলানুসারে এই সৃষ্টিবৈষম্য।

কর্ম্মফল সম্বন্ধে আরও প্রমাণ এই,—

তস্মিন্ হি পুরুষব্যাঘ্রে কর্ম্মভিঃ স্বৈর্দিবংগতে।
ভবিষ্যতি মহী পার্থ! নষ্টচন্দ্রেব শর্ব্বরী॥

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব।

সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম স্বকীয় কর্ম্মফলে স্বর্গে গমন করিলে পর, পৃথিবী নষ্টচন্দ্র-কলঙ্কিতা রাত্রির ন্যায় দশা প্রাপ্ত হইবে।

পঞ্চাশতং ষট্ চ কুরুপ্রবীর! শেষং দিনানাং তব জীবিতস্য।
ততঃ শুভৈঃ কর্ম্মফলোদয়ৈস্ত্বং স্বরেষ্যসে ভীষ্ম! বিমুচ্য দেহম্॥

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব।

"হে ভীষ্ম! তাহার পর তুমি দেহত্যাগ করিয়া শুভ কর্ম্মফলে স্বর্গপ্রাপ্ত হইবে। এই শ্লোক দ্বয় দ্বারা কর্ম্মফলই যে ভীষ্মের স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

ততঃ প্রীতমনা রাজা প্রাপ্য যজ্ঞমনুত্তমং।
পাপাপহং স্বর্ণয়নং দুস্তরং পার্থিবর্ষভৈঃ॥"

রামায়ণ আদিকাণ্ড।

তাহার পর রাজা অন্যান্য রাজগণের অসাধ্য, পাপনাশক ও স্বর্গজনক উত্তম যজ্ঞ ··· ইহা দ্বারা যজ্ঞ (কর্ম্ম) ফলের পাপনাশকতা ও স্বর্গজনকতা প্রমাণিত।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ গীতা।

"অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥"

গীতা।

অন্ন হইতে ভূতগণ, বৃষ্টি হইতে অন্ন, যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি এবং যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা দ্বারা বেশ প্রতিপন্ন হইতেছে কর্ম্মফলই ভূতসৃষ্টির কারণ।

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।"

গীতা।

জনকাদি মহাত্মারা কর্ম্মদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

"স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" শ্রুতিঃ।

স্বর্গকামনাপরায়ণ ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে। এই অশ্বমেধ যজ্ঞরূপ কর্ম্মের ফল স্বর্গপ্রাপ্তি।

তমেব বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি।
ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা শ্রদ্ধয়া যজ্ঞেনানশনেন চ॥"

শ্রুতিঃ।

ব্রাহ্মণগণ বেদালোচনা, তদর্থ [illegible] চার, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, শ্রদ্ধা সহকারে দান, যজ্ঞ ও অনশন

দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার (মুক্তি) লাভ করিয়া থাকেন। এই আত্মসাক্ষাৎকার নিষ্কাম কর্ম্মফলেই হইয়া থাকে। এমন কি বেদের কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা স্বর্গাদিফলই কীর্ত্তিত হইয়াছে।

"শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাগ্‌দেহসম্ভবং।
কর্ম্মজা গতয়ো নৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ ॥ মনুঃ।

কায়মনোবাক্য দ্বারা যে সকল শুভাশুভ কর্ম্ম কৃত হয়, তদনুসারে লোকে উত্তম, মধ্যম ও অধম গতি প্রাপ্ত হয়।

সুতরাং, যে কর্ম্মফল বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত, যাহা হিন্দুর অস্থিমজ্জাগত, যাহা হিন্দুর সমস্ত নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, সেই কর্ম্মফল কথাটা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে আসিয়াছে, ইহা অহিন্দুর উদ্ভট কল্পনা বৈ আর কিছু বলা যায় না।

কর্ম্মফল সম্বন্ধে মোটামুটি যাহা বলা হইল, নিঃসন্দেহ হইবার পক্ষে তাহা নিতান্ত অপ্রচুর নহে। এখন জন্মান্তরসম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তি সংক্ষেপে প্রদর্শন করা যাইতেছে।

জন্মান্তর কথাটা কি তাহা অগ্রে বুঝা উচিত। অনাদি কর্ম্মবশে জীব (জীবাত্মা) এক একটী সূক্ষ্ম দেহের সহিত সম্বদ্ধ হয়, অবিদ্যাবশতঃ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের (বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রসমষ্টির নাম সূক্ষ্মদেহ) সহিত জীবের অভেদ জ্ঞান হয়। পরমার্থতঃ জীবের সহিত স্থূল বা সূক্ষ্মদেহের অথবা সুখদুঃখের কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও অভিমানবশে জীব দেহগত সুখদুঃখাদিকে আত্মধর্ম্ম (নিজধর্ম্ম) বোধে নিজেকে সুখী ও দুঃখী মনে করে। তত্ত্বজ্ঞান (মুক্তি) না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের সহিত সূক্ষ্মদেহের সম্বন্ধ ধ্বংস হয় না। স্থূল দেহকে আশ্রয় না করিয়া সূক্ষ্মদেহাধিষ্ঠিত জীবের ভোগ হয় না। সেইজন্য সূক্ষ্মদেহাধিষ্ঠিত জীব ঈশ্বরনিয়মাধীন কর্ম্মফলভোগের জন্য স্থূল দেহ গ্রহণ করে; এই স্থূল দেহগ্রহণ ও কর্ম্মফলানুসারে দেব, তির্য্যক্, মনুষ্য, কীটাদিদেহের অন্তর্গত।

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥"
গীতা।

মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র ধারণ করে, সেইরূপ জীব জীর্ণ শরীর (স্থূল দেহ) ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ ধারণ করে। এই যে নূতন দেহ ধারণ তাহাই জন্মান্তর, এবং এই যে দেহত্যাগ তাহাই মৃত্যু। কর্ম্মবশে জীব এই জন্মমৃত্যু অবস্থা প্রাপ্ত হয়। দেহের কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের ন্যায় জন্ম-মৃত্যুও জীবের অবস্থা বিশেষ।

সর্পের নির্ম্মোকপরিত্যাগের ন্যায় জন্মমৃত্যুতে জীবের অবস্থান্তরপ্রাপ্তি ভিন্ন যথার্থ পক্ষে উন্নতি বা অবনতি কিছুই হয় না। জীব ভাল কর্ম্মফলে ভাল গতি ও মন্দ কর্ম্মফলে মন্দ গতি প্রাপ্ত হয়। জীব কর্ম্মফলানুসারে ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক প্রভৃতি চতুর্দ্দশ লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। কোন্ লোকে কতকাল বাস করিতে হইবে, অথচ কিরূপ (উত্তমাধম) ভোগপ্রাপ্ত এবং কিরূপ (দেব, তির্য্যক্, মনুষ্য, কীটাদি) যোনি

প্রাপ্ত হইবে, তাহাও ঈশ্বরনিয়মাধীন কর্ম্মফলানুসারে নির্ণীত হয়। স্বর্গে গেলেও পুণ্যক্ষয়ে আবার ভূর্লোকাদিতে পতিত হয়, এবং পুণ্যসঞ্চয়ে আবার স্বর্গাদি লোকে গমন করে। নির্ব্বাণমুক্তি লাভ না করা পর্য্যন্ত কর্ম্মবশে জীব এইরূপ উত্তমাধম গতি লাভকরতঃ সুখদুঃখাদি ভোগ করে।

"ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্ ভবত্যধর্ম্মেণ।
জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্য্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ"॥

সাংখ্যদর্শন।

জীব ধর্ম্মফলে ঊর্দ্ধ গমন, অধর্ম্ম ফলে অধোগমন ও জ্ঞানদ্বারা বদ্ধ হয়।

"ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্"॥

গীতা।

বেদত্রয়বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ যজ্ঞ দ্বারা আমাকে (ভগবানকে) পূজাকরতঃ যজ্ঞশেষ সোমরসপানে নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গগতি প্রার্থনা করেন। তাঁহারা পুণ্যফলস্বরূপ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে উত্তম দেবভোগ্য সকল ভোগ করেন।

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে"॥ গীতা।

তাঁহারা সেই বিপুল স্বর্গসুখভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষীণ হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন এবং বেদত্রয়বিহিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কামনাপরতন্ত্র হওয়ায় সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকেন।

"কীদৃশং তু মহাপাপং ময়া দেহান্তরে কৃতং।
যেনেদং প্রাপ্যতে ঘোরং মহদ্দুঃখং সুদারুণম্॥

রামায়ণ সুন্দরকাণ্ড॥

আমি জন্মান্তরে কি মহাপাপ করিয়াছিলাম, যাহার ফলে এই সুদারুণ মহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হইতেছি?

"তৎ তথা ভবিতা ভদ্রে! বচস্তদ্ ভদ্রমস্ত তে।
দেহমন্যং গতায়াস্তে সর্ব্বমেতদ্ ভবিষ্যতি"॥

মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

হে ভদ্রে! তুমি যেরূপ প্রার্থনা করিয়াছ, তদ্রূপই হইবে, তুমি অন্য দেহ প্রাপ্ত হইলে এই সমস্ত হইবে, অর্থাৎ তোমার প্রার্থনা জন্মান্তরে পূর্ণ হইবে।

"যেন যেন যথা যদ্ যৎ পুরা কর্ম্ম সুনিশ্চিতম্।
তৎতদেবোত্তরং ভুঙ্‌ক্তে নিত্যং বিহিতমাত্মনা॥

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব।

যাহা দ্বারা যেভাবে যে কর্ম্ম পূর্ব্বে কৃত হয়, নিশ্চয়ই সে তাহা পরজন্মে ভোগ করে।

"আত্মনা বিহিতং দুঃখমাত্মনা বিহিতং সুখং।
গর্ভশয্যামুপাদায় ভজতে পূর্ব্বদেহিকম্" ॥ মহাভারত।

স্বকৃত পূর্ব্বজন্মের (কর্ম্মজন্য) সুখ দুঃখ জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া ভোগ করে।

"বালো যুবা বা বৃদ্ধশ্চ যৎ করোতি শুভাশুভং।
তস্যাং তস্যামবস্থায়াং ভুংক্তে জন্মনি জন্মনি ॥
মহাভারত শান্তিপর্ব্ব।

বালক, যুবা অথবা বৃদ্ধ অবস্থায় শুভাশুভ যে যেরূপ কর্ম্ম করে, জন্মান্তরে সেই সেই অবস্থায় তাহা ভোগ করে।

এই সকল শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা জন্মান্তর এবং উত্তমাধম গতির কারণ যে কর্ম্মফল তাহা প্রমাণিত হইল।

স্বর্গে গেলেও ভোগের নিবৃত্তি নাই, স্বর্গমধ্যে উত্তম স্থান তথায় বিচিত্র দেবভোগ পাওয়া যায়—এইমাত্র বিশেষ। পতনাদি তথায়ও আছে। রথচক্রের ন্যায় কর্ম্মচক্রের আবর্ত্তনে জীবনিবহ কখন উর্দ্ধে এবং কখন নিম্নে গমন করে।

ততঃ প্রহায়ামররাজজুষ্টান্ পুণ্যান্ লোকান্ পতমানং যযাতিং।
সংপ্রেক্ষ্য রাজর্ষিবরোঽষ্টক স্তমুবাচ সদ্ধর্ম্মবিধানগোপ্তা ॥ মহাভারত আদিপর্ব্ব।

পুণ্যলোক ইন্দ্রভবন ত্যাগ করিয়া যযাতিকে পতিত হইতে দেখিয়া ধর্ম্মবিধিপালক রাজর্ষি অষ্টক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন।

"যযাতিমিব পুণ্যান্তে দেবলোকাদিহ চ্যুতম্"। রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

যযাতির ন্যায় পুণ্যক্ষয়ে দেবলোক হইতে মর্ত্ত্যলোকে পতিত হইয়াছে। স্বর্গে গেলেও চিরশান্তি নাই, পুণ্যক্ষয়ে আবার পৃথিবীতে পতিত হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। জন্মান্তর সম্বন্ধে ভগবান স্পষ্ট বলিয়াছেন—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে"। গীতা।

বহু জন্মের পর জ্ঞানবান্ ব্যক্তি আমাকে প্রাপ্ত হয়।

"আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন!।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে"। গীতা।

হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতেও জীবগণ পুনরায় ভূলোকে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু হে কৌন্তেয় আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর জন্ম হয় না।

এই সকল পর্য্যালোচনায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে নির্ব্বাণমুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবনিবহ কর্ম্মফলানুসারে উচ্চাবচ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

শ্রীনবকুমার শাস্ত্রী।

রামপ্রসাদী গীত।*

প্রসাদী সুর—একতালা।

"মন রে ভোলা মামা, ও তুই জানিস্ নারে খরচ জমা।

যখন ভবে জমা হ'লি, তখন হইতে খরচ গেলি।

জমা খরচ ঠিক করিয়ে, বাদ দিয়ে তিন শূন্য নামা॥ ১

বাদে অঙ্ক হলে বাকি, তবে হবে তহবিল বাকি।

তহবিলে বাকি বড় ফাঁকি, হবে না তোর লেখার সীমা॥ ২

দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, কিসের খরচ কাহার জমা।

অন্তরেতে ভাব বসি কালী তারা উমা শ্যামা॥" ৩

"ভোলা মামা"—মায়াবচ্ছিন্ন ঈশ্বর ও অবিদ্যাবচ্ছিন্ন জীব, সুতরাং অবিদ্যাটী জীবের মাতৃস্থানীয়া; অথচ সৃষ্টিকর্ত্তা প্রথমেই মন ও অবিদ্যা সৃষ্টি করিয়াছেন, এইজন্য সাধক মনকে "ভোলা মামা" বলিয়াছেন। তথাহি—

"অবিদ্যোপাধিকো জীবো মায়োপাধিক ঈশ্বরঃ।

মায়াঽবিদ্যা গুণাতীত ইতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ৮

শঙ্করাচার্য্যকৃত বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ৩০

জমা—প্রারব্ধ কর্ম্ম—"ইদং শরীরমুৎপাদ্য ইহলোক এব সুখদুঃখাদিপ্রদং যৎ কর্ম্ম তৎ প্রারব্ধং ভোগেন নষ্টং ভবতি।" (শঙ্করাচার্য্যকৃত তত্ত্ববোধঃ।)

মান্যবর

শ্রীযুক্ত "ব্রাহ্মণ সমাজ" সম্পাদক মহাশয়

মান্যবরেষু—

সবিনয় নিবেদন এই,

গত পৌষ মাসের ব্রাহ্মণ-সমাজে "সাধক রামপ্রসাদ" শীর্ষক যে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে রামপ্রসাদের অধ্যাত্মশাস্ত্রাভিজ্ঞতার যে পরিচয় পাওয়া যায়—তাহা তদীয় জীবনসম্বন্ধে অতীব মূল্যবান্ তথ্য আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছে। আমি স্বাধীনভাবে রামপ্রসাদের কয়েকটী পরমার্থসঙ্গীতের ভাবানুধারণের দ্বারা যেরূপ তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি, তাহা "ব্রাহ্মণ-সমাজে" প্রকাশিত হইলে রামপ্রসাদ যে কেবল সাধারণ জ্ঞানের সাধক এই ধারণার পরিবর্ত্তে, তিনি যে অধ্যাত্মশাস্ত্রের গূঢ়মর্ম্মজ্ঞ ও অনুষ্ঠানকারী অতীব উচ্চশ্রেণীর সাধক এই বিশিষ্ট ধারণাই সকলের মনে উজ্জ্বলরূপে সমুদিত হইবে।

বিনয়াবনত—

লেখক।

যে কর্ম্ম এই শরীর উৎপাদন করিয়া ইহলোকে সুখদুঃখাদি প্রদান করে, তাহার নাম প্রারব্ধ কর্ম্ম। এই প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগদ্বারা নষ্ট হয়।

প্রথম পদ—জন্মিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, যথা :—

"জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" গীতা ২।২৭।

"জমা খরচ ঠিক করিয়ে"—পূর্ব্ব কর্ম্মফল ধ্বংস ও ভবিষ্যতে কর্ম্মফল সঞ্চিত না হইলেই জন্ম মৃত্যু রহিত হয়। মার্কণ্ডেয়পুরাণে অলর্কং প্রতি দত্তাত্রেয়বাক্যং—

"উপভোগেন পুণ্যানামপুণ্যানাঞ্চ পার্থিব!
কর্ত্তব্যানাঞ্চ নিত্যানামকামকরণাত্তথা॥
অসঞ্চয়াদপূর্ব্বস্য ক্ষয়াৎ পূর্ব্বার্জ্জিতস্য চ।
কর্ম্মণোবন্ধমাপ্নোতি শরীরং ন পুনঃ পুনঃ॥" ৩৯-৬।৭

হে রাজন্! পুণ্য ও পাপের ভোগ হইলে, কামনারহিত হইয়া নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, এবং পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মের নাশ হইলে ও অপূর্ব্ব অসঞ্চিত অর্থাৎ পাপ ও পুণ্যের সঞ্চয় না হইলে, পুনঃ পুনঃ শরীরের বন্ধন হয় না, অর্থাৎ পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। "তিনশূন্য"—(১) স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ ও কারণদেহের নাশ, (২) জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাত্রয় অতিক্রম করিয়া তুরীয় অবস্থা লাভ, (৩) সত্ত্ব, রজঃ তমোগুণের অতীত হওয়া, (৪) আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপত্রয়ের নাশ। প্রমাণ যথা :—

"নেত্রস্থং জাগ্রতং বিদ্যাৎ কণ্ঠে স্বপ্নং বিনির্দ্দিশেৎ।
সুষুপ্তং হৃদয়স্থস্তু তুরীয়ং মূর্দ্ধ্নি সংস্থিতম্॥"
ব্রহ্মোপনিষৎ ৩৫॥

আত্মা নেত্রস্থ হইলে জাগ্রদবস্থ, কণ্ঠস্থ হইলে স্বপ্নাবস্থ, হৃদয়স্থ হইলে সুষুপ্তাবস্থ এবং শিরঃস্থিত হইলে তুরীয়াবস্থ বলা যায়।

"একএবাত্মা মন্তব্যো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
স্থানত্রয়াদ্ব্যতীতস্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥
ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ ১১॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে এক আত্মাই বিরাজ করিতেছেন। যিনি স্থানত্রয় অতিক্রম করিয়া আত্মার তুরীয়াবস্থার উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না।

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥
মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" গীতা ১৪—৫।২৬

হে মহাবাহো! সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনগুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া দেহস্থিত নির্ব্বিকার দেহীকে সুখ দুঃখ মোহাদি দ্বারা আবদ্ধ করে। ৫। যিনি আমাকে একান্ত

ভক্তিযোগ দ্বারা সেবা করেন, তিনি এই সকল গুণ বিশেষরূপে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন। ২৬।

"তাপত্রয়বিমুক্তোহহং দেহত্রয়বিলক্ষণঃ।
অবস্থাত্রয়সাক্ষ্যস্মি অহমেবাহমব্যয়ঃ॥"

শঙ্করাচার্য্যকৃত ব্রহ্মনামাবলীমালা॥ ১৭॥

আমি তাপত্রয় (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক) বিমুক্ত, দেহত্রয় (স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ) বিমুক্ত এবং আমিই অবস্থাত্রয়ে (জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে সাক্ষী—স্বরূপ অহংপদ বাচ্য ক্ষয় রহিত ব্রহ্ম॥

"উপসর্গানশেষাংস্তু মহামারীসমুদ্ভবান্।
তথা ত্রিবিধমুৎপাতং মাহাত্ম্যং সময়েন্মম॥" চণ্ডী ১২।৮॥

আমার এই মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ করিলে মহামারীজনিত নানাপ্রকার উপসর্গ এবং স্বর্গীয়, আকাশীয় ও পৃথিবীর (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক) সমস্ত উৎপাত নষ্ট হইয়া যায়।

—দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যাইতে পারে যে মহাজনের খাতায় "তিনশূন্য" পড়িলেই দেনা পাওনা বাকি থাকে না।

দ্বিতীয়পদ—প্রারব্ধ কর্ম্ম হইতে ভুক্তকর্ম্ম বাদ দিলে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে "লেখার" বা জন্ম মৃত্যুর শেষ হইবে না। যথা মহানির্ব্বাণতন্ত্রে—

"যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভঞ্চাশুভমেব বা।
তাবন্ন যায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি॥" ১৪—১০৯

যতকাল পর্য্যন্ত জীবের শুভ বা অশুভ কর্ম্মক্ষয় না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত শত জন্মেও মুক্তি ঘটে না।

তৃতীয় পদ—তোমার প্রারব্ধ ও ভুক্ত কর্ম্মের বা তৎকার্য্য জন্ম মৃত্যুর দিকে লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন নাই; কেবল কালীর ধ্যানে মগ্ন থাক। প্রমাণ যথা—

তস্মাজ্ জ্ঞানবিচারেণ ত্যক্ত্বা বৈষয়িকং সুখং।
শাশ্বতৈশ্বর্য্যমিচ্ছন্ হি মদর্চ্চনপরো ভবেৎ।
তদৈব জায়তে ভক্তির্ময়ি ব্রহ্মণি নিশ্চলা।"

ভগবতীগীতা॥ ৩।৪৫॥

অতএব নিত্য সুখলাভে অভিলাষী হইলে, তত্ত্ববিচারপূর্ব্বকে বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিয়া আমার অর্চনায় রত হইবে। তাহা হইলে ব্রহ্মস্বরূপ আমাতে দৃঢ়ভক্তি হইয়া থাকে। এই ভক্তি জন্মিলে পাপপুণ্য ক্ষয় হইয়া মুক্তিলাভ হইবে।

শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী।

পঞ্জিকা-বিভ্রাট।

ধর্ম্মকার্য্যনাশের সহিত মনুষ্যের অধোগতির ঘনিষ্ট সম্পর্ক বর্ত্তমান, ইহা হিন্দুসাধারণের বিশ্বাস। ধর্ম্মকার্য্যসমূহ শাস্ত্রসম্মত সময়ে সম্পাদিত হইতেছে কিনা নিরূপণ করার একমাত্র উপায় পঞ্জিকা। পঞ্জিকার গণনা যদি বিশুদ্ধ হয়, তবে বিহিতকালে কার্য্যনিষ্পাদন-সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। ধর্ম্মকার্য্যব্যতীত ব্যাবহারিক কার্য্যেও পঞ্জিকার বিশেষ দরকার। প্রকৃতপক্ষে ঐহিক ও পারলৌকিক উভয়তঃ ফলভোগার্থ ক্রিয়াসাধনের প্রধান সহায়রূপে আমরা পঞ্জিকা ব্যবহার করিয়া থাকি।

বর্ত্তমান সময়ে এই বিশুদ্ধ পঞ্জিকার বড়ই অভাব বোধ হইতেছে। পঞ্জিকা-সংস্কারের জন্য আন্দোলন চলিতেছে; কিন্তু এই আন্দোলনের ফল কতকালে সমাজের লোকে ভোগ করিবে, তাহা একমাত্র বিধাতাপুরুষই জানেন। তবে মানুষের যাহা কর্ত্তব্য, তাহাও যে হইতেছে, ইহাই সুখের ও আশার বিষয়। কেবলমাত্র এখনই যে পঞ্জিকা-সমস্যা দাঁড়াইয়াছে তাহা নহে, পূর্ব্ব—পূর্ব্বকালেও এইরূপ বিভ্রাট, আন্দোলন ও সংস্কার হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন সময়ে বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহনক্ষত্রবেধদ্বারা পঞ্জিকা-সংস্করণোপ-যোগী বীজ সংগ্রহ করিতেন ও তদনুসারে পঞ্জিকা সংশোধিত হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যন্ত্র ও মানমন্দিরের সম্পূর্ণ অভাব, সুতরাং বীজ-সংস্করণ-বুদ্ধিও দেশ হইতে লোপ পাইয়াছে। আর একটী দুঃখের বিষয় যে সাধারণ গণক-সমূহ প্রসিদ্ধজ্যোতির্ব্বিৎসমূহের স্থান অধিকার করিয়াছেন। যে সমুদয় পঞ্জিকা প্রকাশিত হইতেছে, তাহাদের সবটীতে এই শ্রেণীর গণক আছে কিনা সন্দেহ। কেহ বা সারাজীবন জ্যোতিষ বা গণিত ব্যতীত অন্য শাস্ত্র আলোচনা করিয়া হঠাৎ একদিন পঞ্জিকা নকলনবিসের বা পৃষ্ঠপোষকের পদ গ্রহণ করিয়া স্বীয় মত প্রচারজন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। কেহ কেহ বা ধর্ম্মকার্য্যসম্পাদনের পঞ্জিকাদত্ত নির্দ্দিষ্ট সময়সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মাইয়া ধর্ম্মলোপের সাহায্য করিতেছেন। বস্তুতঃ, বিভ্রাটের সম্পূর্ণ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। এই সময়ে ধর্ম্ম-রক্ষণোদ্দেশ্যে সকলে একমত হইয়া পঞ্জিকা-সংস্কারকার্য্যে মনোযোগী হইবেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়। সাধারণ কার্য্যে দলাদলি স্থাপন করা দূষণীয়। এইরূপ গুরুতর ক্ষেত্রে দলাদলির কিরূপ বিষময় ফল হইতে পারে, তাহা সুধীগণের চিন্তনীয়।

প্রচলিত পঞ্জিকাগুলির ভ্রমসম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইতেছে। প্রায় প্রতিবৎসরই বিশেষ বিশেষ উৎসবের পূর্ব্বে পত্রিকাতে ইহার আলোচনা দৃষ্ট হয়। পঞ্জিকার গণক-সমূহ স্থলবিশেষে তাঁহাদের গণনার শুদ্ধিসম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন। ইহা তাঁহাদের পক্ষে প্রশংসার কথা। স্বকীয় কার্য্যে দোষানুসন্ধান করা ও দোষ দূরীকরণের চেষ্টা

মহত্তের লক্ষণ; প্রাণের বল না থাকিলে. প্রবৃত্তি উচ্চ না হইলে সংশোধন কার্য্যে ব্রতী হওয়া অসম্ভব।

কিছুদিন হইতে 'বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত' নামক একখান পঞ্জিকা প্রচলিত পঞ্জিকাসমূহ হইতে একটু ভিন্ন প্রকারে প্রকাশিত হইতেছে। উক্ত পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনে দৃষ্ট হয় যে দেশের বিশুদ্ধ পঞ্জিকার অভাব মোচন জন্য ইহার প্রচার। প্রকাশক, পরিদর্শক প্রভৃতির বিশ্বাস এই পঞ্জিকা বিশেষ শুদ্ধ, সুতরাং সর্ব্বসাধারণের গৃহীতব্য। দৃগ্গণিতৈক্যসাহায্যে এই পঞ্জিকা গণিত, এইরূপ প্রচারিত হইতেছে। দেশে বর্ত্তমান সময়ে দৃগ্গণিতৈক্য করিবার উপায় নাই, অতএব পাশ্চাত্য নাবিক-পঞ্জিকা ইহার মূলভিত্তি। রাজবিদ্যাকুশল একজন (ইংরেজী সাহিত্যের) অধ্যাপক ইহার পরিচালক, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ খ্যাতনামা একজন (দর্শন-শাস্ত্রের) অধ্যাপক ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক, পাশ্চাত্য নাবিক-পঞ্জিকা (কোন দেশবিশেষের নহে) ইহার মূলভিত্তি। সাধারণ চক্ষে দেখিতে হইলে এই তিনের সংযোগের ফল যে আদরণীয় হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ। পঞ্জিকার অঙ্গীভূত কোন বিষয়ে 'বিশুদ্ধসিদ্ধান্তপঞ্জিকা' প্রচলিত পঞ্জিকাসমূহ হইতে শুদ্ধতররূপে গণিত কি না, তাহারই একটু আলোচনা করা যাউক।

(১ সাধারণ প্রচলিত পঞ্জিকাসমূহ সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে গণিত, সুতরাং উক্ত সিদ্ধান্তোক্ত গণনা-প্রণালীর সাহায্যে ইহাদের গণনার শুদ্ধি পরীক্ষিত হইতে পারে। 'বিশুদ্ধসিদ্ধান্তের' গণনা-পরীক্ষার সেইরূপ সুযোগ নাই, কারণ ইহা কোন্ দেশীয় নাবিকপঞ্জিকার অনুবাদ তাহা অপ্রকাশ্য। ইহাতে কি এই পঞ্জিকার গণনাশুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ হয় না? অন্যান্য পঞ্জিকা হইতে ইহার প্রথম বিশিষ্টতা যে ইহার মূল গুপ্ত।

(২) পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে বিজ্ঞাপনে প্রকাশ 'বিশুদ্ধসিদ্ধান্তের' গণনা নাবিকপঞ্জিকা হইতে গৃহীত। কিন্তু পঞ্জিকার আদিতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে বর্ষমান সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইতে গৃহীত। সূর্য্যসিদ্ধান্তেরও নাবিকপঞ্জিকার বর্ষমানের পার্থক্য আছে। সূর্য্যসিদ্ধান্তের গণনাতে ভুল আছে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যাহারা সূক্ষ্মতর গণনার পক্ষপাতী, তাহাদের পক্ষে এই অশুদ্ধগণনার আশ্রয় লওয়া কি 'বিশুদ্ধসিদ্ধান্তের' বিশুদ্ধ গণনার দৃষ্টান্ত? প্রচলিত পঞ্জিকাসমূহেও সূর্য্যসিদ্ধান্তের বর্ষমান গৃহীত হইতেছে; সুতরাং এই বিষয়ে 'বিশুদ্ধসিদ্ধান্তের' প্রয়োজন কোথায়?

(৩ পাশ্চাত্য নাবিক পঞ্জিকাসমূহ সায়নমতে গণিত, আমাদের দেশের পঞ্জিকাসমূহ নিরয়ণ-মতে গণিত। সায়নও নিরয়ণ মতের আদিবিন্দুদ্বয়ের অন্তরকে অয়নাংশমান বলে। পাশ্চাত্য জ্যোতির্গ্রন্থে এই অয়নাংশের বাৎসরিক মান ৫০''·২ বিকলা, কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে কিছু অতিরিক্ত, (ইহার কারণ আছে)। 'বিশুদ্ধসিদ্ধান্তে' অয়নবেগ পাশ্চাত্যমতে গৃহীত হয় নাই। ইহা কি দৃগ্গণিতৈক্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ? এই পঞ্জিকার বিশুদ্ধির বিজ্ঞাপনের ইহাও কি একটি কারণ?

(৪) পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সমুদয় জ্যোতির্গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উক্ত আছে—বর্ত্তমানসময়ে সায়নপঞ্জিকার আদিবিন্দু অর্থাৎ যে বিন্দু হইতে সায়নপঞ্জিকার বর্ষারম্ভ গৃহীত হয়—পশ্চাদ্ভাগে হটিতেছে। অথচ, 'বিশুদ্ধসিদ্ধান্তে' স্পষ্টভাবে লিখিত আছে "আমাদের আদিবিন্দু পূর্ব্বাভিমুখে চলিতেছে।" আদিবিন্দুর বিপরীত দিকে গতি ও কি দৃগ্গণিতৈক্যের একটি দৃষ্টান্ত? ইহাকে কি সংস্কার বলে? এই অভিনব মতের জন্য দায়ী কে? নূতন কিছু বলিলেই কি হয়?

(৫) এই আদিবিন্দুর উপর সৌরসংক্রমণ, রাশি, নক্ষত্র প্রভৃতি নির্ভর করে। আদিবিন্দুর কোন গোল থাকিলে, পঞ্জিকাতে এই সব বিষয়ের গণনারও ভুল হইবে। আমাদের ধর্ম্মকার্য্য বা ব্যবহার কার্য্যে রাশি, নক্ষত্র, সৌরমাস প্রভৃতির বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং, এই সব বিষয়ে ভুল থাকিলে সব কার্য্য লোপ হওয়ার আশঙ্কা। 'বিশুদ্ধসিদ্ধান্তে' এই আদিবিন্দুর গোলমাল আছে; অতএব 'বিশুদ্ধসিদ্ধান্তের' সাহায্যে কার্য্য করা সঙ্গত কিনা সুধীগণের চিন্তনীয়।

(৬) দীর্ঘতম বা হ্রস্বতম দিবা বা রাত্রি বৎসরের একটিমাত্র তারিখে সম্ভবে; আমাদের দেশীয় সিদ্ধান্ত ও পাশ্চাত্য গ্রন্থসমূহ এই বিষয়ে একমত। 'বিশুদ্ধসিদ্ধান্তে' ক্রমান্বয়ে তিন তারিখে দীর্ঘতম্ বা হ্রস্বতম দিবা বা রাত্রি লিখিত আছে। 'বিশুদ্ধসিদ্ধান্তে' কোন্ বিষয়ে নাবিকপঞ্জিকার অনুবাদস্বরূপে বিশুদ্ধ গণনার পরিচয় দিতেছে, তাহা এতগুলি বিষয়ে বুঝা গেল না। 'বিশুদ্ধসিদ্ধান্তের' দৃগ্গণিতৈক্যের আরও উদাহরণ দেখাইতে হইবে কি?

৭) 'বিশুদ্ধসিদ্ধান্তের' দৈনিক দিবা ও রাত্রিমানে ভুল আছে। পাশ্চাত্য নাবিক-পঞ্জিকার সূর্য্যের ক্রান্ত্যংশ কোন্ বীজ সংস্কৃত করিতে হইবে তদ্বিষয়ে ধারণা না থাকিলেই এইরূপ ভুল সম্ভবপর। এইরূপ মারাত্মক ভুল থাকিয়াও যে পঞ্জিকা বিশুদ্ধ হইতে পারে, তাহা একমাত্র 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত' পঞ্জিকার চালকগণই বলিতে পারেন।

(৮) শাস্ত্রসমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে তারিখে দিবা ও রাত্রিমান তুল্য দৃষ্ট হইবে, সেই তারিখে বিষুব-দিন। বিষুব-দিনেই রবির সায়ন মেষ বা তুলা ?) সংক্রান্তি। 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্তে' অন্য রকম দেখিতে পাই। যে তারিখে দিবা ও রাত্রিমান সমান দৃষ্ট হয়, সেই দিন রবির সায়ন মেষ বা তুলাসংক্রান্তি উল্লিখিত না হইয়া অন্য তারিখে উক্ত হইয়াছে। ইহাও কি দৃগ্গণিতৈক্যের ফল? প্রচলিত পঞ্জিকাসমূহে এই দোষ নাই।

(৯) পঞ্জিকাগণনার বাকী রহিল তিথি। 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে' ইহার গণনা প্রণালী প্রচলিত পঞ্জিকাসমূহে তিথিগণন-প্রণালী হইতে ভিন্ন নহে। যে পঞ্জিকাতে এতগুলি বিষয়ে দোষ বর্ত্তমান, তাহাতে যে এইটি নির্ভুল, ইহা বলা বড়ই দুঃসাহসিকের কার্য্য। সময়ান্তরে প্রয়োজন হইলে ইহার ও অন্যান্য অবশিষ্ট বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা হইবে।

যদিও বিজ্ঞাপনে লক্ষিত হয় যে 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত' নাবিক-পঞ্জিকার অনুবাদ মাত্র, কিন্তু বিশেষ পরীক্ষা করিলে দৃষ্ট হয় যে প্রকৃতপক্ষে নাবিক পঞ্জিকার সহিত সম্পর্ক খুব কম।

সংস্কারের নামের দোহাই দিয়া কোন কোন স্থলে প্রাচীন মতানুসরণ, কোন কোন স্থলে স্বীয় অভিনব মত প্রচারহেতু প্রচলিত পঞ্জিকাসমূহ হইতে শুদ্ধতর না হইয়া বরং বিপরীত হইয়াছে। যদি ধর্ম্ম রক্ষা করা পঞ্জিকা প্রচারের উদ্দেশ্য হয়, তবে এইরূপভাবে পঞ্জিকা প্রকাশের আবশ্যকতাসম্বন্ধে এই পঞ্জিকার পরিদর্শক ও অর্থদাতা পৃষ্ঠপোষকের বিশেষ চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। এই সব দেখিয়া মনে হয় "বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা" ?

প্রাপ্তপত্র।

মাননীয় !

শ্রীযুক্ত "ব্রাহ্মণ-সমাজ" পত্রিকা সম্পাদক

মহাশয় সমীপে।

সবিনয় নিবেদন—

কালের কুটিল গতিতে সনাতনধর্ম্মের বড়ই দুর্দ্দিন উপস্থিত। কিছুকাল পূর্ব্বেও এ দেশে পঞ্চবটী, পঞ্চমুণ্ডির আসন ইত্যাদি সাধনমার্গানুসরণকারী মহাত্মাগণদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্তদবলম্বনে তাঁহারা সাধনমার্গে গমনপ্রয়াসী অন্যকেও প্রলুব্ধ করিয়া যাইতেন। অধুনা সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠা ত দূরের কথা, এখন কেহ সেই সমস্ত স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইলেও মত-বিরোধনিবন্ধন নানা সন্দেহে সন্দিহান ও অধিকাংশের বিদ্রূপাত্মক বাক্যে তাঁহার মনের ইচ্ছা মনেই বিলীন হইয়া যায়। অন্য একটী বিষয়ের মীমাংসার জন্য মহাশয়ের শরণাপন্ন হইয়াছি। আশা করি ব্রাহ্মণ সমাজ পত্রিকায় ইহা প্রকাশ করিয়া দেশপূজ্য পণ্ডিতমণ্ডলীরমত প্রকাশবিষয়ে মহাশয় আনুকূল্য করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

"পঞ্চবটী" সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিয়া বিশেষ সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছি; কিছুকাল পূর্ব্বে আমাদের এ প্রদেশেও পঞ্চবটীর অভাব ছিলনা; আমার কার্য্যস্থানের অনতি-দূরবর্ত্তী ধীতপুর গ্রামে তাপসপ্রবর স্বর্গীয় মহাত্মা রমাকান্ত তর্কসিদ্ধান্তমহোদয়ের পঞ্চবটীর ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। উক্ত মহাত্মার বংশধরগণ ধীতপুর ও শিমুলজানি গ্রামে বাস করিতেছেন।

পঞ্চবটীসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমি তিনটী মত সংগ্রহ করিয়াছি।—

১। শব্দকল্পদ্রুমে লিখিত আছে, ৪ হাত বেদী করতঃ অশ্বত্থ, উত্তরে বিল্ব, পশ্চিমে বট, দক্ষিণে ধাত্রী, ও অগ্নিকোণে অশোক রোপণ করিয়া ৫ বৎসর পর প্রতিষ্ঠা করিবে।

২। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রতিষ্ঠিত পঞ্চবটীতে বট, অশ্বত্থ, নিম্ব, আমলকী ও বিল্ব বৃক্ষ ছিল। (রাঃ কথামৃত ১ম ভাগ ৫ পৃঃ) এবং সচরাচর পঞ্চবটী। পরিমাণ চারিবর্গ হস্ত। এক কোণে নিম্ব, এক কোণে বিল্ব, এক কোণে অশ্বত্থ অথবা বট, এক কোণে শেফালিকা এবং মধ্যস্থলে আমলকী বৃক্ষ রোপণ করিতে হয়। সেইরূপ পঞ্চবটী প্রস্তুত করিয়া পরমহংসদেব তন্মধ্যে বৃন্দাবনের ধূলি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। (রামকৃষ্ণ-চরিতামৃত, ভুবনচন্দ্র মুখার্জ্জি প্রণীত ১৮ পৃঃ।

৩। শ্রীযুক্ত নিগমানন্দ সরস্বতী তাঁহার "তান্ত্রিক গুরুতে" লিখিয়াছেন, "পঞ্চবটী" নির্ম্মাণ করিতে হইলে, দীর্ঘ প্রস্থে চারি হাত (চারি বর্গ হাত পরিমিত স্থান) স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া এক কোণে বিল্ব, দ্বিতীয় কোণে শেফালিকা, তৃতীয় কোণে নিম্ব, চতুর্থ কোণে অশ্বত্থ বা বট এবং মধ্যভাগে আমলকী বৃক্ষ রোপণ করিতে হয়। ঐ স্থানের চারিদিকে রক্তজবা ফুলের দ্বারা বেড়া দিয়া তাহার পার্শ্বে মাধবীলতা কিম্বা কৃষ্ণা অপরাজিতা বেষ্টিত করিয়া দিতে হয়। মধ্যস্থলে তীর্থস্থানের পবিত্র রজঃ দ্বারা শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়, ইহাই পঞ্চবটী। (তান্ত্রিক গুরু ১২৯ পৃষ্ঠা)

এখন জিজ্ঞাস্য (১) কোন মত ঠিক ? (২) বেদী কয় হাত ? (৩) হস্তের পরিমাণ সাধারণ হাত কি বর্গহস্ত ? (৪) বর্গহস্ত ও সাধারণ হাতের পরিমাণ কি ? (৫ তপস্যার জন্য কুটীর নির্ম্মাণ করিতে হইলে কোন্ স্থানে করিতে হইবে ? তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে কি না ? (৬) বৃক্ষগুলি বেদীর উপরে কি বেদী ছাড়াইয়া রোপণ করিতে হইবে ? (৭) প্রতিষ্ঠা কত দিন পরে কি নিয়মে করিতে হইবে ? (৮ পঞ্চবটীতে জলাদি কার্য্যের বিশেষত্ব কি কি আছে ? (৯) বৃক্ষ রোপণের কোন সময় নির্দ্ধারিত আছে কিনা ? আশা করি দেশপূজ্য পণ্ডিতমণ্ডলী ও পঞ্চবটীসাধকগণ ইহার বিশদ উক্ত ব্রাহ্মণ সমাজ পত্রিকায় করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন এবং কোথায় পঞ্চবটী বিদ্যমান আছে, জানাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। ধীতপুরগ্রামে যে পঞ্চবটীর ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে, তাহাতে কি কি বৃক্ষ ছিল, অনুসন্ধানে জানিতে পারি নাই। আশা করি এই পঞ্চবটীসংস্কারে কোন ক্ষমতাপন্ন মহাত্মা হস্তক্ষেপ করিয়া স্বর্গীয় মাহাত্মার নাম জাগরূক রাখিবেন।

সংবাদ।

পাইকপাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদারবংশের স্বনামখ্যাত কুমার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্রসিংহ মহাশয়ের রাজোপাধিলাভে আমরা আজ আনন্দিত।

প্রাচীনকাল হইতে গুণের সম্মাননার জন্য উপাধিবিতরণপ্রথা সকল দেশে সকল সমাজেই প্রচলিত। মানবধর্ম্মশাস্ত্রে বলিয়াছেন "রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ" যে জমিদার প্রজারঞ্জক অর্থাৎ প্রজাবর্গকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় প্রতিপালনপরায়ণ, তিনি রাজা; মানবধর্ম্মশাস্ত্রের বিধিই সকল সমাজের সমাজনীতি। রাজকীয় রাজা-উপাধিসম্মানও সেই নীতিমূলক।

কিন্তু আমাদেরই ত্রুটিতে নির্ব্বাচকের নির্ব্বাচনেও কোন কোন স্থলে ভ্রমপ্রমাদ পরিদৃষ্ট হয়। তাহারই ফলে কানা ছেলের পদ্মলোচন নামের ন্যায় গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত উপাধিও নিরর্থক হইয়া পড়ে। প্রজাপীড়ক স্বার্থপর জমিদারও কখন কখন রাজকীয় রাজোপাধি মণ্ডিত হইয়া তুলসীবনের লুক্কায়িত ব্যাঘ্র অপেক্ষা আরও ভীষণ হইয়া প্রজাবর্গকে নিরতিশয় উৎপীড়িত করিয়া তোলেন। প্রজারঞ্জক স্বধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র সিংহ মহোদয়ের রাজোপাধিতে সেরূপ আশঙ্কার বিন্দুমাত্রও অবকাশ নাই তাই তাঁহার রাজোপাধিলাভে তাঁহার প্রজাবর্গ সকলেই আনন্দিত, সকলেই উৎসাহিত; এই সকল সংবাদ বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়া আমরা তাঁহাকে রাজোপাধিপ্রদানের সার্থকতা অনুভব করিয়া বিশেষ আনন্দের সহিত সদাশয় গভর্ণমেণ্টপক্ষকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, এবং নবীন রাজা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর মহোদয়কেও কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, তিনি সুস্থ শরীর ও দীর্ঘজীবন লাভ করুন। যে নীতি অবলম্বন করিয়া তিনি প্রজাবৃন্দের আনন্দ-নিদান হইয়াছেন, সেই পুত্রবৎ প্রজাপালন ব্রতের উন্নতি বিধান করিয়া রাজোপাধির প্রকৃত সার্থকতা ও অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া আদর্শ রাজা নামে খ্যাত হউন।